অষ্টাবক্র

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

যুগবাণী সাহিত্য চক্র
২৮ কবীন্দ্র রোড
কলিকাতা ২৬

প্রকাশক ঃ
সুব্রত বসু
যুগবাণী সাহিত্য চক্র
২৮ কবীর রোড
কলিকাতা ২৬

মূল্য তিন টাকা বার আনা

মুদ্রাকর ঃ
কানাইলাল দে
বি, জি, প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬
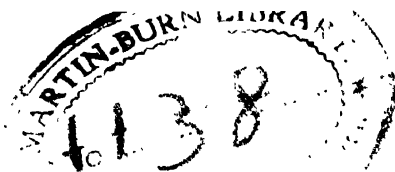
জ্ঞাতব্য

বইখানা ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দে লেখা এবং বহু অনাদরে পড়িয়া থাকিয়া শেষ অবধি প্রকাশিত হইল। আমার পত্নী শ্রীমতী কমলা দেবীর ইচ্ছাতে একটা উপন্যাস লিখিতে গিয়া "অষ্টাবক্র" লেখা হয়। উপন্যাস না হইলেও পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করা হইয়াছে বলা চলিতে পারে, কেননা বইখানা পড়িলে উপন্যাস বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই পুস্তকে কল্পিত ঘটনা ও চরিত্র ব্যতীত সত্য কিছুই নাই। কোন কিছুই সত্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন।

পুস্তকটির বহিরাবরণ চিত্র কল্যাণীয়া সাবিত্রী দেবীর পরিকল্পনা। তাঁহার নিকট আমি এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর দেবজ্যোতি বর্ম্মণ পুস্তক প্রকাশে অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এ পরিশ্রম না করিলে পুস্তকটি হয়ত আরও সাত আট বৎসর অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইত। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা
২-১০-৫০

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
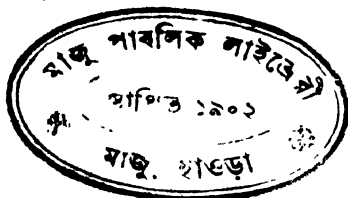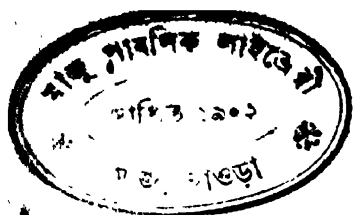
অষ্টাবক্র

(১)

কলিকাতার রাজপথ। "রম্ভা" বাসের চালক ফতে সিং আইন ভাঙ্গিয়া ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে বাস চালাইয়া চলিয়াছে। অবতরণেচ্ছু যাত্রীর আকুল ঘণ্টাধ্বনি অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখবর্ত্তী ডবল ডেকার "…নরীকে" পরাস্ত করিবার উদ্যমে মরিয়া হইয়া ছুটিয়াছে। সে কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত; শুধু তাহার মনের নিভৃত কোণে অতীতের দুই একটি স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনা হঠাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়া চকিতে মিলাইয়া যাইতেছে।…পুলিশ তদন্ত করিয়া তাহার আসল নাম দুর্জ্জন … জানিতে পারিবে কি? গুরুদাসপুর জেলার জঙ্গলে বৃক্ষ বিশেষের …দেশ কেহ ঘটনাচক্রে খুঁড়িয়া দেখিবে না ত? পত্নী কন্যা দুইটি …হারা মণি-অর্ডারগুলি ঠিকমত পাইতেছে ত?…সম্মুখে একটা …া পড়িয়া প্রায় ধাক্কা লাগিয়াছিল। বহু কষ্টে বাঁচাইয়া পুনরায় দ্বিগুণ বেগে বাস চালাইয়া ফতে সিং ভাবিতে লাগিল।…অজ্জুর, কবিলা … সুর্জ্জন চেতলার চালের আড়তের বিষয়ে যে প্রস্তাব আনিয়াছে, তাহা লাভজনক হইলেও তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।…একজন …যাত্রীর ইঙ্গিতে বাস্‌খানা সজোরে ব্রেক কসিয়া থামাইয়া ফতে সিং …কার চলিল। সম্মুখে গতির প্রেরণা—অন্তরে ভূত ভবিষ্যতের চঞ্চল …চিত্র।

প্রতাপচান্দ মাড়োয়ারী। লক্ষপতি হইলেও পদাতিক। বাল্যকাল হইতে একই শিক্ষা পাইয়া মানুষ, যে, অর্থের অপচয় নিবারণ ও সঞ্চয়ই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। হস্তদ্বয় টাকা কুড়াইয়া তুলিবার জন্য, পদযুগলও টাকার তাগাদায় ঘুরিবার জন্য, মস্তক ও মগজ টাকার হিসাবের জন্য, মুখ উপযুক্তরূপ দর ভাও করিবার অবয়ব, চক্ষু না থাকিলে টাকা গুণিতে অসুবিধা হইত, যথা সময়ে নাসিকা কুঞ্চিত করিলে সুদের হার বাড়ান সম্ভব হয় এবং কর্ণের সাহায্যে অপরাপর জীবের ব্যবসা সংক্রান্ত মনোভাব উপলব্ধি করা যায়। পূর্ব্বদিন রাত্রি ২ ঘটিকার সময় প্রতাপ চান্দ দশ হাজার মণ চানা সুবিধা দরে বিক্রয় করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে। এ কথা কেহ মনে না করেন, উক্ত চানার কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। ব্যবসায়ীরা বস্তু বিক্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বাস্তব জগতের উর্দ্ধে চলিয়া যান এবং সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীরা শুধু নিছক মনের ক্ষেত্রেই কেনা বেচা করিয়া থাকেন। দশ হাজার বস্তা বা বিশ লাখ মণ অর্থে বুঝিতে হইবে উক্ত পরিমাণ বস্তুর মনোবিম্ব মাত্র। মোটা মালের সংস্পর্শে আসিয়া বিশুদ্ধ ব্যবসায়ী নিজ হস্ত কলুষিত করে না। সংখ্যা যেরূপ খণ্ড খণ্ড বস্তুর এলাকা ছাড়াইয়া অনন্ত মনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে; গণিতজ্ঞের মত ব্যবসায়ী সেইরূপ মুক্ত ও স্বাধীন আগ্রহে বাজারজাত সসীম মালপত্রকে অগ্রে করিয়া অবাস্তবের ক্রয় বিক্রয়ে মনোনিয়োগ করেন। প্রতাপ চান্দ একদিকে যেমন ক্ষুদ্র পাই পয়সার হিসাবে সুদক্ষ, অপর দিকে তাহার মনের সীমানা সকল মাল গুদাম অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। যে বাজারে এক লাখ বস্তা চাল তিন বৎসরেও আমদানী হয় না, সেই বাজারেই প্রতাপ চান্দ বিশ কিম্বা ত্রিশ লাখ বস্তা চাল অবাধে ক্রয় বিক্রয়

করিয়া থাকেন। অপর দিক হইতে আর একজন ব্যবসায়ী আসিতে-ছিল। চৌমাথার ভিড়ে গতি মান্দ্যে দুই জনার সাক্ষাত হইল। দুজনাই প্রায় এক নিশ্বাসে পরস্পরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল "কে ভাও?" "কে ভাও?" মাড়োয়ারী সমাজে এই "কে ভাও" শব্দের অর্থ সৃষ্টি নিয়ন্তার বিধান অনুসারে মানবজীবন যন্ত্রের মেন্‌স্প্রিং যে "ভাও" তাহা পুর্ণশক্তিতে চালু আছে ত? উভয়েই উত্তরে বলিল "বারা আনা. তেরা আনা।" বলিয়া নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল।

ভজুয়া কুলি। মাথার ঝাঁকাটি প্রথমত ধারে ক্রয় করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে কিন্তু প্রথম মাসেই সে ধার শোধ করিয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। মুঙ্গের হইতে বিনা টিকিটে কলিকাতা আসিবার পথে তাহাকে কয় বারই রেল গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয়; কিন্তু সে কোথাও এক দিন কোথাও দুই দিন মজুরী করিয়া অবশেষে পূর্ব্ব ভারতের এই মহানগরীতে অবতীর্ণ হয়। সিমলার এক গলিতে কোন নির্ব্বিবাদী ভদ্রলোকের রোয়াকের উপর সে রাত্রি যাপন করে। দুই একবার তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়া ভদ্রলোক হাল ছাড়িয়া তাহাকে মানিয়া লইয়াছেন। ভজুয়া বলে যে, অবস্থার কিছু উন্নতি হইলেই, সে লোটা, তাওয়া, কলছু ও চার পাই সহযোগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে প্রবেশ করিবে. এবং তৎকালে মাসিক তিন টাকা কেরায়ার কোন কোঠরীর একাংশের অবশ্যই ব্যবস্থা করিবে। হোঁচট খাইয়া ভজুয়া পড়িয়া গেল। ঝাঁকার ডাল, চাল, চিনি প্রভৃতি থুৎকার বিভূষিত পথে পড়িয়া ছড়াইয়া গেল। ভজুয়া ফুটপাথের পাথরের সহিত ঔদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপনানন্তর মালপত্র কুড়াইয়া কাগজের ঠোঙ্গায় পুনরায় ভরিয়া নিজ পথে চলিতে লাগিল।

৳ বিচিত্রানন্দ উড়িয়া। শ্রীশ্রীজগন্নাথ ধামের আদর্শে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের নোঙ্গর জাতিভেদ তাহার অন্তরে স্থান পায় নাই। রন্ধনের কার্য্যে সে ব্রাহ্মণ, মিস্ত্রির কার্য্যে সে কর্ম্মকার ও মালির কার্য্যে সে সদ্গোপ। বর্ত্তমানে বেকার থাকায় বিচিত্রানন্দ একটি তাম্র নির্ম্মিত সাজিতে কয়েকটি ফুল পাতা ও একটি কমণ্ডলুতে রাস্তার হাইড্রাণ্টের গঙ্গাজল লইয়া দোকানে দোকানে আশীর্ব্বাদ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ এক পয়সা কেহ বা আধ পয়সা দিতেছে। কেহবা শুধু গালি দিয়া ধার শোধ করিতেছে। বিচিত্রানন্দ নির্ব্বিকার। আগামী সোমবার কর্পরেশনে একটি রাস্তায় জল দিবার কার্য্যে ঢুকিবে বলিয়া আশা পাইয়াছে।

একখানা বড় মোটর কার। নীল রংয়ের কাঁটা কাঁচের পার্শ্বের বাতি, ভিতরে মখমলের গদী ও রূপার ফুলদানী। ড্রাইভারের পরিধানে সবুজ কর্ডের উর্দ্দি ও তুর্কী টুপী। সওয়ার হইয়া চলিয়াছেন এক স্থূল-কায় প্রৌঢ়। নাম আক্কেল আলি। পিতা কলিকাতায় কাচের চুড়ি বেচিতে আসিয়া বঙ্গ ললনার রূপগর্ব্বের ওজুহাতে মুর্গীহাটায় ইমারত তুলিয়া নিজ নামের অগ্রপশ্চাতে আরবী, ইরাণী ও কাবুলী নামমালা জুড়িয়া আভিজাত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। আদিম বাসস্থান গুজরাট বা সিন্ধু দেশে হইলেও বর্ত্তমানে তুর্কী বা খোরসানী খানদানের বড়াই করিয়া, যাহারা অপেক্ষাকৃত কম চুড়ি বেচিত তাহাদের মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধ এখন আর কার্য্যক্ষেত্রে নাই। বহু বিজাতীয় শব্দ সঙ্কুল নামের মধ্যে আক্কেলটুকু কোন উপায়ে আটকাইয়া রাখিয়া কাচের চুড়ির পাইকারী কারবার অটুট রাখিয়াছেন। কলি-কাতায় ছয় সাত খানা ইমারত ও বহু সম্পদের মালিক। ড্রাইভারকে

আদেশ করিলেন, "কাউন্সিল চলো"। আক্কেল আলির আক্কেল একাধারে বাংলার নারীর অলঙ্কার ও বাংলা দেশের অবলম্বন। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

এইরূপ একটা কি চলিত কথা আছে যাহার মর্ম্ম এই যে পূর্ণ বংশ খণ্ড অপেক্ষা তাহার কত্তিত অংশ কখনও আয়তনে বৃহত্তর হইতে পারে না। জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে কথাটা সত্য হইলেও ইহা আফগানী অঙ্ক শাস্ত্র অনুমোদিত নহে। আসল হইতে সুদ অধিক, এই নীতি অনুসরণ করিয়া শের আফজার ঢিলা পাইজামার ঢেউ খেলাইয়া রাজপথ আলোড়িত করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। উর্দ্ধাঙ্গের চিকনের কাজ করা কুর্ত্তা ও নক্সা কাটা ওয়েষ্ট কোট তাহার সৌখীন অন্তরের পরিচয় দিতেছে। হস্তের সুপুষ্ট যষ্টিখণ্ড শের আফজারের পৌরুষের নিদর্শন। মস্তকে বাবরী ছাঁটা চুল ও সোনার কাজ করা পাগড়ী। অদ্য ৫ ঘটিকার সময় অনামিকা প্রেসের কর্ম্মীরা বেতন পাইবে। তন্মধ্যে কয়েকজন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শের আফজারের নিকট কিছু অর্থ ধার লইয়াছিল। পাঁচ বৎসরে সুদ হিসাবে শেখ আফজার শতকরা সাড়ে সাত শত টাকা তাহাদের নিকট আদায় করিয়া বর্ত্তমানে তাহার অক্ষয় মূলধনের সুদ অনুসন্ধানে পুনর্ব্বার চলিয়াছে। বাংলায় আফগান রাজত্বে রাজস্ব হিসাবে যত টাকা তৎকালীন আফগান নৃপতিগণ প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া গিয়াছেন; আফগান উত্তমর্ণকে সুদ হিসাবে বাংলাবাসী হয়ত এতদিনে তাহার চতুর্গুণ দিয়া থাকিবে। গ্রাম ও পল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজধানীর রাজপথ অবধি সর্ব্বত্র এই অসম্ভবশোধ্য ঋণ নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া একজন ঝাঁকামুটে নিজের ঝাঁকাটি

তুলিয়া লইয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু শের আফজারের দৃষ্টি এড়াইয়া বেচারা পলাইতে পারিল না। তাহাকে ধরিয়া আফজার বলিল "দশ আনা"। মুটিয়া বহু কাকুতি মিনতি করিল এবং অবশেষে পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

চাউ স্থন ক্যাণ্টন নিবাসী। চীন সভ্যতা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত গতিতে পৃথিবীর পথ বাহিয়া চলিয়াছে। হান্ যাইলে টান্ আসিল; টানের পরে মিঙ্গ, স্থঙ্গ অথবা নব্য চীনের অভিযান। এ প্রগতির শেষ নাই। চাউ স্থনের গতিও এই আদর্শে চালিত। তাহার রেশমের পুঁটলী সুদূর ক্যাণ্টন হইতে ক্রমশঃ সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা ও কলিকাতার পথে দেখা দিয়া শেষ অবধি হয়তো উত্তরে শ্রীনগর বা দক্ষিণে রামেশ্বরমে পৌছিয়া অবশেষে ক্ষীণ দেহকে সুপুষ্ট করিবার জন্য পুনরায় ক্যাণ্টনের পথে চলিবে। পুষ্টিলাভের পর, আবার পুরাতন পথ পুনরাতিক্রমে চাউ স্থন চীনের জয়ধ্বজা উড্ডীন রাখিবে। মানুষের ভাষা যে কি পরিমাণ শব্দের অপচয়ে মশ্‌গুল্, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ চাউ স্থন। বাংলায় "এক লুপ্পি কম না" "ভাল" বা "পাকা"; ইংরাজীতে "প্রেটি গুড"বা "ভেলি চীপ" এই দুই চারিটি কথায় চাউ স্থন নিজ কার্য্য সমাধা করে। অঙ্গুলী সঙ্কেতে মূল্য বুঝাইয়া সরল হাস্যে ক্রেতাকে বিমোহিত করিয়া সে শত শত মাইল সাইকেল যোগে পুঁটুলি লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কলিকাতার পথে চাউ স্থন চির উপস্থিত ও চির আদৃত। ব্যবসা তাহার রক্তে। সে ব্যবসার নেশায় প্রাচীন কালের ভূপর্য্যটকের মতই ধরণীর সকল পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

চৌমাথার উপরে খুবই ভীড় জমিয়াছে। বাসগুলি একের পিছনে এক করিয়া না দাঁড়াইয়া পাশাপাশি রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া-

গিয়াছে। সম্মুখে একখানা ট্রাম ঊর্দ্ধবাহুর মত নিজ বিদ্যুৎ-আহরণী দণ্ড উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ক্লাব পথগামী ইংরেজ দম্পতি টু-সীটারে বসিয়া বিলম্বের জন্য ঠোঁট কামড়াইতেছে। রিকশা কুলীরা কখন এদিক কখনও বা ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে কোন ফাঁকে অগ্রসর হওয়া যায় কি না। বাস্ ও ট্রামের নিকটের যাত্রীরা বিলম্বে হতাশ হইয়া হাঁটিয়া ঘরের পথে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢং ঢং করিয়া আওয়াজ করিয়া রেড্ক্রশের গাড়ীখানা অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। কে বলিল, "একটা লোক চাপা পড়েছে।" অপরে প্রশ্ন করিল, "কে, কে?" "একটা কাফ্রী; বেটা নেশা টেশা করে রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসের নিচে পড়েছে।" "কাফ্রী? কাফ্রী এখানে কোথা থেকে এলো?" "আরে বাবা, এখানে খুঁজলে দুট চারটে এস্কীমো, বেদুইন, আর রুশীয়ান মিলে যাবে; কাফ্রীত কি! কত আসে জাহাজে—বেড়াতে বেরিয়েছিল আর কি?" মানব জীবনের নশ্বরতা, কাফ্রীদিগের জাতিগত অসাবধানতা, বাস-ড্রাইভারদিগের ফাঁসির ব্যবস্থা ইত্যাদি মিশ্রিত আলোচনায় পথপ্রান্ত ক্ষণকালের মত মুখর হইয়া উঠিল। সামনের ট্রাম খানা ঘণ্টা দিয়া চলিতে সুরু করিল। তাহার পিছনে বাস্, মোটর, গাড়ী ও রিকশা প্রভৃতি। রাজপথ পুনরায় যেমন তেমনই উদ্দেশ্যহীন গতিতে ভরিয়া উঠিল।

চৌমাথার এপাশে ওপাশে কয়েকটি দোকান। কাশীধাম হইতে এক পানওয়ালা। ইনি পান-সাজা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ঠুন্কো কাচের রং বেরংয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ গোলক, গিলটিকরা আতরদান, জার্ম্মান সিল-ভারের ঝক্ঝকে ঘটি বাটি, ইত্যাকার বিভিন্ন সরঞ্জামে পণ্যবিপণী সরগরম। মঘাই পান, পান ও পানীয়ের মাঝামাঝি একপ্রকার

কিছু। ইহা চর্ব্বণ, সেবন বা পান করিবার পদ্ধতি সকলের পক্ষে সহজায়ত্ত নহে। ফলে আভিজাত্যান্বেষী দুঃসাহসী হিন্দুস্থানী যুবাজনের কুর্ত্তা চাদর মঘাই রসে সতত রক্তিম। কাশীবাসী শরীফ্‌জন এক একবাবে আট দশ খিলি মঘাই মুখবিবরে রক্ষা করিয়া কথোপকথনে পারদর্শী। হিন্দুস্থানী সভ্যতায় এই অসাধ্য সাধনের স্থান অতি উচ্চে। কলিকাতার চৌমাথার উপরে এই কৃষ্টি প্রচার কাশীবাসী দোকানদার বহুদিন হইতে :চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি এই কার্য্যে স্বদেশে জমি জমা করিয়াছেন এবং বিদেশে "বাবুজি" আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

আর এক কোনে একটি গয়ার তামাকের দোকান। স্থাননাম মাহাত্ম্য বশতঃ দোকানদাব নিজ পণ্য নিচয় পিণ্ডাকৃতি করিযা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। শোনা যায়, এই সকল পিণ্ডের কোন কোনটি এতই মূল্যবান যে, কোন ক্রেতাই সেই তামাক ক্রয় করেন না। তথাপি দোকানের গৌরবের জন্য বিভিন্ন বহুমূল্য পিণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গয়ার তামাক যাঁহারা খান, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তামাকের মধ্যে গয়ার মালই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুপুরের তামাক কিছু সেকেলে ভাবাপন্ন। গয়া পশ্চিমে বলিয়া উৎকৃষ্ট তামাক প্রস্তুতের পক্ষে প্রশস্ত এবং দোকানদারও নিজ খরিদ্দারদিগকে বলিয়াছে যে, অনেক দেশে সে তামাক বেচিয়াছে কিন্তু বাংলার মত সমঝদার ক্রেতা সে আর কোথাও দেখে নাই। এতটা পাইলে কে না তাহার তামাক কিনিয়া গয়াকে ও নিজেকে ধন্য করে? বাঙ্গালীর একটা জাতিগত গুণ আছে। যত দূরের দেশের দ্রব্য সম্ভারই হোক না কেন, বাংলায় তাহার আদর হইবেই। বেনারসের পান, গয়ার তামাক ও ইংলণ্ডের

সিগারেট হইতে স্বরু করিয়া মাদ্রাজের ধূপ, জয়পুরের পাঁপড, কানপুরের সতরঞ্চি, মধুপুরের কুঁজা, গাজীপুরের আতর, সিঙ্গাপুরের আনারস, মোরদাবাদের পিতল, উৎকলের কাঁসা ও বোম্বাইয়ের ধুতি চাদর প্রভৃতি এই পরগুণগ্রাহিতায় বাজার জুড়িয়া বিক্রয় হয়। মনের ক্ষেত্রে যে আবেগে বাঙ্গালী সংস্কারের প্রেরণা খুঁজিয়া মস্কো কিংবা পারীর বাজারে ঘুরিয়া মরে, আর্টের আদর্শ অনুসন্ধানে লণ্ডন ও বার্লিন চষিয়া ফেলে, এ সেই মানসিক চয়নশীলতার আর এক অভিব্যক্তি।

তৃতীয় কোণে এক বোম্বাইওয়ালা একটি আলুমিনিয়ামের বাসনের দোকান সাজাইয়াছে। শারীরিক শক্তির হানি ঘটাতে দেশবাসী আর অবাধে লোহার কড়া পিতলের হাঁড়ী প্রভৃতি নাড়িতে চাড়িতে পারেন না। সেইজন্য ফুলের মত হাল্কা আলুমিনিয়ামের এত আদর। বোম্বাই-ওয়ালা নিখুঁত ওজনে ভরির দরে বাসন বিক্রয় করেন। মাত্র কয়পয়সা ভরি, সস্তাই বলিতে হইবে। সের হিসাবে অবশ্য চার টাকা পড়ে বা ততোধিক এবং ভাঙ্গা বাসন বেচিলে সেরে ছয় আনা ফেরত আসে; কিন্তু সখের জিনিসের ও রকম চণ্ডালের মত দর যাচাই করাটা ভাল দেখায় না। পিতল কাঁসা লোহার যুগ চলিয়া গিয়া এখন আলু-মিনিয়ামের যুগ আসিয়াছে। যুগধর্ম্মের গুজরাটি পূজারী তাহার পাওনা গুনিয়া লইতেছে।

উপর তলায় এক পার্শি দন্ত চিকিৎসক; কৃত্রিম দন্ত বিক্রয় করিয়া ফোগলা মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে অদ্বিতীয়। সাইন বোর্ডে একপাটি দানবীয় দন্তমালা সুচিত্রিত। ডক্টর সোহরাব চাটনিওয়ালা ডেণ্টাল সার্জ্জন পূর্ব্বে কালিমাটিতে ইস্পাতের মিলে সাঁড়াশি চালাইতেন। ধর্ম্মঘটের সময় মজুরদের নিকট নব বেহস্তের নাম করিয়া চাঁদা উঠাইয়া

চম্পট দেন ও তৎপরে সেই মূলধনে সাধারণের সাহায্যের জন্য এই সস্তার ডেণ্টল ক্লিনিক্ স্থাপন করেন। কালিমাটিতে এখনও বহু মজুরের ধারণা যে চাটনিওয়ালা তাদের উন্নতির জন্য হয় সিমলায় বড়লাটের নিকট, নয়তো মস্কোতে ষ্টালীনের দরবারে নিয়মিত হাজিরা দিতেছেন।

চৌমাথার একদিকে পাঁচতলা এক বিরাট অট্টালিকা। ইহার এক তলায় গথিক খিলান-মার্গ ও তদুপরি ক্রমান্বয়ে কোরিন্থিয়ান, মুরীশ, ইণ্ডোপারসিয়ান, রোমানেস্ক ও পি, ডব্লিউ, ডি, স্থাপত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়। এই বাড়িটি ত্রিশটি ফ্লাটে বিভক্ত। এখানে চীনা, ফিরিঙ্গী, আগ্রাওয়ালা পার্শী, ইহুদী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, তৈলঙ্গী নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় লোকই একত্রে বসবাস করে। কেহ ব্যবসায়ী, কেহ চাকুরে, কেহ বা স্বাবলম্বী। অসংখ্য লেটার বক্স, ইন-আউট নোটিস বোর্ড ও প্যাকিং কেসে প্রবেশ পথ সঙ্কুল। পানের পিক ও নিষ্ঠীবনে সোপান পথ রঞ্জিত। নাম আমানি ম্যান্‌শন্‌স্। মালিক সিন্ধি।

(২)

মাতৃগর্ভে থাকিতেই মহামুনী অষ্টাবক্র সর্ব্বশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। অকাল পক্কতার শাস্তি হিসাবে তিনি অভিশপ্ত হইয়া অষ্টাবক্র রূপ ধারণ করেন। অ্যানাটমির ভাষায় তিনি ঠিক শরীরের কোন কোন অঙ্গে বাঁকিয়া গেলেন তাহা ঠিক জানা যায় নাই। এমন কি বাঁকা ভাবটা শুধু শরীরেই আবদ্ধ ছিল অথবা চরিত্রে ও মনেও সে বক্রতা স্থান পাইয়াছিল তাহাও বলা যায় না। আধুনিক মানবের শরীরগত বক্রতা সচরাচর 'ক্লাব ফুট' 'বো লেগ' 'পিজন্ চেষ্ট' ও 'হাঞ্চ ব্যাক' এই চারভাবে প্রকাশিত হয় পূর্ণ অষ্টাবক্র রূপের

তাহা হইলে আরও চার প্রকার বেঁক বাকি থাকিয়া যায়। মানসিক ক্ষেত্রে আকার ও প্রকারগত দৃষ্টিহীনতা ; অর্থাৎ ছোটকে বড় করিয়া দেখা, গোল ও চতুষ্কোণের প্রভেদ নির্ণয়ে অক্ষমতা, অগ্রপশ্চাৎ বিভেদ না করা প্রভৃতি আকার জ্ঞানের অভাব পরিচায়ক। সুন্দর ও কুৎসিত, সাদা ও কাল, মিষ্ট ও তিক্ত, লাভ ও লোকসান, স্বার্থ ও পরার্থ প্রভৃতির পার্থক্য না বুঝা প্রকারজ্ঞান হীনতা। ধনুকের মত পা অথবা পায়রার মত ছাতিতে যেমন শরীর বাঁকা বলা চলে, আকার প্রকার বিষয়ে ভ্রান্ত দৃষ্টি মনের ক্ষেত্রে তেমনিই দুষ্ট। নীতিগত এবং আধ্যাত্মিক নজর বিকৃত হইলে মানুষের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ন্যায় অন্যায় জ্ঞান, মানুষের সহিত মানুষের, সমাজের বা জাতির সম্বন্ধ বা তৎসংক্রান্ত কর্ত্তব্য বোধ, ভীরুতা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার স্পৃহা প্রভৃতি দোষ বাড়িয়া চলে। মনের ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে সুমার্জ্জিত করিয়া স্থির বুদ্ধিতে সৃষ্টিতে মানুষের স্থান বিচার করিয়া আধ্যাত্মিক পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ক্ষমতা লোপ পায়। চরিত্রের বক্রতা এই দুই প্রকার। আধুনিক জগতের অষ্টাবক্র সমাজে সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন শিশুর জন্ম না হইলেও শরীরে, মনে ও চরিত্রে অষ্ট অথবা ততোধিক বক্রতা বিশিষ্ট নর নারীর অভাব নাই। শীর্ণ বক্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ভ্রান্ত বোধ শক্তি, বিকৃত প্রবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিহীনতা মানব সমাজে বিরল নহে। ইহা কেমন করিয়া হইল তাহা কে বলিবে? জনন বৈজ্ঞানিক মহলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক দোষ গুণের মূল অনু-সন্ধানে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন সবই শিশুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই রাসায়নিক কারণে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। যথা, শিশুর জন্মের পূর্ব্বে জননী বেশী টক খাইলে শিশু মিথ্যাবাদী হয় অথবা মাতার খাদ্যে

ঘৃতের মাত্রা বেশী হইলে শিশু ব্যবসায়ী হয়। এইরূপে হয়তো নোনা-ইলিশ হইতে ক্রোধাধিক্য, জিলিপি হইতে চক্রান্তপ্রিয়তা, ছাতু ও ভুট্টা হইতে স্থূলবুদ্ধিতা এবং বালাম চাল হইতে কবিত্ব শিশুতে সংক্রামিত হয়। অপর পন্থী বৈজ্ঞানিক বলেন পারিপার্শ্বিক হইতেই শিশু সকল কিছু আহরণ করে। যথা শিশুকে জন্মের পরে কি খাওয়ান হয় কি ভাবে শোয়ান হয়, তাহাব উপবেই শিশুব ভবিষ্যত নির্ভর কবে। একথা ঠিক যে শরীরের ক্ষেত্রে উভয় মতই অভ্রান্ত। মাতার পুষ্টির উপর শিশুর পুষ্টি নির্ভব করে এবং নিজ দেহের পুষ্টির উপরে শারীরিক পরিণতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। মনেব ও আত্মার কথা বিচার করা কঠিন, তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মুড়ি, মোটা ভাত কাপড ও মাটিতে শয়ন সাধারণভাবে বলিতে গেলে বিকাশের পক্ষে সহায়ক নহে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ব্যক্তি বিশেষ দেহে মনে চরিত্রে বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে ; আবাব সকল পারিপার্শ্বিক উন্নতির অনুকূল হইলেও অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বড় হইতে সক্ষম হয় না। বাহির ও অন্তরের অষ্টাবক্র ভাব অকস্মাৎ ব্যক্তি বিশেষে দেখা যাইতে পাবে, কিন্তু জাতির বহু লোকেব মধ্যে উহা প্রকট হইয়া উঠিলে তাহার কারণ জাতির শতাধিক বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। রোগ সর্ব্বাঙ্গীন হইলে তাহাব চিকিৎসাও বিস্তৃত রকমের হওয়া দরকার। নতুবা বক্রতা জাতিকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবে।

গয়ার তামাকের উপর তলায় হোটেল বাসায় একটি নবযুবক শরীরে তিন বেঁক দিয়া দাঁড়াইয়া রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া রাজপথ

নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এই প্রকার দাঁড়ান শাস্ত্রানুমোদিত এবং ইহার পৌরাণিক নজিরও আছে। পতনের পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া ভ্রম হইলেও আসলে এই দাঁড়ানর অর্থ খুবই গভীর। মথুরায় দুতালা গৃহ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভঙ্গিতেই শ্রীরাধিকাকে দেখিতেন। ছিল না বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ ভাব অপেক্ষাকৃত সরলরেখা অনুগামী। যুবকের নাম বিজয় মাধব গড়াই। যেখানে নারিকেল নিঃশেষ হইয়া সোনার বাংলা শুধু তাল তরু শোভিত, হিন্দুস্থানী মুল্লুকের হাওয়া যেখানে টাটকা আসিয়া ঘা মারে, বাঙালীর প্রাণ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ধরণীর বাণী সুদূরের অস্ফুট শব্দতরঙ্গে ঈষৎ মাত্র শুনিয়া আধ আড়ষ্ট ছন্দে অল্প অল্প দোলে, সেই রাঢ়ভূমিতে গড়াইএর নিবাস। বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য বিজয় মাধব স্কুল জীবন শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। কলেজ এখনও ঠিক হয় নাই। বাসাও ঠিক নাই। তাই খুল্লতাত, মাতুল, মেশোমহাশয় ও অপরাপর কয়েকজন আত্মীয় কুটুম্ব বিজয়কে লইয়া মেসে উঠিয়াছেন। উদ্দেশ্য তাহাকে ব্যবস্থা করিয়া পাঠে নিযুক্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন। জীবনের এক একটা সন্ধিক্ষণে আত্মীয় স্বজনের উচিত মানুষকে ঘিরিয়া দাঁড়ান। বিজয় মাধব তাহার জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের প্রারম্ভে দিশাহারা হইবে না; কারণ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত প্রভৃতি সকল দিকেই এক একটি গুরুজন হুঁকা অথবা বিড়ি হস্তে তাহাকে দিগ্‌দর্শণে সাহায্য করিতেছেন। রাঢ় দেশের লোকেরা স্বল্পবাক হইলেও মমতায় পূর্ণ হৃদয়। কলেজ ঠিক হয় নাই, আলোচনা হইতেছে।

খুল্লতাত দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "হুঁ!"

মেশো প্রত্যুত্তরে "বটে ত!" বলিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। মাতুল উভয়ের চিন্তার ধারার সঙ্গম সৃজন করিয়া বলিলেন "হুঁ, বটে ত!"

এইরূপ কথোপকথনে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা বিজয়কে ডাকিয়া আহারে নিযুক্ত হইলেন।

নয়টি প্রাণী ভোজনে বসিয়াছেন। এই হোটেলে শুখো ও খোরাক সমেত উভয় ব্যবস্থাই থাকাতে রন্ধন ইঁহারা নিজেরাই করিয়াছেন। তিন নম সাতাশ পোয়া চালের ভাত ও তৎসঙ্গে ডাল ও ঝাল অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইল। গামছায় বাঁধা চুবড়ীতে ঝিল্‌পি, চলিত ভাষায় যাহাকে জিলাপি বলা হয়, রক্ষিত ছিল। ঝিল্‌পি কলা পরিকল্পনার দিক দিয়া অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট হইলেও খাইতে ভাল। অর্থাৎ নয় ভোক্তা অচিরাৎ নয় পোয়া পরিমাণ এই অতি জিলাপি শেষ করিয়া এক এক ঘটি জলপান করিয়া তৃপ্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

খাওয়ার মাত্রা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে ভোক্তাগণ আকারে অসুর সদৃশ। দূর সম্পর্কের গরীব গুরুজন দুই তিন জন বেশ হাড় চওড়া ও মেদহীনভাবে শক্তিমান। অবস্থাপন্ন নিকট আত্মীয়েরা সকলেই শীর্ণ শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ড প্রায়। কারণ—পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। বিজয় মাধব স্বয়ং অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক। ঈষৎ কুব্জ ভাবাপন্ন, তোতলা এবং মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। অধরোষ্ঠ যে যে ভগবান মুখবিবরের আচ্ছাদন হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন একথা অনেকেই মানেন না, বিজয় তাঁহাদেরই একজন। অধর সতত ঝুলিয়া থাকিয়া উন্মুক্ত পথে দন্তশোভার পুর্ণ বিকাশ করিতে সাহায্য করে। ওষ্ঠও অধরের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া দূরে সরিয়া আছে। বিজয়

মাধব পিতার তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। মাতাও স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অভাবেই তেজবরের হাতে পড়িয়াছিলেন। বিজয়ের জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে রোগে ভুগিয়া তাহার দুই বৎসর বয়স-কালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তৎপরে বিজয় মাধব পিতৃ মাতৃ কুলের সকল নরনারীর সমবেত চেষ্টায় অতি যত্নে লালিত পালিত হয়। আহারে বিশ্বের মূল্যবান দুষ্পাচ্য সারহীন সরঞ্জাম, বিহারে সদা সর্ব্বদা ইহার ক্রোড়ে নয়ত উহার এবং বসনে উত্তমাঙ্গে রেশম পশমের বহুল সমাবেশ কিন্তু অধমাঙ্গ পরমহংস ফ্যাসনে সজ্জিত। সোনার হার, বালা, তাবিজ এবং জরীর টুপী ও ভেলভেটের জুতাও কখন কখন উৎসবকালে দেখা যাইত। "ওরে পড়ে যাবি। এদিকে যাস্‌নে। ওদিকে যাস্‌নে। আর একটু খা। ওমা কি হবে মোটে চারটে রসগোল্লা তাও খেলি নে? হুটোপাটি করে ঘুরিস নে। বাইরে বেরস নে।" ইত্যাকার বামাকণ্ঠ নিঃসৃত নির্দ্দেশে তাহার শৈশব ও বাল্য কাল কাটিল। বিভিন্ন জ্বরজারি, পেটের ব্যারাম, হাঁচি কাশি সর্দ্দি, চোখওঠা, কানপাকা, খোস পাঁচড়া প্রভৃতি আনুসঙ্গিকও লাগিয়া ছিল। পড়া, ছড়া, হাত পা কাটা মোচড়ান, ভাঙ্গা ইত্যাদি চাষাড়ে ব্যাধি কখন হয় নাই।

কৈশোরে বিজয় মাধব চাকরের হাতে বই বহাইয়া স্কুলে যাইত এবং অপর ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া হইলে মাষ্টারের কাছে নালিশ করিয়া তাহাদের জব্দ করিত। স্কুলের পরে খেলাধূলা করিয়া সময়ের অপব্যবহার করা তাহার বারণ ছিল। বাড়ী আসিয়া মেয়ে মহলে বসিয়া অতিভোজন ও তাহার ভবিষ্যৎ বধূর রূপচর্চ্চা শুনিয়া তাহার সময় কাটিত। তাহাকে উচ্চশ্রেণীর জীব করিয়া গড়িয়া তোলাই

গুরুজনদিগের ইচ্ছা ছিল। নিজেদের কাটখোট্টা ধরণ ধারণ, মোটা খাওয়া মোটা পরা যাহাতে বিজয়ের না অভ্যাস হইয়া যায়, ইহার ব্যবস্থা পূর্ণরূপেই করা হয়।

হরেন বলিয়া এক কায়স্থদের ছেলে একদা বিজয়কে বন্ধুত্ব করিয়া কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। একদিন বৈকালে বাড়ীতে তাহাকে আর দেখা গেল না। খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়িয়া গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে দেখা গেল বিজয় দোল-তলার মাঠে হরেন ও আরও কয়েকটি ছেলের সহিত খেলিতেছে। গ্রেপ্তার করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলে পর বিজয়ের পরকাল সংরক্ষণের জন্য দুইটি কমিটি বসিল। পুরুষ কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা গেল যে বিজয়ের কয়েকটি চাষাড়ে গুণ্ডা জাতীয় বালকের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে। ইহা অবিলম্বে না ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার স্থান ভবিষ্যতের আদালতে জজের কুরসিতে না হইয়া কাঠগড়ায় হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা। নারী কমিটি "ওমা কি হবে গো; কি ঘেন্না, ছেলেগুলার মরণ নেই আমাদের বিজয়ের সর্ব্বনাশ করতে খুঁজছে" ইত্যাদি বলিয়া রায় জারী করিলেন। বিজয় অনন্ত অবনতির পথে পা ছুঁয়াইয়াও বাঁচিয়া ফিরিল। অতঃপর তাহার কল্পনা আর ফুটবল কিম্বা লাঠি ঘোরানর ধার কাছ দিয়াও যাইত না। তাহার মানসপটে শুধু জজেরা গৃহে নিজেদের বধূদের লইয়া ও আদালতে আসামীদের ফাঁসীতে লটকাইয়া দিন গুজরান করিতেন। আসামীদের মধ্যে অধিকাংশই বাল্যকালে ফুটবল খেলিয়া ক্রমশঃ ফাঁসির মঞ্চের নিকট হইতে আরও নিকটে আসিয়া পৌছাইত। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেই মহাপুরুষেরা গুণ্ডাবাজি করিয়াও উৎরাইয়া যাইতেন। কলির

মহামানবের অস্ত্র খাতা ও কলম। তৎসাহায্যে দিগ্বিজয়ান্তে তাঁহারা বিবাহযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়া দালানের উপর দালান তুলিয়া দলিল সঞ্চয় করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন। ইহাই বাণী।

বিজয়দের গ্রামের অদূরে একটি পাহাড়ে নদী। তাহার পাড় হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের ধার অবধি শালবন। নদীর পরপারে একটি মাঝারী ধরণের পাহাড়। প্রকৃতি এখানে একটু রুক্ষ ভাবাপন্ন। ঘাসের ফুল কিম্বা রজনী গন্ধার বন এখানে বিরল। কিন্তু লালিত্য না থাকিলেও প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য নাই এমন নহে। অনন্ত বিস্তৃত সবুজ, মধ্যে মধ্যে নারিকেল বেষ্টিত পুষ্করিণী ও খড়ের ঘর, ইহার যে কমনীয়তা তাহা মনকে আকর্ষণ করে স্নিগ্ধ আদরের মত। প্রখর সূর্য্য কিরণ যখন দূরের পাহাড়, কঙ্কর ও প্রস্তর বিকীর্ণ ভাঙ্গা ও বালু-নুড়ির পাহাড়ে নদী চোখ ঝলসাইয়া জ্বলিয়া উঠে তখন ক্ষণিকের জন্য ধাঁধা লাগিয়া গেলেও সে প্রখরতা সৌন্দর্য্যের আকর। মাঝে মাঝে শালের হরিদ্রাভ হরিতের ছোপ যেন আশ্বাস দিয়া বলে "এই কঠিন প্রখর ধারাল বহিরবয়বের অন্তরের নিভৃত কোণে প্রাণ আছে। মমতা আছে।" বর্ষার কালো মেঘ যখন আকাশ ঢাকিয়া বিদ্যুৎ ঝলকে এই শুষ্কতাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে চায় তখন মনে হয় যেন আলুলায়িত কেশে কুপিতা প্রকৃতি মাতা সন্তান শাসনে নামিয়াছেন। পাহাড়ে নদীর বানের গর্জ্জন শালবনের বুকে ঝড়ের তীব্র হাহুতাশ, পাহাড়ের কোলে বজ্রের গভীর প্রতিধ্বনি; মানুষকে ভীত চকিত করিয়া তোলে। এই ভয়ের মধ্যেও মানুষ তন্ময় হইয়া দেখে যে রোষের উদ্দীপনায় প্রকৃতির প্রখর সৌন্দর্য্য প্রখরতর হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানের উষ্ণ বায়ু তাহার নীরস কঠোর শুষ্কতায় চরাচরকে তৃষাতুর করিয়া তোলে।

তাপিত অঙ্গে স্বেদ বিন্দু অবধি জন্মাইতে পারে না। রৌদ্র এখানে সত্য সত্যই কাঠ ফাটাইয়া দেয়। শীতও এখানে চন্‌চনে এবং তাহার প্রকোপে এদেশবাসী, "নিস্কম্বল" গরীবেরা মাসাধিক কাল অতিকষ্টে নিশাযাপন করে। সমতল বাংলার ভ্যাপসা হাওয়া সকল কিছু একটু কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সে কুয়াশার এখানে কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাই আকাশ এদেশে আরও উজ্জ্বল নীল। জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীর অঙ্গ ঝল্‌মলে রূপালী। গোধূলীর আলোতে লালের অংশ যেন একটু বেশী। কৃষ্ণপক্ষের আঁধার আকাশ নিবিড় কালো; তাহাতে হাল্কা রংয়ের আভাস মাত্র নাই; শুধু গভীর অরণ্যের জোনাকীর মত তারকার দ্যুতি সে অন্ধকারে ইতস্ততঃ জ্বলিয়া আছে।

এখানের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য স্থানীয় লোকের নজরে পড়িলেও তাহাদের সে উপলব্ধি সজাগ নহে। তাই, কাব্যের মাল মশলা থাকিলেও কাব্যের পরিবর্ত্তে এখানে মুড়ী ও ফুলুরীই অধিক সমাদৃত। চিরতুষারাচ্ছন্ন কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভায় যেখানে বিদেশীজন স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হইয়া হিমাচল শীর্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; সেই খানেই পথের ধারে ভুটিয়ারা আত্মহারা হইয়া জুয়া খেলিতে ব্যস্ত থাকে। পদ্মার অনন্ত জলের বক্ষে নৌকায় ভাসমান মাঝি মাল্লারা এইরূপ সান্নিধ্যজনিত তাচ্ছিল্যেই সে বিপুল জলচিত্রকে উপেক্ষা করিয়া ইলিশ মৎস্যে মনোনিবেশ করে।

গরীব গ্রামবাসীর পক্ষে শালবনে আলো ছায়ার লুকাচুরি খেলার মধ্যে অথবা ক্ষীণস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর প্রান্তরের পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলার ভিতর রসের আভাস পাওয়া সম্ভব নহে। হারান ছাগল বা গরু খুঁজিয়া যাহার শরীর পরিশ্রান্ত সে প্রকৃতির শোভা দেখিয়াও

দেখিতে পায় না। অল্প দুই বিঘা জমি যাহার সম্বল সে সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিজের এলাকার বাহিরে বলিয়া মানিয়া লইতে শেখে। যৌবনের সর্ব্বজয়ী প্রেরণায় হয়ত কোন দিন ক্ষণিকের উন্মাদনায় সে গান গাহিয়া প্রিয়াকে বলিবার চেষ্টা করে, যে আকাশে চাঁদ, দূরে শালবন ও নদীর পরপারে পাহাড় আছে, এস দু'জনে হাত ধরাধরি করিয়া দেখিয়া আসি, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনের দৈনিক অভাব অভিযোগের তাড়নায় সে গান আরম্ভেই থামিয়া যায়। যে যুগে গ্রামের লোক গান গাহিত সে যুগে অভাব এত নির্দ্দয় ভাবে গ্রাম্য জীবনকে নিঃশেষিত করিত না। সহুরে ঐশ্বর্য্যবাদও এমন করিয়া গরীবকে উতলা করে নাই। সম্পদ ছিল না হয়ত কিন্তু অভাব বোধও ছিল না। সহুরে আকাঙ্খা ও সহুরে কল্পনা গ্রামবাসীর অল্পের সংসার বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। "নাই" এর তালিকা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া যেটুকু আছে তাহাকে কামনার ক্ষেত্রে আরও ছোট করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভোজনের ব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় থাকিলেও ক্ষুধার ক্রমবিকাশে ভোজন প্রায় উপবাসের সামিল হইয়াছে।

বিজয় মাধব বাল্য কাল হইতে গ্রামে শুধু এই কথাই শুনিয়াছে যে গ্রামে কিছু নাই। গ্রামবাসীর জীবনের একমাত্র কাম্য কোন উপায়ে সহরে গিয়া জমিয়া বসা, কেন না সহরের জীবনই জীবন; গ্রামে শুধু কোন রকমে টিকিয়া থাকা।

মায়ের কোল অপেক্ষা "প্যারাম্বুলেটর" অধিক কাম্য একথা কোন শিশুই মানিবে না। আধুনিক মানব কিন্তু নাড়ীর টান কাটাইয়া উঠিয়া ধরণীর কোল হইতে স্বেচ্ছায় ইট, সিমেণ্ট ও ল্যাম্প পোষ্ট, অবলম্বন করিয়াছে। কোন কিছুরই স্বাভাবিক রূপ তাহার আর

পছন্দ হয় না। গাছের ফুল কাটিয়া সে ফুলদানীতে সাজায়, বনের পাখীকে খাঁচায় বন্ধ করে, নদীর জল পাইপ পথে বন্দী, আকাশের বিদ্যুৎ তারে বাঁধা ; সে নিজে চতুর্দ্দিকে বাড়ী, গাড়ী, জুতা, জামা, বোতল, টিন ও বস্তা জাত খাদ্য ও পেটেণ্ট ঔষধের চাপে রুদ্ধশ্বাস হইয়া আড়ষ্ট গৌরবে নিজ সর্ব্বজয়ী প্রতিভার কল্পনায় বিভোর। প্রকৃতি হইতে তাহার প্রতিকৃতি মানবের পক্ষে অধিক উপভোগ্য এই নীতিই দুনিয়ার সহরে সহরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিজয় যখন গ্রামের আবহাওয়ায় তাহার ভবিষ্যৎ সহুরে জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন হইতেই তাহাকে বিধিমতে কাপড় জুতা পরাইয়া, বিস্কুট, টিনের দুধ খাওয়াইয়া, কেরাসিনের আলোতে পড়াইয়া উন্নতির পথে আগাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্কুলের পাঠ শেষ হইবার পুর্ব্বেই সে মনে মনে মেঠো ভাব বর্জ্জন করিয়া ফুটপাথে চলিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছিল। পিসিমা মাসিমারা তাহার সকল কথাই মানিয়া লইতেন ; এমন কি বাটিতে চা না খাইয়া তাহাকে চিনামাটির পেয়ালাও দিয়াছিলেন ; শুধু ঐ বধূর কথাটাই ঈষৎ গ্রাম্য ভাবাপন্ন থাকিয়া গেল। লাল ডুরে কি নীলাম্বরী, সেই নোলক চন্দ্রহার আর মল, সেই আলতা আর সিঁদুর। বিজয় অখণ্ডনীয় বিধির বিধানের মতই তাহার আধুনিকতার মধ্যে এই অতি পুরাতন কল্পনার বধূটিকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিল। সভ্য ইয়োরোপীয়েরা যেমন সভ্যতার চূড়ান্ত করিয়াও আফ্রিকা বা এশিয়ার দুটা একটা "কলোনী" আসবাব হিসাবে রাখিতে নারাজ হ'ন না ; বিজয়ও তেমনি এই গেঁয়ো বধূর চিত্রটি ভবিষ্যতের কল্পনা চিত্রমালার মধ্যে মানাইয়া লইয়াছিল।

ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে উঠিতেই বিজয়ের পিতা বলিলেন, "বিজয়ের ভাল করিয়া পাশ করিতে হইবে। এই জন্য কলিকাতা হইতে একজন মাষ্টার আনা দরকার।" সকলে বলিল "হুঁ, বটেত।" ফলে সরসী দত্ত মাসিক কুড়ি টাকা "অল ফাউণ্ড" ব্যবস্থায় কলিকাতা হইতে এই কঙ্করাকীর্ণ গ্রামে আসিয়া পৌঁছাইলেন। কুড়ি টাকা বেতন হইলেও তাঁহার সাজ পোষাক দেখিয়া গ্রামবাসীর তাক লাগিয়া গেল। "হুঁ, মাষ্টর বটে!"

চামড়ার বাক্স, টর্চ্চ বাতি, হাত ছড়ি; তা ছাড়া এগার হাত লম্বা আটচল্লিশ ইঞ্চি বহরের কাল ফিতা পাড় ধুতি পাইজামা ফ্যাসনে পরিহিত ও খাট সার্ট। ব্যাক ব্রাশ করা সেমী-বাবরী চুল। পায়ে বাটার তৈয়ারী কাবুলি স্যাণ্ডেল। কানের পাশ ঘেঁসিয়া লম্বা জুলফি। এক জোড়া চশমার উপরে স্প্রিং ক্লিপ আঁটা আর এক জোড়া রৌদ্র নিবারক চশমা। নাকি স্বরে গান গায় আবার বাঁশের বাঁশী বাজায়। নূতন রকমের জীব।

প্রথমে বিজয়ের গুরুজনদের ভয় হইয়াছিল যে সরসী দত্ত লোক ভাল নয়। বিশেষ ঐ বাঁশের বাঁশীটা। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তায় সে ভয় অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। সরসী দত্ত সকলের সহিত এক মত। কোন কথায় না বলে না। বিজয়ের পিতার, খুল্লতাতের, মেশো-মহাশয়ের; যাহার যাহা যাহা মানসিক বাতিক ছিল, সরসী দত্ত সকলের মতের তারিফ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁহারা সকলেই বিশিষ্ট। সকলেই বলিতে লাগিলেন "হুঁ, মাষ্টর বটে!"

সরসী দত্ত সকাল বিকাল বিজয়কে পড়ায় এবং বাকী সময় গড়াইদের ছোট একখানা ঘরে তাস ও তর্কে দিন কাটায়। তাহার

নামে দু একখানা মাসিক সাপ্তাহিক আসিত, এই কারণে তাহার রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া একটা খ্যাতি হইয়া গেল। আসলে সরসী দত্ত গদ্যে কবিতা লিখিত এবং এই সব সাময়িকগুলিতে তাহার লেখা ছাপা হইত। গদ্যে কবিতা লিখিয়া ঠিক দিন গুজরান হয় না, সেই কারণে কবি এই বালি আর পাথরের দেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আসিবার পুর্ব্বে তাঁহার লিখিত "বিদায় এখনকার মত" শীর্ষক কবিতায় তিনি কলিকাতাবাসী রসজ্ঞদিগকে জানান :

আমার এই বিদায়,
এ ঠিক বিদায় বলা চলেনা ;
কেননা বিদায় কার কাছে নেব ?
কেই বা বিদায় দেবে ?
এই যে মায়ায় গড়া সহর
বিস্ফোটকের মত যার বুকে
বড় বড় দালান, গম্বুজ, খিলান আর চূড়া,
চুলকানীর মত যার গায়ে মানুষ গজিয়েছে,
এ আমার অন্তরের মায়ায় গড়া।
জব চার্ণক—সে আমিই—একে গড়েছি।
আমার সঙ্গেই এর উত্থান আর শেষ।
তাই বিদায় নিতে চাই না।
সবাই আমায় জন্ম দিও অন্তরে অন্তরে
স্মৃতি-স্তন্য পান করিয়ে বাঁচিয়ে রেখ,
তবেই কলিকাতা বাঁচবে ;

কেননা ঐ ময়দান
সে আমারই সমতল দেহ,
ষ্ট্রীট, রোড, এ্যাভেনিউ, লেন,
আমারই শিরা উপশিরা, ধমনী,
সহরের ঘর্ঘর চক্র গর্জ্জন
সেও আমারই হৃদয়ের তোড়।
তাই বিদায়ের ফাঁকা আওয়াজ করি না
নিষ্প্রয়োজন, ঝুঠো, মেকি !”

খাট ধুতি, লম্বা সার্ট, কদম ছাঁটা চুল, ফিতে বাঁধা স্থ জুতা ও ছত্রিশ ইঞ্চি বাঁটের ছাতা লইয়া বিজয় মাধব মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়া কিছুদিন হতভম্ব হইয়া রহিল। সহর ও সহুরে ভাব সম্বন্ধে তাহার খুবই গভীর শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু সরসী দত্তকে দেখিয়া সে শ্রদ্ধা প্রথমে বিস্ময় ও পরে আতঙ্কে পরিণত হইল। লোকটা যেন অলৌকিক। দুই মিনিটে ইকোয়েশন কষিয়া ফেলে, পেনসিলের দুই টানে মেমসাহেবের ছবি আঁকিয়া ফেলে, ভূগোল তাহার জিহ্বাগ্রে, ইতিহাস কণ্ঠস্থ; আর তাছাড়া গান গায় বাঁশী বাজায়, ম্যাজিকও জানে এবং মোক্তার শ্রেষ্ঠ হরিহর বাবুকে অবহেলায় দেশ শার্দ্দূল ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোষের নাইন্টি নাইন ইয়ার প্ল্যান বুঝাইয়া দেয়। যদি কেহ হিমাচল বক্ষ হইতে গৌরীশৃঙ্গ পর্ব্বতটিকে হনুমন্তি ঢংয়ে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বিজয়দের গ্রামে বসাইয়া দিত তাহা হইলেও বোধ হয় বিজয় এতটা অবাক হইয়া যাইত না।

প্রথম কয়েকদিন শুধু মুখব্যাদান করিয়া নূতন মাস্টারের দিকে সে তাকাইয়া থাকিত। পড়া দিলে পড়া করিত, অঙ্ক কষিত, মানচিত্র

অঙ্কন করিত, কিন্তু কথা বলিতে সাহস পাইত না। তৎপরে একদিন মরিয়া হইয়া পাঁচ সাতটা ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: "আচ্ছা মাস্টার মশায়, কলকাতায় আপনারা কি খান?"

সরসী বলিল "কেন? কি আবার খাই! এই মুড়ী, জিলেপি, লুচি, পরেটা, এই সব।"

বিজয় প্রভু-অধম-দাসানুদাসকে-আর-কেন-এ-ছলনা ভাবে বলিল, "য্যাঃ"!

সরসী বলিল, "আরে হ্যাঁ, তাই। আবার কি?"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ধ্যেৎ!"

হরিহর মোক্তারের সহিত সরসী দত্তের যখন তর্ক বিতর্ক হইত তখন পরিবারের ও পাড়ার বহু জ্ঞান পিপাসু লোকে আসরে জমা হইতেন। এলাহি ব্যাপার! এক কোণে বিজয়ের পিতা নীরবে হুঁকা খাইতেন, কোন আলোচনায় তিনি কখন যোগদান করিতেন না। খুল্লতাত বাল্যকালে চতুর্থ শ্রেণী অবধি গড়াইয়া গড়াই পরিবারে চিন্তাশীল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি কখন কখন দুই একটা কথা বলিতেন। সূক্ষ্ম বিচার শক্তিতে গ্রামে এল, এম, এফ, ডাক্তার বগলা গুপ্তের হরিহর মোক্তারের পরেই স্থান। তিনিও হস্তে স্টেথস্কোপ দুলাইতে দুলাইতে কাটা কাটা কথা বলিয়া নিজ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। তর্ক ক্ষেত্রে সরসী দত্ত কিন্তু ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বাক্য ও "শ্লোগান" বানে পদাতিক মধ্যে মহারথীর মতই বিজয় গর্ব্বে বিচরণ করিত এবং গ্রামবাসী সাবালক নাবালক সকলেই তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও দ্রুতগামী বিচার শক্তির এক বাক্যে প্রশংসা করিত।

হরিহর মোক্তারের মতে আধুনিক সভ্যতা অধর্ম্মজাত এবং

পতনোন্মুখ; সুরেন্দ্রনাথের পরে বাংলায় রাজনীতিজ্ঞ কেহ জন্মায় নাই; বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতিই শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষ কথা; স্ত্রী স্বাধীনতা জাতির ধ্বংসের একটা লক্ষণ মাত্র; ইত্যাদি। সরসীর মতে সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃত জাতীয়তা কি তাহা জানিতেনই না। বিদ্যাসাগর ইংরেজের কেরাণী সরবরাহের ব্যবস্থামাত্রই করিয়াছিলেন। স্ত্রী স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা এখনও কেহ দেখে নাই।

হরিহর বলিতেন, "আরে মশাই আপনাদের এখন রক্ত গরম, আপনারা সব কিছুই নেচে কুঁদে করতে চান। লেখায় নাচ, কথায় নাচ, মিটিংয়ে নাচ; একি রাজনীতি? ইস্কুল কলেজে নাচ, ঘরে নাচ, বাইরে নাচ।"

সরসী বলিত, "হিন্দু হয়ে আপনার নাচের প্রতি এ ঘৃণার ভাব কেন? শ্রীকৃষ্ণ নেচে কালিয় দমন করলেন, মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে কয়েক ডজন তীর্থ স্থান সৃষ্টি করে ফেল্লেন, বেহুলা নেচে পতির প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। তা ছাড়া নৃত্য একটা শাস্ত্রের অন্তর্গত। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নৃত্যের সাহায্যে যদি ভগবৎ ভক্তি হেন জটিল বিষয় শেখান যায় ত ইস্কুলে নাচ হলে অন্যায়টা কি হয়? প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস একটা বিশেষ ঘটনা। অর্জ্জুন নৃত্য না জানলে বৃহন্নলার ছদ্মবেশ ধারণ করতেন কেমন করে? হরিসভায় নৃত্য করলে দোষ হয় না, যত দোষ বুঝি 'অ্যালবার্ট হলে' নাচলে?"

হরিহর তর্কে সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া বিচক্ষণ তার্কিকের মত প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতেন, "মিটিং আজকাল যা হয় তাতে নৃত্য করা ছাড়া আর উপায় কি? কেউ চীৎকার করছেন যে সম্পদের সমবিভাগ হলেই ভারত আবার সোনার ভারত হবে; কেউবা
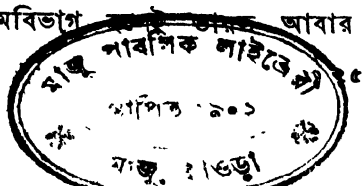
সাম্প্রদায়িক হিসাবে রেলের ভাড়ার ও ডাক টিকিটের মূল্যের ইতর বিশেষ করছেন; কেউবা তোতলাদিগের জন্য একটি পৃথক বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব আনছেন। আর সকলেই এক এক গণৎকার। কেউ একত্রিশ বৎসরে ভারত স্বাধীন করবেন, কেউ ঠিক সতের বৎসরে সব রকম কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করবার জল্পনা করছেন। সহজ কথায় কেউ নেই; কেননা ও সব সহজ কথাতে পাণ্ডিত্য বা অকাল পক্কতা দেখাবার সুযোগ নেই।"

সবাই বলিত, "এইবার মাষ্টর কাৎ হবে।"

কিন্তু সরসী দত্ত নির্ব্বিকার। কিছু মাত্র না দমিয়া তর্ক চালাইত, "আরে মোক্তার মশায়, ধন দৌলত, যশ, মর্য্যাদা, এ সবই ত মায়া আর মোহ। তার সমবিভাগ হলেই মোহ কেটে যাবে। বড় বাড়ী আর ছোট বাড়ী; দুইই ইট, সিমেণ্ট, চূন, আর লোহার গাদা। আসল মূল্য কিছু নেই। সম্পদ বোঝা বিশেষ। গর্দ্দভ হেন নির্ব্বোধ জানোয়ারও বোঝা কমলে খুসী হয়; আর মানুষ তাতে আপত্তি করে!

খুল্লতাত মহাশয় এতকাল নীরব থাকিয়া মত প্রকাশ করিতেন, "তোমরা উভয়েই যা বলেছ তা সারগর্ভ কথা সন্দেহ নেই। তবে যদি নৃত্যই করতে হয় ত রেল গাড়ীতে না করে কোন দালান টালানে করাই নিরাপদ। আর, মাষ্টর, স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে তুমি কিছু বললে না; আমার মতে সকল লেডি ডাক্তারদের আইন করে পাতলুন পরতে বাধ্য করলেই আর কেউ মেয়েছেলেদের লেডি ডাক্তার অথবা লেডি ডাক্তারদের মেয়েছেলে বলে ভ্রম করবে না।"

বিজয় নখর দংশন নিরতভাবে সকল কথা শুনিয়া ভাবিত এ সকল

কথা ত কোন কেতাবেই নাই; ইহারা শিখিল কোথা হইতে? হয়ত বি, এ, পাশ করিলে জানা যাইবে। বগলা ডাক্তারের মতে ভারতবর্ষ যত রকম ভাবে পরাধীন তাহার মধ্যে শতকরা মাত্র দশ ভাগ ইংরেজের নিকট পরাধীনতা; বাকিটা ম্যালেরিয়া, টি-বি, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ অথবা বেরিবেরির নিকট। স্বাধীনতার মানে এই নয় যে অপরের হুকুমে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়া অকাল বা অপঘাত মৃত্যু না হইয়া নিজ বুদ্ধির শিক্ষার বা চেষ্টার অভাবে ঐভাবে মরিবার অধিকার পাওয়া। শরীর, মন আদর্শের পূর্ণ বিকাশের পথ যতদিন না জাতির সকল ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া যায় ততদিন স্বাধীনতার নাম যেন কেহ উচ্চারণ না করেন।

সরসী দত্ত কথাটা একেবারে অস্বীকার করা সমীচীন হইবে না বলিয়া বলিত, "কিন্তু পথ বড়ই দুর্গম বলে যারা ঘরের বাইরে পা বাড়ায় না, তারা অন্তরে অন্তরে পরাভবশীলতা পোষণ করে। জয়ের পথে একটার পর একটা বাধা আসবেই। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা দূর করা প্রথম কাজ।"

বগলা ডাক্তার স্টেথস্কোপটি জোরে জোরে দুলাইয়া রায় দিতেন, "না", মশায়, ওটার কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আসল ব্যায়রামের সিম্পটম বা বহির্লক্ষণ মাত্র। রোগ সারলেই সিম্পটম আর দেখা যাবে না। আপনাদের যত রকম নয় থেকে নিরানব্বই বৎসরের প্ল্যান আছে, তার মধ্যে একটা প্ল্যান সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত যে ভারতের সকল অধিবাসী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ রোগের সুচিকিৎসা করিয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন। শরীরের মনের, সমাজের, আদর্শের ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সকল বিকৃত ভাব

দূর করতে হবে। এর জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় প্রকার চেষ্টারই প্রয়োজন।" সরসী উত্তেজিত কণ্ঠে হাঁক দিয়া বলিত "কিন্তু সর্ব্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ না করলে বাকি কিছুই সম্ভব নয়।"

ডাক্তার মৃদু হাস্য করিয়া একটি গল্পের অবতারণা করিয়া উত্তর দিতেন, "একদা এক রাজকন্যার খুব অসুখ করেছিল। রাজা বল্লেন, 'যে এ রোগের শান্তি করতে পারবে তাকে উপকথার দস্তুর মত অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা ইত্যাদি ইত্যাদি।' ছোট বদ্দি, মেঝো বদ্দি, বড় বদ্দি, হাতুড়ে, ভূতুড়ে, চালপড়া, জল পড়া, মাদুলি-কবচওয়ালা, মন্ত্র, যন্ত্র, হোম, যজ্ঞ; স্বদেশী মতে যা কিছু হয় সব হল। দূর দূরান্তর থেকে ইজের, পায়জামা, লুঙ্গি, কিমানো, আলখাল্লা, হ্যাট, বুরনুস, ফেজ, কুল্লা, রাজসভা সরগরম করে কাচ, পাথর, চামড়ার শিশি বোতলের ছড়াছড়ি লেগে গেল। কিন্তু রাজকন্যার বেমারী যেমন ঠিক তেমনই থেকে গেল। অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা ইতস্ততঃ ধাবমান। চাকরী যায় যায়।

"অবশেষে রাজধানীর বাচাল শ্রেষ্ঠ এক ক্ষৌরকার এসে বল্লে 'অসুখ সারাতে পারি যদি বিধান মত চিকিৎসা ঠিক করা হয়।' সকলে বলল 'বল, বল, কি বল?' নাপিত বল্লে, 'রাজকন্যাকে চৌমাথায় চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে একটি আস্ত তাল গিলে খেতে হবে।' সকলে বল্লে, 'আরে উন্মাদ, তা কি সম্ভব? আস্ত তাল গিলে কেউ খেতে পারে? খেতে গেলেই যে মৃত্যু অনিবার্য্য।' ক্ষৌরকার মাথা চুলকিয়ে বল্লে, 'আজ্ঞে, তা যা বলেছেন, কথাটা ভুল নয়। এ রোগে বা এ রোগের চিকিৎসায়, উভয় ক্ষেত্রেই মৃত্যু অনিবার্য্য।"

সরসী দত্ত প্রশ্ন করিতেন, "গল্পের তাৎপর্য্যটা কি?"

ডাক্তার জবাব দিতেন, "তাৎপর্য্য এই যে আপনারা ভারতের রোগ শান্তির যা ব্যবস্থা করেছেন 'তা ঐ তাল গিলিয়া খাওয়ার সামিল। ছোট ছোট বিষয়ের মীমাংসায় অক্ষম আপনারা কিন্তু বৃহত্তম সমস্যার সমাধানে অক্ষম নন। ম্যালেরিয়া তাড়াতেও পারেন না, এক বিঘে জমিতে পূর্ব্বাপেক্ষা এক ছটাক বেশী ফসল ফলাতে পারেন না, আটাশ ইঞ্চি ছাতিটাকে ত্রিশ ইঞ্চির উপরে নিয়ে যেতে পারেন না; কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ ও সংরক্ষণ, যার অপেক্ষা কঠিন কাজ কমই আছে, তা অনায়াসেই পারেন্। হাঁট্‌তে পারেন না কিন্তু দৌড়াতে পারেন। সাগু হজম করবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু পোলাও কালিয়া ছাড়া কিছু খাবেন না পণ করেছেন।"

সবাই হাসিলে সরসী আরও জোরে হাসিয়া বলিত, "তোফা বলেছেন, আপনার খুব রস বোধ আছে। কিন্তু ব্যারাম সবটাই এক। রাষ্ট্রীয়, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত, সামাজিক; সব এক কথা। ক্যাপিটালিজ্‌ম্ বা ধনিকতন্ত্র দুনিয়ার উপর চেপে বসেছে। এক ঘায়ে সব ভেঙ্গে যাবে। রাষ্ট্রে, সমাজে, মনে, প্রাণে, শিক্ষায়, ব্যবহারে, সর্ব্বত্র বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। মূলে আঘাত করতে হবে, বিষের হাঁড়ি ভেঙ্গে দিতে হবে। তা হলেই ক্রমশঃ বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। বিজয় তোমার খাতা বই সব নিয়ে এস। পড়ার সময় হয়েছে।" খুল্লতাত মহাশয় সকল কথা পরিষ্কার হইল না বুঝিয়া মত প্রকাশ করিতেন, "হুঁ, ডাক্তর যা বলেছে; মিটিং করলে কি মালওয়ারী জ্বর ছাড়ে? সেটি হয় না।"

বিজয় ভাবিত ম্যাট্রিক পাশ করিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে যাইবে তখন যদি দেখে যে সেখানকার সব লোকই তাহার মাষ্টারের

মতই এক একটি অতিমানব, তাহা হইলে তাহার দশা কি হইবে? একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, মাষ্টার মহাশয়, কলকাতার সব লোকই কি বি, এ, পাশ?" সরসী বলিল, "আরে মূর্খ, তাও কি হয়? এগার লক্ষ লোকের মধ্যে এগার হাজার লোকও বোধহয় বি, এ, পাশ নয়।" বিজয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশ্য এগার লক্ষ লোক আছে শুনিয়া অপর প্রকার আতঙ্কের সূচনা হইল, কিন্তু তাহারা সকলেই বি, এ, পাশ হইলে ব্যাপারটা আরও বিপজ্জনক হইত।

সরসীর প্রথম প্রথম গ্রাম্য জীবন বড়ই নির্জ্জন ও বৈচিত্র্যহীন মনে হইত। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার চোখে গ্রামের জীবনের একঘেয়েমীর মধ্যেও নূতনত্ব ধরা পড়িতে লাগিল। কলিকাতায় মানুষ বড়ই অচেনা থাকিয়া যায়। যাহাকে রোজ দেখি সেও বহু বৎসরের পরেও অপরিচিত থাকিয়া যায়। গ্রামে সকলে সকলকে চেনে। পথের ভিখারী, তেলওয়ালা, মুদী, চৌকিদার, পূজারী কেহই অপর ব্যক্তি মাত্র নহে। গ্রামের জীবননাট্যে সকলেরই নাম ধাম ধরণ ধারণ বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়। দুই মাস গ্রামে থাকিয়া সরসী যতগুলি মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইল, কলিকাতায় বিশ বৎসরেও সে তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকের সহিত পরিচিত হয় নাই। গ্রামের পরিচয় আবার মারাত্মক রকম। সকলেই সকলের পুরাপুরি খবর রাখিয়া চলে। সব কথাই জানাজানি হইয়া যায়। কে কবে জ্বরে পড়িল, নূতন জুতা খরিদ করিল, কলিকাতা হইতে পার্সেল আনাইল, কোন কথাই কাহারও অবিদিত থাকে না। এ প্রকার বে আব্রু জীবন যাপন প্রথমে কঠিন মনে হইলেও পরে সহিয়া যায় এবং ক্রমশঃ সহুরে গুজবের পরিবর্ত্তে গ্রাম্য খবরাখবর মনের খোরাক হিসাবে সমানই

পুষ্টিকর বলিয়া বোধ হইতে আরম্ভ করে। সরসীর জামা কাপড়, চশমা, চা পান করিবার কায়দা অথবা ভোজনে পছন্দ অপছন্দ, সকল কিছুই গ্রামে কিছু কালের মধ্যেই পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়া গেল। কেহ কেহ তাহার অনুকরণ আরম্ভ করিল, কেহ বা শুধুই যাচাই করিয়া সন্তুষ্ট হইল। তাহাকেও বহু প্রশ্নের জবাব দিতে হইল।

"মাষ্টার মশায় আপনার কালো পেড়ে ধুতিগুলি কি অর্ডারী না দোকানে পাওয়া যায়?"

"মাষ্টরের চশমা জোড়া কি জর্ম্মানীর না মার্কিন দেশের? দাম কত?" "দত্ত মহাশয়, অলাবু ভক্ষণ করেন না কেন? কোন নিষেধ আছে না কি?"

"কাল যেন খুঁড়িয়ে হাঁটছেন দেখলাম? বাত আছে না কি? রাম কবরেজের একটা কুর্ম্মাদি তৈল আছে, আমার পিসিমার উপকার হয়েছিল।"

সরসী যথাসাধ্য জবাব দিত। প্রথম প্রথম বিরক্ত হইত। পরে সহিয়া গেল; সর্ব্বশেষে নিজেও অপরকে প্রশ্ন করা আরম্ভ করিল।

শালবন, পাহাড় ও বালির নদীর সহিত এই তার প্রথম পরিচয়। দেখিতে ভালই লাগিল; কিন্তু মনের মধ্যে দর্শনসুখ বিশ্লেষণ করিয়া সে তাহার ঠিক জাতি নির্ণয় করিতে পারিল না। এক বৈষ্ণব সন্তান একদা কুসংসর্গে পড়িয়া কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করেন। কি রকম লাগিল জিজ্ঞাসা করায় অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "কিছুটা পালম শাকের মত।" সরসী দত্তও পাহাড়ে নদী ঠিক কি রকম তাহা হঠাৎ ধরিতে পারিল না। "যেন হঠাৎ দেখা হ'ল" বলিয়া তাহার একটি কবিতা সাপ্তাহিক "নিকোটিন" পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল।

অষ্টাবক্র

"এসেছিলাম না জেনে তুমি কে
কি বা কেমন। তাই অবাক লাগল।
তরুণী তুমি কিন্তু অশীতিপরা বৃদ্ধাও।
ও তোমার বুকে কি ছুরির দাগ?
ঈর্ষা পাগল হয়ে মেরেছিল কোন প্রণয়ী?
কিম্বা "সিজেরিয়ান অপারেশন?"
আকাঙ্খা জাগল তোমায় দেখে
কিন্তু আবেগ কোথায়? কি যেন চাইলাম
তুমি দিতে পারলে না।
অভিশপ্ত কিরাতের কত ঘুরে মরি
বুক জ্বলে যায় কোন বিষে
ওষধি সন্ধানে আত্মহারা
গুহায় গুহায় অরণ্যে গাছের কোটরে
পাখীর বাসায়। অধরে কি ছোপ দিয়েছিলে
"সায়ানাইডের লিপষ্টিক" এঁকে?
নয়ত এ জ্বালা কোথা হতে এল?
প্রেয়সী তুমি কি ম্যাকবেথের ডাইনী?
তোমার সঙ্গে ফের দেখা হবে
যখন উন্মত্ত সাইক্লোন হা হা রবে
গিলিয়া ফেলিবে ধরণীকে
আমার মরণ ক্ষণে।"

(৩)

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আর বেশী বিলম্ব নাই। বিজয় টেষ্টে গ্রামের স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরসী দত্তর খ্যাতি অকস্মাৎ আরও আকাশে তুলিয়া দিল। সকলে বলিতে লাগিল "হুঁ মাষ্টর বটে!" বিজয় মাধব যে বিশ্ব বিজয় করিয়া একটা ডেপুটি কিম্বা কিছু হইবে একথা সকল লোকে মানিয়া লইল। তাহার খাটুনি খুবই বাড়িয়া গেল। সকালে পড়া দুপুরে পড়া ও সন্ধ্যায় পড়া। সরসী তাহাকে বিগত কুড়ি বৎসরের পরীক্ষার প্রশ্নমালা আনাইয়া কোন প্রশ্নের জবাবে কি লিখিতে হইবে তাহা শিখাইতে লাগিল। নিতান্ত উদ্ভট রকম প্রশ্ন না হইলে বিজয়কে পরাভূত করা সম্ভব হইবে না।

এই নিয়মে লেখা পড়া শিখার একটা সুবিধা আছে। জ্ঞানের পুর্ণাঙ্গ আলোচনা করিতে অনেক পরিশ্রম হয়। প্রশ্ন ও উত্তরে জ্ঞানের পুর্ণ দেহকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইলে বিষয়টা সংক্ষেপ হইয়া আইসে। মানুষের মনুষ্যত্ব বিচার না করিয়া শুধু তাহার দেহে কয়টি অস্থি, মাংসপেশী, অন্ত্র অবয়ব, শিরা, ধমনী আছে এবং সে উল্লেখযোগ্য কাজ কি কি করিয়াছে ইহার হিসাব করিলে বুদ্ধিকে গভীর জলে নামিতে হয় না। যে মনুষ্যত্ব ও প্রাণ-শক্তি অস্থি ও পেশীকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং কর্ম্মের সহিত কর্ম্মকে গ্রথিত করিয়া তাহার জীবনে ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে সেই মনুষ্যত্বও প্রাণ শক্তির পুর্ণ উপলব্ধি অঙ্গ অবয়ব ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কর্ম্মের তালিকা হইতে সম্ভব নহে। প্রশ্ন ও উত্তরের তালিকারূপী শিক্ষাও মানুষকে জ্ঞানের প্রগতি ও সত্যরূপের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত করে। তাজমহল কিরূপ তাহা

বুঝিতে হইলে কোন কালে কে কি কারণে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিল, কত প্রস্তর ও মজুরী লাগিয়াছিল এবং তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, খাড়াই প্রভৃতির মাপ জোক জানিলেই সে জানা সম্পূর্ণ হইল না। জ্ঞান সৃষ্টির পুর্ণ উপলব্ধি। ভূগোল, গণিত, ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রভৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অঙ্গ অবয়বের হিসাব রাখিলেই জ্ঞান হয় না। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য আধুনিক যুগে পরীক্ষা পাশ করা এবং পরীক্ষা পাশ করার উদ্দেশ্য ভাল চাকুরী পাওয়া। সরসীও এককালে গুরুজনদিগের এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর শিক্ষার ব্যবস্থায় পরীক্ষা ভালই পাশ করিতেছিল। দৈব দুর্ব্বিপাকে ভুলপথে চলিয়া সে উচ্চ বেতনের চাকুরীর গা ঘেঁষিয়া গিয়াও চাকুরী পায় নাই। প্রণয়, প্রেম, বিরহ, ব্যথা, সুদূরের পিয়াসা প্রভৃতি ১৯১৪ সালের পুর্ব্বের ফ্যাসনের প্রেরণা তাহাকে প্রথমত উতলা করে। পাশ্চাত্যের নূতন নূতন ভাব ও রস পরে যেমন যেমন আসিতে লাগিল সরসী ও তাহার বন্ধুরা তেমন নূতন নূতন ভঙ্গীতে মানস ক্ষেত্রে কুন্দন করিতে লাগিল। চির উত্তপ্ত মগজ পাত্র হইতে নির্ব্বিকারে তিক্ত, মিষ্ট, অম্ল, উষ্ণ, শীতল, আমিষ, নিরামিষ সকল প্রকার সিদ্ধ, অর্দ্ধ-সিদ্ধ ও একেবারে কাঁচা মাল মশলা বাহির হইতে লাগিল। এই যে বৈচিত্র্যময়, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী সকল রীতি নীতি বর্জ্জিত রস সর-বরাহের ব্যবস্থা, ইহাই ভাব বিপ্লব। প্রণয়ীরা চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত রজনীগন্ধার বনপথ ত্যাগ করিয়া "ফর্ম" হস্তে সুপ্রজননের "কনট্রাক্ট" করিতে বাহির হইয়া হঠাৎ ঘৃণার আকর্ষণে পতিতা মহলে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। ভাষা মুক্তি খুঁজিতে লাগিল ও অলঙ্কার ব্যাকরণ, ছন্দ প্রভৃতি দূরে ফেলিয়া নিজেকে ঢালিয়া সাজিবার আকাঙ্খায় জান্তব স্বর অভিব্যক্ত হইতেই পুনরারম্ভ করিয়া নব কলেবর

লাভে উদ্যত হইল। কৃষ্টির "বাষ্টিল" ভাঙ্গিয়া মানব মন মুক্ত হাওয়ায় বাহির হইয়া আসিল। শিকল ছাড়া সারমেয় যেমন কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ছুটিয়া খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বিচারে এখানে এক কামড় ওখানে এক কামড় লাফাইয়া বিচরণ করে, পুরাতনকে ত্যাগ করিবার তাড়নায় নূতনের পূজারীও তেমনি খামখেয়ালের চূড়ান্ত করিলেন।

"উল্টারাজার দেশে মানুষে হাতে হাঁটে, পায়ে ছাতি ধরে, অধমাঙ্গে কুর্ত্তা ও উত্তমাঙ্গে পায়জামা পরিধান করে। দিবাভাগে নিদ্রা যায় ও রাত্রে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। টেবিলে বসিয়া চেয়ারের উপর বই রাখিয়া পাঠ করে। ভগিনীকে মাতুল সম্বোধন করে ও মাতুলকে বলে দিদি। শয়নকালে বালিস ভোজন করিয়া ভাত মাথায় দিয়া শয়ন করে। ইহারা গোময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে ও দুগ্ধ পচাইয়া বাগানে সার দেয়। এ দেশের অভিজাত মহলে স্কন্ধে অশ্ব লইয়া বিচরণ করা প্রচলিত। উল্টারাজার দেশে সকল শব্দের উল্টা উচ্চারণই রীতি এবং একই পুস্তক উল্টা পাল্টা করিয়া ধরিয়া পাঠ করিলে উহা কখন কাব্য, কখন ইতিহাস, কখন বা ধারাপাত বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এ দেশে দেয়ালে অঙ্ক কষিয়া ফ্রেমে আঁটিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং এখানের অন্দর মহল বাহিরে ও বাহির মহল অন্দরে। নারীরা এদেশে ফুল দিয়া চচ্চড়ি রাঁধেন ও কণ্ঠে পলাণ্ডু মাল্য ঝুলাইয়া প্রসাধন সম্পূর্ণ করেন। এই অভিনব রাজ্যে বর্ণ হইতে স্বাদ পাওয়া যায় ও অম্ল তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস বর্ণ হিসাবে বিচার করা হয়। এক কথায় এই রাজ্য অতি অভিনব।"

সরসী দত্ত যে সময় সার্ভিসের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন, সেই সময় নূতন কৃষ্টির বান পূর্ণ বেগে বহিতেছিল। তাঁহারা কায়মনো-

বাক্যে নূতনের পূজা সুসম্পন্ন করিতেছিলেন। পরে বানে মন্দা পড়িলে খতিয়া দেখা গেল যে উল্টা স্রোতে প্রাণ পণে দাঁড় বাহিয়া তাঁহারা ক্লান্ত ও বিফল মনোরথ হইয়াছেন, উপরন্তু ভাল ভাল চাকুরীগুলি নির্ব্বোধের দলে লুঠিয়া লইয়াছে। এই বিফলতা তাঁহাদের মনের বিপ্লব আরও বাড়াইয়া দিল, এবং তাঁহারা সৃষ্টির আপাতঃ উদ্দেশ্যহীন গতির সমালোচনার্থে কল্পনাকে গোয়েন্দার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শীঘ্রই দেখা গেল যে সবই ভুয়ো। উচ্চ যাহা তাহা আসলে নীচ, নীচ যাহা তাহাই উচ্চ। সুন্দর ও কুৎসিত, পূজ্য এবং ঘৃণ্য প্রভৃতি ভেদাভেদ একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছে হয় ধননীতি নয় সাম্রাজ্যবাদ। কেহ কেহ এ সন্দেহও প্রকাশ করিলেন যে ইহা ইহুদিদিগের কারসাজি। অনুসন্ধান ঠিক মত চলিলে সকলেই ধরা পড়িবে এ কথা নিঃসন্দেহ। সরসী কিন্তু ধনিক-সন্তান বিজয়কে এ সব বড় কথায় না আনিয়া শুধু পরীক্ষা পাশ করাইতে লাগিয়া গেলেন। কার্য্য ঠিক মত চলিতে লাগিল। কর্ম্মীর অলস কর্ম্ম শক্তি কিন্তু অভিব্যক্তির "মেটিরিয়াল" খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে গ্রামের লোকগুলার কথাবার্ত্তা, চাল চলন এমন কি চেহারা অবধি সরসীর নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিত। বিজয়ের পরীক্ষাটা অভিশাপের মতই যেন সরসীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া দেখা দিত। সে ছটফট করিতে থাকিত ইহাদের অচঞ্চল সন্তোষের আবহাওয়ায়। রোমন্থন-নিরত গাভীর ন্যায় ইহারা একই ভাব, একই কর্ম্ম, ব্যবহার ও অনুভূতির পদ্ধতি গ্রাম্য গৃহস্থের অপরিবর্ত্তণীয় নিরেট মন্থর গতিতে

ক্রমাগত উদ্গার ও পুনরুদ্গার করিয়া দিন কাটায়। অথব বুঝিবা নিজ নিজ গর্ত্তের অধীশ্বর ভেকেদের সহিতই ইহাদের তুলনা আরও উপযুক্ত। সেই কর্কশ শব্দপ্রিয়, ক্ষুদ্র গণ্ডীগত ভাব। অসহ্য! দেহ গ্রাম ছাড়াইয়া বাহিরে যাইতে না পারিলেও মন তাহার উধাও হইয়া যেখানে মুক্তির মালঞ্চে স্বাধীন আত্মারা কামনা সায়রে অবগাহনান্তে যথেচ্ছাচারের আনন্দ চন্দনে চর্চ্চিত দেহে কুঞ্জে কুঞ্জে তৃপ্ত বাসনা কুসুম চয়ন করিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে মাল্যরচনা করিয়া দিন যাপন করেন সেই সেই দেশে ঘুরিয়া আসিত। একাগ্রচিত্তে যে এ মায়া-মরীচিকা অনুধাবন করিবে তাহাও তাহার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইত না। হয়ত ঠিক যে সন্ধিক্ষনে লুক্রেৎসিয়া বা ক্যাথারীন কতকটা ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই সময়েই হঠাৎ খুল্লতাত আসিয়া হাঁক দিতেন, “বলি, মাষ্টর আছ হে?” অস্ফুটকণ্ঠে রজকিনীর কর্ণে প্রণয় কথা নিবেদন কালে যদি প্রাঙ্গনে এক সঙ্গে জোড়া দুই তিন গর্দ্দভ সমস্বরে ডাকিয়া উঠিত তাহা হইলে যেরূপ তাল ভঙ্গ হইত, খুল্লতাতের হ্রেষারবে সরসীর স্বপ্নও তেমনই নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙ্গিয়া যাইত। তাই অতঃপর সে গ্রাম ছাড়িয়া দূরের শালবনে কখন কখন চলিয়া যাইত। এখানে বহু পুরাতন একটি মন্দিরের ভিত্তির পাথর কখানা শুধু পড়িয়াছিল। তাহারই একটার উপরে বসিয়া সরসী বাঁশী বাজাইত অথবা কল্পনার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া বন্দর হইতে বন্দরান্তরে ভগ্ন আশায় বোঝাই “ট্র্যাম্প” জাহাজের মত ভাসিয়া চলিত। কোন কোন দিন পাহাড়ে নদীটার শুষ্ক বক্ষে বালুর উপর বসিয়া ভাবিত, “কখনও দুই কূল ছাপিয়া বানের জল শুধু, কখনও শুধু শুষ্ক প্রখর বালুরাশি। জীবনও এমনই বিপরীতের ক্রীড়া

ক্ষেত্র।" রাখালদের ডাকিয়া মনের কথা বলিবার চেষ্টা করিত। তাহারা কিছুকাল অবাক হইয়া মাষ্টরকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিত, "হুঁ, 'মাষ্টর বটে।" তৎপরে নিজ কার্য্যে চলিয়া যাইত।

বহু মানব একত্র হইলে যেমন পরিচিতের সান্নিধ্য সন্ধানে এখানে পাঁচজন ওখানে দশজন গণ্ডীবদ্ধ হইয়া জটলা করে; শালবনের শাল গাছগুলিও তেমনি এখানে পাঁচটি ওখানে সাতটি ঘনিষ্ঠভাবে গজাইয়া উঠে। অরণ্যে অসংখ্য বৃক্ষরাজি যেন পৃথক পৃথক পরিবারে বিভক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত ও সতত নিজেদের একান্ত নিজস্ব আলোচনায় নিযুক্ত। কোথাও কোথাও দুই একটা পরিবার বিচ্যুত গাছ একলা দাঁড়াইয়া হিংসাকুল দৃষ্টিতে অপরদিগের প্রতি তাকাইয়া আছে। সরসী বৃক্ষ মহলেও এই সখ্য মিলনের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ভাবিত, "আমি ঐ রকম একটা ধরছাড়া সকল বন্ধনমুক্ত যূথ ভ্রষ্ট গাছের মত। কুঁদিয়া গর্জ্জিয়া ঝরা পাতা উড়াইয়া যতই না চেষ্টা করি অন্যদের কাছে আনিতে, জীবন আমার অপরের সঙ্গ ছাড়া ভাবেই চলিতে থাকিবে। কত বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে ঝরিয়া নিঃশেষ হইবে, কত বসন্ত আমার বক্ষে নূতন আবেগ পত্রে পত্রে সঞ্জীবিত করিয়া বিদায় লইবে, অপূর্ণ আশা আমার ঝরা পাতার মতই চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিবে; কত শীত, কত গ্রীষ্ম আমার অঙ্গে নিজেদের চিহ্ন রাখিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বশেষে একদিন আমি অদূরের ঐ বাত্যা উৎপাটিত বৃক্ষকাণ্ডের মতই শুধু বিগত গৌরবের প্রাণহীন প্রমাণ মাত্র হইয়া পড়িয়া থাকিব। কালক্রমে তাহাও আর থাকিবে না; ধীরে ধীরে পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইবে।" সরসী ভাবিত আর ভাবনার ভার কমাইবার জন্য বাঁশীতে বরোঁয়ার সুর ভাঁজিত।

অদূরে নিশ্চল পাহাড়টা প্রাগৈতিহাসিক অতিকায়ের মত উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে। কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে মাথাটা মাটির মধ্যে ঢুকাইয়া আর বাহিরে আনিতে পারে নাই। পর্ব্বতের একটা দমবন্ধ ভাব আছে। বুকের মধ্যে যেন সহস্র যুগের আকাঙ্ক্ষা গুমরাইয়া গুমরাইয়া অবশেষে শীতল নিস্পন্দ মরণেই শান্তি পাইয়াছে।

মরুসম শুষ্ক হৃদয় নদীটি যেন নিরাশার ক্লান্ত ক্ষীণ অশ্রুধারা বুকে ধরিয়া মাতা ধরণীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট ক্রন্দনে মনোবেদনা ব্যক্ত করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া শোকোচ্ছ্বাস প্রবল হইয়া উঠে; তখন উন্মত্ত আর্ত্তনাদে চোখের জলে চরাচর ভাসিয়া যায়। সরসী ভাবে; বাঁশী বাজায়, আবার কখন কখন পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির কারিয়া কাব্য প্রচেষ্টায় মাতিয়া উঠে। বেশীক্ষণ সে এ রকম অজ্ঞাতবাসে থাকিতে পারে না। গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হয়। বিজয়ের পড়া, নয়ত ভোজনের সময় কিম্বা কাহার সহিত তাস খেলিবার কথা। বিজয়ের পরীক্ষা ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতে লাগিল। নিজস্ব অবসরও কমিয়া কমিয়া প্রায় লোপ পাইল।

বিজয় একদিন জ্যামিতির চাপে মরিয়া উঠিয়া বলিল, "কি হবে ছাই ভাল পাশ করে? আর আমি পারি না। না হয় গরু চরিয়ে দিন কাটাব।" সরসী অবাক হইয়া দেখিল যে কেঁচোতেও ফণা ধরিতে পারে। বিজয়কে বলিল, "আরে ছোকরা, পাশ করবে না ত করবে কি? কোন ক্ষমতা যার নাই তাকে পাশ করতেই হবে। দুনিয়ার যত অপদার্থ মিলে আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করে রেখেছে। পরীক্ষা চালুনীর মত। বড় বড় মগজ এ চালুনী পার হয়ে সংসারের রন্ধন শালায় পৌঁছাতেই পারে না। যেখানে মাল মশলা তৈরী হয়ে ভাগ

বাঁটোয়ারা হয় সেখানে মস্তিষ্কবাণের প্রবেশ নিষেধ। ঠিক পাশ করবে, না করে যাবে কোথায়? অন্য পথ নেই, ঐ এক রাস্তা ভাণ্ডারে পৌঁছাবার।" বিজয় হতভম্ব হইয়া মাষ্টার মহাশয়ের বাণী শুনিল। বলিল, "মাষ্টার মশায়, শুধু বোকা লোকেই পরীক্ষা পাশ করে? তা হলে আপনি এত পাশ করলেন কি করে?"

সরসী কোন ঠাসা হইয়া বলিল, "বোকা আর সাধারণ বুদ্ধি এক কথা নয়। তা ছাড়া আমি আরও পাশ করতে পারতাম, করিনি। আমি যা বলছি তার মানে এই যে পৃথিবীর যারা এখন মালিক তারা অল্প কয়জনে যাতে সকলের কাঁধে চড়ে স্থখে থাকতে পারে তার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। তুমি তোমার জীবদ্দশাতেই দেখতে পাবে যে অর্দ্ধেক পরিশ্রম করে ডবল খাওয়া পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। মৌমাছির মত হাজার হাজার কুটির থেকে মধু লুঠে এনে চাকে জমা করা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত সম্পদ বলে কিছু থাকবে না। সব ধন সম্পত্তি সকলের হয়ে যাবে। কেউ আর 'আমার ঘোড়া, আমার গাড়ী' বলে চেঁচাতে পারবে না। যাক, বড় কথা ছেড়ে দাও, পড়াটা কর!" বিজয় পড়া করিতে লাগিল। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, অসংখ্য কোণ, বৃত্ত, ব্যাস, কেন্দ্র, সমকোণ, সরলরেখা ইত্যাদি ইত্যাদি। ষড়যন্ত্রটা বড়ই জটিল রকমের। কিন্তু নিজের নিজের ধান, মরাই, বাক্স, প্যাটরা, পকেট, মণিব্যাগ প্রভৃতি না থাকিলে চলিবে কি করিয়া। মাষ্টার মহাশয়কে আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। জ্যামিতি শেষ হইলে ভূগোল ও ইতিহাস। দেশে, দেশে, যুগে, যুগে, সেই নগর, ব্যবসা বাণিজ্য, বন্দর, কারখানা; সেই চাষবাস, ধনসম্পদ ক্রয় বিক্রয়; সেই রাজ্য, রাজস্ব, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ, লুঠতরাজ। ষড়যন্ত্রটা শুধু

জটিল নহে, কালের প্রারম্ভে তাহার সূত্রপাত ও শেষ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বিশেষ করিয়া ক্ষীণ বুদ্ধি বিজয় মাধব গড়াই নামক বালককে কেন্দ্র করিয়া তাহার সমাপ্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। পড়া চলিতে লাগিল। সরসী দত্ত বিজয়কে অন্যমনস্ক সন্দেহ করিয়া বলিল, "ও রকম হাঁ করে আছ কেন? ঠিক করে পড়।"

বিজয় বলিল, "আজ্ঞে না, ভাবছিলাম যদি সকলের টাকা কারুর না হয়ে সকলের হয়, তা হলে টাকাগুলো কার কাছে থাকবে? যদি কারুর কাছে না থাকে তাহলে কোথায় থাকবে? যদি কোথাও না থাকে ত কি হবে?"

সরসী চটিয়া বলিল, "আবোল তাবোল বকছ কেন? টাকার কোন প্রয়োজন নেই। ওটা লোক ঠকাবার যন্ত্র বিশেষ। গেলে, আপদ যাবে।" বিজয় বলিল, "কিন্তু, তা হলে খাবে কি?"

সরসী রাগিয়া বলিল, "ছাই! পড় বলছি মন দিয়ে! ঠিক সময় মাথায় মুগুর ঠুকে বুঝিয়ে দেব কি খাবে আর কেমন করে খাবে।" বিজয় সেদিন পড়া ঠিকমত করিতে পারিল না। ভাবিতে লাগিল, ভাত খাইবে কি? কিন্তু কাহার ভাত? যে খাইবে তাহার ভাত ত তাহারই ভাত, তাহা হইলে সে ভাত সকলের কি করিয়া হইবে? সকলের ভাত হইলে কেহ তাহা খাইবে কি করিয়া? সকলের জামা কি কেহ পরিতে পারে; অথবা কাহারও অঙ্গের জামা কি সকলের হইতে পারে? কি মুস্কিল!

অতঃপর সরসী অবশ্য আর কোনদিন বিজয়কে কম্যুনিজমের বক্তৃতা দেয় নাই। বিজয়ও কাহার ভাত কে খাইল, কাহার জামা কে পরিল প্রভৃতি সমস্যার কোন উপযুক্ত মীমাংসা করিতে না

পারিয়া পুনরায় আউরঙ্গজেব, উমিচাঁদ, ক্লাইভ, ইংরেজের প্রতিভা, ফরাসীদিগের ধূর্ত্ততা, ইয়াং সিকিয়াং এর পথ, হিমালয়ের উচ্চতা, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ, মার্কোনী ও এডিসনের আবিষ্কার গৌরব, নর শব্দ ও কৃ ধাতু, Rite, right, write, wright শব্দের পার্থক্য, প্রভৃতি মগজ সংস্কৃতির উপাদান নিচয়ে মনোনিবেশ করিল।

সরসী দত্ত মুড়ী ও নারিকেল খাইয়া জলযোগ করে, কূপের ধারে বসিয়া সাঁওতাল ভৃত্যের তোলা জলে স্নান করে, বিউলীর ডাল, ডিংলার ঝাল ও মৌরলা মৎস্য সহযোগে রামশাল চালের ভাত খায়। পরিধানে তাহার ফরাসডাঙ্গার কাপড় ও ৯৯ মার্কা গ্লাসগো নয়ানসুকের পঞ্জাবী কুর্ত্তা ও যন্ত্রে সেলাই করা কাবুলী স্যাণ্ডেল। বাঁশের বাঁশীতে আধুনিক সুর বাজায়। ভবিষ্যতের ভাষায় কবিতা রচনা করে ও অন্ধকারে বাহির হয় না, ভূতের ভয় করে। জীবনের ছন্দ কখন ত্রিপদী, মন্দাক্রান্তা কখনও বা ফ্রি ভার্স। স্বাস্থ্যটা যেদিন ভাল থাকে ভাবে ভারতের নষ্ট গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইলে অন্তত একবার ইয়োরোপে সাম্রাজ্য স্থাপনটা করিতেই হইবে। গা ম্যাজ ম্যাজ করিলে ভাবে মিলন ও সাম্যের পথই সুগম। হাঁটিতে হাঁটিতে রক্ত গরম হইয়া উঠিলে ভাবে ভারতব্যাপী বিরাট বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়া দুনিয়ার বাজার পণ্যের বন্যায় ভাসাইয়া দিবে। চুপ করিয়া বসিলে মনে হয় "একস্‌প্লয়টেশন" ভাল নয়। সকলে পরস্পরের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া অথবা কাপড় কাচিয়া দিন গুজরান করাই প্রকৃষ্ট। অন্ধকারে তারার আলোতে দূরের শালবীথিকা যখন স্বপ্নের প্রাকার বলিয়া ভ্রম হয় ফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া আসে তখন মনে হয় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আবার

নাগরিকারা অগুরুর গন্ধে কেশ পাশ সুবাসিত করিয়া মন্দির পথে নৈবেদ্য সাজাইয়া গজেন্দ্র গমনে অগ্রসর হইবেন। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সরসী তাহাদের পানে তাকাইয়া থাকিবে। অস্ফুট বীণার গুঞ্জন দূর হইতে শ্রবণ পথে প্রবেশ করিবে। ক্ষণিকের দেখা যে অভিসারিকার সঙ্গে, তাহারই উদ্দেশ্যে পদ্মপত্রে নূতন ছন্দে কবিতা রচনা করিবে। প্রাচীন ভারতের চিত্রও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারে না। নেপথ্যে এসরাজ, সেতার, সারেঙ্গ বাজিয়া ওঠে। হামাম হইতে সদ্য উত্থিতা ইরাণীরা গুলাব, বুলবুল, পেশওয়াজ, সুর্মা, পেয়ালা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া আসরে উপস্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে আবার সুযোগ বুঝিয়া ক্লীয়োপেট্রা, পম্পাডুর, উইলোস্কা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রিটা গার্বো, মার্লেন ডিট্রিশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুন্দরীরা জুটিয়া যায়।

সরসী উত্যক্ত হইয়া পুনরায় শালবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে একটা নকল শান্তির আবহাওয়ায় মনটা অনেক হাল্কা থাকিত। যেই যাহাই বলুক, বহু সংখ্যক ছাগল চরিতে দেখিলে "ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে" ভ্রাম্যমান যে কবি প্রাণ তাহাও "সি লেভেল" ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে না।

সেদিন সরসীর মন বিশেষ উতলা ছিল। তাহাদের চক্রের চণ্ডী চক্রবর্ত্তী অনেকদিন পরে একখানা পত্র লিখিয়াছে। চণ্ডী তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—ভিক্টোরীয়া মেমোরিয়ালের পার্শ্বে রাস্তার বেঞ্চিতে বসিয়া তাহারা দীর্ঘ দীর্ঘ সন্ধ্যা আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছে। তাহাদের যুগ্ম কল্পনার আলোকে যুগ যুগান্তরের অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া সত্যকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে! চণ্ডী লিখিয়াছে,

"হে বন্ধু, নির্ব্বাক তুমি, গ্রাম্য আফিমের ফুল
তোমায় করেছে স্বপ্ন পথের পর্য্যটক।
বাদুড়ের মত পা উপরে মাথা নীচে
ঝুলে আছ। ভাব, তারার উপরে বসে আছ।
চীনা রীতিতে শাস্তি দিয়েছ আমাদের
বাজারের চত্বরে বসে থাকি হাত পা বাঁধা।
ভাবি ত্রিলোকের কথা ; স্বর্গে সেণ্টপিটার দাড়ী নাড়ে,
মর্ত্যে মিলান, বার্লীন, রোম, লেনিনগ্রাড, পারী,
পাতালে বিয়াট্রিচে সুন্দরী ঘুরে মরে দান্তের হাত ধরে।
তুমি অরণ্যের লগ ক্যাবিনে
চক্ষে এক্সরের চশমা এঁটে
পৃথিবীর অন্তঃস্থল অবধি সারভে করছ,
প্রণয় পাগল কেঁচোর মত সুড়ঙ্গের পথে।
কি ভাবনা যে তোমার বক্ষে।
এক্‌কোয়া রিজিয়ায় দ্রবমান হৃদয়
সে যে সোনার।"

চিঠিখানা দূর হতে নিক্ষিপ্ত চুম্বনের মত "ইথারে" ভেসে আসা মিষ্টত্বে ঠাসা। সরসী চঞ্চল হৃদয়ে একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। দূরে ছাগলের পাল চরিয়া বেড়াইতেছিল। সরসীর হঠাৎ মনে হইল ইহারা তাহার শত্রু। সে যেন শত্রু পুরীতে বন্দী। দূরের পাহাড়টা দুর্গ প্রাকার ; নদীটা দুর্গ পরিখার মত তাহার পলায়ন আগুলিয়া রহিয়াছে ; শাল বৃক্ষমালা যেন বল্লমধারী প্রহরীর দল। পিছনে অকস্মাৎ ধাবমান অশ্বের পদধ্বনির মত আওয়াজ হইতে

লাগিল। সরসী সহসা বুঝিতে পারে নাই যে সেটা বাস্তব কিছু। দুর্গ, প্রাকার, পরিখা, প্রহরী ও বল্লমের মধ্যে সে শব্দটাও অশ্বারোহীর আগমন সঙ্কেত বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। নারীকণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাষ্টার মশায়, পালান।"

ঊর্দ্ধে কল্পনালোক হইতে সরসী মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতলে নামিয়া আসিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল অদূরে একটা ক্রোধোন্মত্ত মহিষ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সরসী একবার, "বাবারে" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়া দৌড় দিল। একবার চকিতের জন্য মনে হইল মহিষটার পিছনে লাঠি হস্তে এক নারী মূর্ত্তি। কিন্তু শার্দ্দুল বিতাড়িত হরিণ যেমন আত্মরক্ষার আবেগে শ্যামল দূর্ব্বাদলকে উপেক্ষা করিয়া শুধু পলাইতে ব্যস্ত থাকে; সরসী তেমনি নারী মূর্ত্তি দেখিয়াও না দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে লাগিল।

পশ্চাতে প্রলয় সৃষ্টি আলোড়িত করিয়া তাণ্ডব গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বিনাশের ঢক্কা নিনাদে বন কন্দর কঠোর দ্রুম্ দ্রুম ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সরসী ছুটিয়া চলিয়াছে; দিকবিদিক জ্ঞান হারাইয়া, শুধু কোন প্রকারে পশ্চাদ্ধাবিত মরণের নিষ্ঠুর কবল হইতে বাঁচিবার জন্য। নিমেষের মধ্যে তাহার ভিতরটা যেন পাথরের মত জমাট হইয়া গেল। শুধু এক চিন্তা, এক আকাঙ্ক্ষা, একই প্রচেষ্টা। জোরে! আরও জোরে! থামিলে চলিবে না, হাঁফাইয়া গতির বেগ কমিলে চলিবে না! ফাটিয়া যাক বুক ক্ষতি নাই কিন্তু আরও জোরে! যেন কত যুগ ধরিয়া এ উন্মাদ গতির অগ্নিকুণ্ডে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে। শেষ অবধি হয়ত জলন্ত উল্কার মতই [illegible]ণ নিবৃত্তি আসিবে; কিন্তু থামিলে চলিবে না, জোরে, আরও

জোরে! বুক শ্বাস গ্রহণে অক্ষম, পা আর চলিতে চায় না, কিন্তু থামিলে চলিবে না!

সরসী অনভ্যস্ত হইলেও দৌড় মন্দ দেয় নাই। প্রথমে মহিষটা তাহার খুবই কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সদ্য জ্যামুক্ত তীরের মত সরসী এক ঝটকায় ব্যবধানটা অনেকটা বাড়াইয়া দিল। তার পর অনন্ত দৌড়ের পালা। ধুতি হাঁটুর উপরে উঠিয়া আসিল, কুর্ত্তা বৃক্ষশাখায় লাগিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল, পরিপাটি কেশ পাশ উড়িয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িল; বাঁশীটা কোথায় গেল তাহার ঠিকানা নাই। ভয় ও পরিশ্রম জনিত স্বেদ গ্লানিতে শরীর ভিজিয়া উঠিল। এর কি শেষ নাই?

হঠাৎ হোঁচট খাইয়া সরসী ধরণী বক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রসারিত হইয়া পড়িয়া গেল। আর আশা নাই। দূরের ঝড়ের গর্জ্জন যেমন ক্রমশঃ কাছে আসিয়া হঠাৎ বজ্রনিনাদে চরাচর ডুবাইয়া দেয়, মহিষের পদধ্বনি তেমনি নিকট হইতে আরও নিকটে আসিয়া নিষ্ঠুর ঘাতকের অট্টহাস্যের মত তাহার আত্মার অন্তরতম কোন অবধি কাঁপাইয়া বিকট ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। কিন্তু কই শাণিত শৃঙ্গ ফলকে তাহার বক্ষ ত বিদারিত হইল না? কি হইল?

মহিষটা টাল সামলাইতে না পারিয়া তাহার পতিত দেহের উপর দিয়া ঝড়ের মত চলিয়া গেল। অদৃষ্টগুণে তাহার দেহে জানোয়ারটার পা লাগিল না। কিছুদূরে গিয়া মহিষটা দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। সম্ভবত মাটিতে পতিত বস্ত্রের পুটুলির মত সরসীর দেহটা যে সেই পলায়নপর মানুষটাই, মহিষ তাহা বুঝিল না।

তাহার রণস্পৃহাও হঠাৎ একটা ধাক্কা পাইয়া থামিয়া গেল। যে

নারীমূর্ত্তি সরসীর নয়নপথে ক্ষণিকের জন্য পড়িয়া মিলাইয়া গিয়াছিল তাহা অকস্মাৎ রঙ্গস্থলে আসিয়া মহিষের শাসনে জীবন্ত হইয়া উঠিল। "বজ্জাত কোথাকার।" বলিয়া মহিষের পৃষ্ঠে বংশখণ্ড দিয়া কয়েক ঘা লাগাইয়া তরুণী বলিল, "লাগেনি ত মাষ্টার মশায় ?" মহিষটা বেইজ্জত হইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সরসী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "না, লাগেনি কিছু। ভাগ্যে আপনি ছিলেন, নয়ত আবার হয়ত গোঁতাতে আসত।"

"হ্যাঁ, ওর গোঁতানর সখ আমি ভেঙ্গে দিয়েছি। বেজায় দুষ্ট এইটে। প্রায়ই লোককে তাড়া করে।"

সরসী দেখিল, তরুণীর বয়স, সতের আঠার। রংটা ময়লা আর মুখে প্রচুর বসন্তের দাগ। কিন্তু তাহার চক্ষে তাহাই "জান দার্ক," "বোডিসিয়া," ও রাণী লক্ষ্মীবাইএর মিলিত আবির্ভাব বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে বলিল, "আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনি না থাকিলে আজ আমার এইখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হত।"

তরুণী লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি যে ছাই বলেন। প্রাণ আবার কোথায় বাঁচালাম ? ওটাত আমাদেরই মহিষ। আমায় ভয় করে।"

সরসী বলিল, "আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার এ ঋণ কখন শোধ করতে পারব না।"

তরুণী লজ্জা পাইয়া বলিল, "ধ্যেৎ !" বলিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

সরসী কম্পিত হস্তে মাথার চুলগুলা যথাস্থানে বসাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া গ্রামের দিকে চলিল।

কে এ তরুণী ? যেন মাতৃরূপিনী শক্তির বালিকা মূর্ত্তি ! কি

তেজ, কি মিষ্ট কণ্ঠস্বর, কি সরলতা! লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সন্তানের রক্ষার্থে অক্লান্ত যুদ্ধের নিদর্শন তাহার স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে অঙ্কিত। মাতা ধরণীর মতই সে মুখচ্ছবি শ্যামল। গতি তাহার লীলায়িত, দাঁড়াইবার ভঙ্গী অনুপম। কাহাদিগের কন্যা এ?

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে দেখা হইল খুল্লতাতের সহিত, আরে এই যে মাষ্টর! কি হয়েছে, কাপড় চোপড় ছেঁড়া, ধূলোমাখা। কোথায় গেছলে হে মাষ্টর?"

বহুকষ্টে ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা করিলে পর খুল্লতাত বলিলেন, "ওঃ, ঘোষেদের মহিষটা যে! উটা বড্ড মারকুটনে! বড় বেঁচেছ মাষ্টর।"

সরসী বুঝিল মহিষটা গ্রামের একাংশের জমিদার ঘোষেদের; অপরার্থে তরুণী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গতিনাশিনী ঘোষেদের বাড়ীর মেয়ে।

খুল্লতাত চলিয়া গেলে পর সে মুখহাত ধুইয়া ঘোষ পরিবারের পূর্ণ তদন্তের জন্য বাহির হইল। একজন বলিল ঘোষেদের এক ছেলে "নেড়া" সে এখন কলিকাতায়। আর একজন বলিল, "বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয় হাঁফানিতে ভোগেন, তবে আজকাল ভালই আছেন।' তৃতীয় সংবাদ-দাতার নিকট শুনা গেল, ওদের একটা মামলা চলছে বিরামপুরের বাবু-দের সঙ্গে। কেহই আর কোনমতে ঘোষ পরিবারের নারীদের কথা বলে না। উহাদের কত বিঘা জমি, কয় সরিক, রাজার খাজনা কত দিতে হয় প্রভৃতি বহু সংবাদ পাওয়া গেল; কিন্তু পরিবারের কন্যা সম্পদের কথা কেহ ভুলিয়াও উত্থাপন করিল না। অবশেষে বে-পরোয়া হইয়া সরসী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "আর মেয়ে জামাই সব কোথায়?"

উত্তর হইল, " ওঃ বড় জামাই রেলে চাকরী করে। ১৫০৲ টাকা

বেতন তাছাড়া উপরি আছে। এলাহাবাদ না কাণপুর কোথায় থাকে। ছোট মেয়েটার বিয়ে দিতে পারে নি। একে যা রূপ তায় আবার আধ পাগল।" সরসী বহুকষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কি? আধ পাগলা মানে?"

"মানে আর কি? বছর পাঁচ ছয় আগে বসন্ত হয়ে যায় যায়। সারল বটে, কিন্তু মুখের দিকে তাকান যায় না। আর সেই থেকে বেটাছেলেদের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মাছ ধরে, গাছে ওঠে, কি না করে? ওকে নিয়ে কর্ত্তার বড় চিন্তা।"

সরসী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কেন চিন্তা কেন?"

"আরে মাষ্টর, তা তুমি কি বুঝবে? কন্যাদায় আর কি! বুঝেছ?"

সরসী দত্ত লিখিল,

"কোথায় লুকিয়েছিলে এতদিন?
অজানার জঙ্গলের মধ্যে।
চিনিনি কেন, দেখিনি কেন?
মার্জ্জনা করো এ অপরাধ।
ইতিহাসের পাতায় কিন্তু পেয়েছি
তোমার উদ্দাম পদচিহ্ন
অতীতের আব্রু তোমায় করেছিল পর্দ্দানসীন।
আজ লজ্জা ভুলে অথবা ঘটনাচক্রে
পড়ে গেলে ধরা জীবন্ত মানবীর দেহে।
আমার উদ্ভট চক্রান্ত প্রিয় প্রাণ
ডিপ্লোম্যাসি করে মরে তোমায় ধরবে বলে,
কিন্তু তুমি নিমেষে জয় করে নিলে।

আমার মনের প্যাঁচ পরিচয়ের রোদের ঝাঁঝে,
কুয়াসার মত উবে গেল।
দেখলাম প্রখর তোমার রূপ ;
নায়েগ্রার মত, কঙ্গো নদীর মত,
এভারেষ্টের চূড়ার মত।
প্রাণ আমার এক্স, বি, এঞ্জিনের মত
গতানুগতিকের রেল ভ্রষ্ট হয়ে
প'ড়ল গিয়ে কোন্ খাদে ?
কে টেনে তুলবে তাকে ?
তুমিই পারবে, প্রেমের কপিকল দিয়ে।
একপাশে কাৎ হয়ে কাদায় আটকে
পড়ে আছি। আগুন নিভেছে
ষ্টীম নাই, কলকব্জা বিগড়েছে !
যদি এসে তুলে মোরে বসিয়ে দাও
জীবনের লাইনে সোজা করে
আবার চলব প্রচণ্ড তেজে,
সিগনাল, বাতি, ঝাণ্ডা
কিছু না মেনে, দুর্দ্দম, অক্লান্ত,
তুমিই থাকবে "লিভার" হাতে
"টিল ডেথ ডু আস পার্ট" ॥

সরসী কবিতাটা যথাস্থানে কি করে পাঠাবে এই চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন উপায় ভাবিয়া পাইল না। গ্রাম্যদেশে হঠাৎ কি উপায়ে পত্র লিখিবে ? জটিল সমস্যা। কয়েকদিন চিন্তা করিল।

একবার ভাবিল বিজয়ের সাহায্য লইবে ; কিন্তু সে চিন্তা ত্যাগ করিল। তৎপরে এক উপায় ঠাওরাইল। গ্রামে অনেক ছেলে ছোকরা মুক্ত হাওয়ায় সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও হাতে একটা ছুরি, কাহারও বা লাট্টু, অথবা ঘুড়ী। সরসী ভাবিল ইহাদের সহিত মেলা-মেশা করিলে একটা পথ নিশ্চয়ই খুলিয়া যাইবে। প্রথম প্রথম চেষ্টা বিশেষ অগ্রসর হইল না। যাহার সহিতই ভাব করিতে যায় সে শুধু সরসীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া থাকে। কোন কথার উত্তর দেয় না। কেহবা বহু চেষ্টার পরে "হুঁ আজ্ঞ্যা" বা ঐ জাতীয় কিছু বলিয়া প্রস্থান করে।

সরসী কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া এক পুরাতন বন্ধুর সাহায্যে অনেকগুলি মাসিক পত্রিকার ছবি আনাইয়া ফেলিল। ইহার পর কার্য্য কিছুটা সহজ হইয়া আসিল। গ্রামের ছেলেরা যে ভারতীয় চিত্রকলার এতটা পক্ষপাতী হইবে তাহা সরসী কল্পনা করিতে পারে নাই। "নাদু" নামক এক বালককে বহু প্ররোচনান্তে একখানা ছবি গ্রহণ করাইতে পারিল। পরদিন তাহার ঘরে ছেলের ভীড় জমিয়া গেল। সকলেই একখানা ছবি চাহিতে আসিয়াছে। সরসী সমবেত সমঝদারদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া সে দিনের মত কার্য্য শেষ করিল। অতঃপর প্রত্যহই গ্রাহক আসিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে সরসীর ছবির ভাণ্ডার খালি হইয়া আসিল। ছেলেরা কিন্তু খুবই একাগ্রচিত্তে ছবি ব্যতীত অপর সকল প্রসঙ্গ অবহেলা করিয়া চলিত। গ্রামে কে কোথায় বাস করে, কি পড়ে, কি খায়, প্রভৃতি বিষয় তাহারা বড় একটা আলোচনা করিতে চাহিত না। অগত্যা সরসী একদিন নাদুকে একমুঠা লজেঞ্জস দিয়া ফেলিল। কে যেন বলিয়াছে যে হৃদয়ের

প্রবেশ পথ উদরের ভিতর দিয়া। কথাটা মোটামুটি যে সত্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কারণ, যে নাড়ু এতকাল সরসীর সহিত কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা করিতে একান্ত নিমরাজি ছিল, শুধু ছবির লোভে তাহার নিকটে ক্ষণিকের জন্য হাত পাতিত মাত্র ; সেই নাড়ুই এখন সরসীর ঘরে প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিত। সরসীও কৃপণ হস্তে তাহাকে একটা দুইটা করিয়া বিদেশী মিষ্টান্ন বিতরণ করিত। এই রূপে বন্ধুত্ব ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল এবং নাড়ু অতঃপর সরসীর ফুট ফরমাস খাটিতে আরম্ভ করিল। মাষ্টার মহাশয় যে একজন অসাধারণ মানুষ একথাও এখন নাড়ু সর্ব্বক্ষেত্রে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। এক কথায়, নাড়ু সরসীর অনুগত ভক্ত বিশেষ হইয়া দাঁড়াইল।

অতঃপর একদিন সরসী নাড়ুকে প্রশ্ন করিল, "ঘোষেদের ছোট মেয়ের নাম কি ?"

নাড়ু অবাক হইয়া কিয়ৎকাল নির্ব্বাক থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, পাগলী ?"

সরসী রুষ্ট কণ্ঠে কহিল, "পাগলী আবার কি ? পাগলী কি কারো নাম হয় ? ভাল নাম কি ? উমা, দুর্গা, সুকুমারী, এই রকম নাম ?"

নাড়ু বলিল, "তা কে জানে। ওর নাম পাগলীই ত। সুকুমারী ত আমার মা'র নাম।"

"আরে, তোমার মায়ের নাম আমি জানতে চাচ্ছি না। ঘোষেদের ছোট মেয়ে, যাকে তোমরা পাগলী বলে ডাক, তার ভাল নামটা কি খবর নিয়ে আমায় ব'লো ; বুঝলে ? বেশী সোর গোল করোনা যেন। চুপ চাপ জেনে এসে বলো।"

নাদু বলিল, "আচ্ছা।"

পরদিন নাদু আসিবার পূর্ব্বেই গ্রামের এক তাসের বন্ধু আসিয়া সরসীকে বলিয়া গেল, "কি হে মাষ্টর, ঘোষেদের মেয়ের নাম দিয়ে কি হবে ?"

সরসী বলিল, "কে বললে যে কিছু হবে ? ঘোষেদের মেয়ে আবার কে ?"

বন্ধু বলিলেন, "ঐ নেদো। ও সকলকে জিজ্ঞেস করছে, 'ঘোষেদের ছোট মেয়ে পাগলীর নাম কি ? মাষ্টার মহাশয় জানতে চান।' বলি কি ব্যাপার বলত !"

সরসী বিরক্ত স্বরে বলিল, "আরে বাবা, যত উড়ো কথা এনে আমায় জ্বালাও কেন ?"

বন্ধু যাইবার পর খুল্লতাত আসিয়া বলিলেন, "হুঁ হে মাষ্টর, ছেল্যা-টাকে কি শুধাইছিলে হে ?"

সরসী বলিল, "কোন ছেলে ? কিছুত জিগেস করি নাই।"

নাদু দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "মাষ্টার মশায়, পাগলীর নাম সরলা।"

খুল্লতাত হাসিয়া উঠিলেন, "তবে না মাষ্টর, জিগেস না করনি ? তুমিও খুব চালাক বটে ! হুঁ হে, খুব চালাক।"

সরসী আমতা আমতা করিয়া বলিল, "এই দেখছিলাম গ্রামে সব মেয়েদের নাম কি রাখে। কলকাতায় ও সব নাম আজকাল আর চলেনা। আমরা সব নূতন নূতন নাম রাখি।"

খুল্লতাত বলিলেন, "মেয়েদের নামের লিষ্টি তৈয়ার করছ ? তা বেশ, বেশ। তবে, আরও ঢের ভাল বিটী ছেল্যা ত আছে ; পাগলীর নাম দিয়ে কি হবে ?"

সরসী বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, "কি বললেন খুড়ো মশায়, ছেলে ছোকরাদের সামনে!" খুল্লতাত ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হুঁ হে।" বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নাড়ু বলিল, "পাগলীকে জিজ্ঞেস করতে বল্লে, 'নাম দিয়ে কি হবে বাঁদর কোথাকার।' আপনি জানতে চেয়েছেন বলতে হেসে বল্লে, 'ও মাষ্টার? আচ্ছা, বলিস আমার নাম সরলা'।"

সরসী চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "সোজা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে?"

নাড়ু বলিল, "কেউ বলতে পারলে না ত কি করব।" বলিয়া টেবিল হইতে ন্যায্য পাওনা হিসাবে দুই মুঠা লজেঞ্চস তুলিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইল।

কর্ণে শুধু একই ধ্বনি বাজিতে লাগিল। 'ও মাষ্টার? আচ্ছা বলিস ......" অপরের কৌতূহল যে মার্জ্জনা করে না সে যদি মাষ্টারের বেলায় নাম অনুসন্ধান করার মত এত বড় বেয়াদবিও অবাধে মাপ করিয়া দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মাষ্টার তাহার অন্তরেই আছে। "ও মাষ্টার? আচ্ছা বলিস......"এ যেন বিজয়ের পূর্ব্বাভাস। কয়টি মাত্র কথা, কিন্তু, যেমন ছদ্মলিপিতে একটা কথার মধ্য দিয়া বহু কথা জানাইয়া দেওয়া যায়, তেমনি এই কটা কথার মধ্যে কত যুগান্তের কথা লুকান রহিয়াছে। "হে প্রিয়তম, তুমি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছ, আমিই যে তোমার, ত আমার নাম দিয়া কি হইবে? তুমি যে আমায় মনে রেখেছ তাতেই আমার জীবন সফল হয়েছে। তুমি যে আমার নাম জানতে চেয়েছ সে আমার বহুজন্মের তপস্যার ফল। হে প্রিয়, নাম আমার সরলা; তুমি কিন্তু আমায় যে নামে ডাকবে,

তাই আমার নাম ; যে সুরে বাজাবে আমার হৃদয় বীণা সেই সুরেই ঝঙ্কৃত হবে।" দিক হারাইয়া নাবিক যখন অনন্ত সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়, প্রতি মুহূর্ত্তে যখন তাহাকে মরণের নিকট হইতে আরও নিকটে আনিয়া ফেলে, তখন যদি হঠাৎ সে উর্দ্ধে পাখীর ডাক শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে ধ্বনির মধ্যে সে তখনি প্রাণের আশ্বাস লাভ করে। নিমেষে মরণ দূরে সরিয়া যায় ও জীবনের উৎসে তাহার মরণোন্মুখ হৃদয় চোখের পলকে স্নিগ্ধ সতেজ হইয়া উঠে। জীবন সমুদ্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সরসী হাল ছাড়িয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। দিক অথবা গন্তব্য বলিয়া তাহার কিছু ছিল না। "বলিস আমার নাম সরলা" এই শব্দে যে সে একাধারে "কম্পাস" ও "চার্ট" পাইয়া যাত্রার একটা নির্দেশ লাভ করিল। অতঃপর একটা দুইটা পত্র, দুই একটা কথা—তারপর—তারপর কি সে কল্পনা সরসীর অন্তর আতস বাজীর রংয়ে রঙ্গীন করিয়া তুলিল।

আসলে ব্যাপারটা ঠিক সাহিত্যিক নজীর অনুযায়ী ক্রম বিকশিত না হইয়া কতকটা নৈসর্গিক আকস্মিকতা অবলম্বন করিয়া চূড়ান্তে পৌছাইয়া গেল। প্রথম পত্রখানা (কবিতা সমেত) নাদু সরলার হস্তে দিল খুবই গোপনে ও সন্তর্পণে ; কিন্তু লিখন পঠন কুশলতার অভাবে সরলা সে পত্রখানা নিজ মাসিমাতার নিকট লইয়া গেল পড়াইবার জন্য। ইহার জন্য তাহার ডাক নামটাও কতকটা দায়ী ছিল বলিলেও ভুল হয় না। মাসিমাতা যৌবনে কিছু কিছু নভেল নাটক প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি চিঠি ও কবিতাটি পাঠ করিয়া শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে উহা প্রণয় নিবেদন। দ্রুতপদে সরলার মাতার নিকট গিয়া বলিলেন, "ও দিদি, ওমা কি হবে, হ দেখ।" মাতা বুঝিলেন কোন এক যুবক সরলাকে

দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া প্রেমপত্র লিখিয়াছে। কবিতা লিখিতে জানে না, ভাষাও মার্জ্জিত নহে কিন্তু প্রেম পত্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরলার পিতাও আসিলেন, তিনি ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন, "কে সরসী মাষ্টার? গড়াইদের সেই মেয়ে মুখো চ্যাংড়া ছোকরা? কি লিখেছে, দেখি!" পাঠ করিয়া বলিলেন, "এভারেষ্টের চূড়ার মত! হুঁ! দাঁড়াও ছিপটি দিয়ে চূড়া দেখিয়ে দিচ্ছি।" ছিপটি সন্ধানে প্রায় নির্গত হন এমন সময় মাসিমাতা বলিলেন, "বলি, জামাই বাবু, রাগে ত মাথা গরম করে ছুটেছ, কিন্তু ও ছেলেটি কে, কি জাত, কেমনতর ছেলে বলত!"

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "তা দিয়ে কি হবে? আমার মেয়েকে এ রকম অশ্রাব্য চিঠি লেখা, দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।" মাসীমাতা বলিলেন, "তা দেখিয়ে দিও এখন; কিন্তু ছেলে যদি ভাল হয়, স্বজাত হয়, তা হলে বিয়ে দিয়ে দাও না কেন? সরলার যা রূপ গুণ, তাতে বিয়েত হবে বলে মনে হয় না। মাথা গরম না করে খোঁজ খবর করত?""

মাতাও বলিলেন, "হুঁ, তাইত, বটে ত! তুই ভাগ্যিস ছিলি তা নইলে ওর যা বুদ্ধি, গিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলত। যাও গো, যাও, গিয়ে খোঁজ খবর করে এসে বলো।"

ঘোষ মহাশয় অগত্যা "ছিপটির" কথাটা চাপা দিয়া চলিলেন, গড়াইদের গৃহে দিকে।

সরসী দূর হইতে ঘোষেদের গৃহের দিকে নজর রাখিয়া বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, প্রথমে অল্প গোরগোল, তৎপরে পুরুষকণ্ঠ ও সর্ব্বশেষে ঘোষ মহাশয়কে স্বয়ং গড়াই গৃহাভিমুখে আসতে দেখিয়া

সে বংশীটি লইয়া ধীরে ধীরে দূরপথে চলিতে আরম্ভ করিল। উদ্দেশ্য গা ঢাকা দিয়া থাকা এবং ব্যাপার কতটা গড়ায় দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে "প্ল্যান" ঠিক করা।

ঘোষ মহাশয় গড়াইদের বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন খুল্লতাত চিৎ হইয়া নাসিকা গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া শায়িত। বহুকষ্টে তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "শুনছ হে?"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ ত, শুনছি বটে ত।"

"বলি, শুনছ হে?"

"হুঁ হে, শুনছি ত।"

"বলি, শুনছ হে?"

"শুনছি না ত কি? এত চিচাচ্ছ কেনে?"

"ঐ মাষ্টর।"

"হুঁ ত, মাষ্টর বটেত।"

"উ কি জাত?"

"কেনে বল ত? জাত দিয়ে কি হবে?"

"উ কি জাত হে? লিখাপড়া কত দূর?

"জেতে কায়েত। বি, এ, পাশ।"

"হুঁ, বি, এ, পাশ? বটে?"

"হুঁ হে, বি, এ, পাশ বটে।"

ইত্যাকার আলোচনান্তে ঘোষ মহাশয় বুঝিলেন যে সরসী বি, এ, পাশ, সুপুরুষ এবং অবিবাহিত। জাতি ঘরও উপযুক্ত। বলিলেন আগামী কল্য ছেলেটিকে দেখিতে আসিবেন এবং যদি কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পরে খুল্লতাত বিজয়ের পিতাকে বলিলেন, "দাদা, শুনেছেন, মাষ্টরের সঙ্গে ঘোষেদের পাগলীর বিয়ে।"

"ঘটকালি কে করল ?"

"ঘোষেদের মোষটা।"

"হুঁ, মোষটা কি হে ?"

"হুঁ মোষটাই ত।"

বিজয়ের পিতা ভাবিলেন ভ্রাতা কোন প্রকার রসিকতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি পুনরায় তাম্রকূট সেবনে নিরত হইলেন।

সরসী নীরব পদসঞ্চারে ক্রমশ শালবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে এই চিন্তা যে ঘোষ মহাশয় যদি অধিক গোলযোগ করেন ত হয়ত গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে হইবে। প্রেমের পথ সততই বিপদ সঙ্কুল। কিন্তু পরিণামে যে ক্ষেত্রে মিলন সম্ভাবনা মোটের উপর নাই বলিলেই চলে, সে ক্ষেত্রে পলায়নটা নিতান্তই চিরকালের মত এবং "মেন প্লটের" সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্যুত। তাই মনে হইতে লাগিল চিঠিটা না লিখিলেই হইত। অবশ্য তরুণী তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল ঠিকই. এবং প্রণয়ের চিরন্তন প্রথানুযায়ী তাহার পক্ষে ঘোষ কন্যাকে পত্র লেখাটা কিছুমাত্র বে-আইনী হয় নাই ; কিন্তু গ্রাম্য ফাট ধরা জমিদারীর মালিক, তাহার বিচার বুদ্ধি অল্পবিস্তর ন্যায় শাস্ত্র বহির্ভূত হইতেই পারে ; সুতরাং ফলাফল অনিশ্চিত।

সরসী কয়েকটা ঘন সন্নিবিষ্ট শালগাছ পার হইতেই সামনে দেখিল সরলা। গাছ কোমর বাঁধিয়া একটা নীচু ডাল ধরিয়া ঝুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই জিভ কাটিয়া নামিয়া পড়িল। সরসী বলিল, "তুমি

এখানে।” সরলা কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সরসী তাহার চাহনিতে অপ্রস্তুত হইয়া ঘামিয়া উঠিল। বলিল, “আমার চিঠিখানা...”

“মাসীকে দিয়েছি।” বলিয়া সরলা দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল। সে ভাবিল, এ লোকটা মহিষ দেখিয়া পলায়, আমায় দেখিয়া থতমত খাইয়া যায়, যাত্রার পালার মত সুরে কথা বলে ; এ কি প্রকার জীব ? অথচ ভাবভঙ্গী শত্রুতা পূর্ণ নহে, বরং ভালই। সরসী ভাবিল, মাসীমাতাকে নিজের প্রেম পত্র দেখাইল, এ কি তাহা হইলে সত্য সত্যই সরলা ? প্রণয় ভীতি, লজ্জা কিম্বা স্ত্রীলোক সুলভ স্বাভাবিক কথা গোপন করিবার স্পৃহা, ইহার কি কিছুই নাই ? এ রমণী ‘রত্ন’ কেমন করিয়া এই কাঁকরের দেশে জন্ম গ্রহণ করিল ?

এ কথা ও কথা ভাবিতে ভাবিতে সরসী গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ভাবিল সম্ভব এখনই “নোটিস” পাইবে অবিলম্বে বিদায় হইবার। কিন্তু স্মিতহাস্য উজ্জ্বল মুখে খুল্লতাত তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিলেন। বলিলেন, “হুঁ হে মাষ্টর, তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি ?”

“অর্থাৎ ? কি বুদ্ধি দেখলেন ?”

“আরে, ঘোষের পো দৌড়ে এল, তোমার ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখতে। এতক্ষণ রসন চৌকী বায়না করতে গিয়েছে বোধ হয়। কি ব্যাপার বলত ? মেয়ের যা ছিরী, বেশ দেবে থোবে এখন। তোমার আর ভাবনা কি ?”

সরসী ন্যাকা সাজিয়া বলিল, “কার মেয়ে, কি মাথামুণ্ডু বক্‌ছেন আপনি ?”

"আরে, রাখ, রাখ! সব জানি আমি। কাল পাকা কথা বলতে আসবে। তেল-সাবান-পাউডার মেখে ঠিক হয়ে থেক। আমি হব বরকর্ত্তা।"

সরসী নকল বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, "কি জ্বালাতন। খুড়োমশায় ক্ষেপলেন না কি?"

"হুঁ হে মাষ্টর, আমিই ক্ষেপলাম বলে! তুমি কি ব্রহ্মাস্ত্র মেরে নিজের কাজ গোছাচ্ছ আর ক্ষেপলাম আমি!"

পরদিন যথা সময়ে জমিদার ঘোষ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে গ্রামের ভটচাজ মশায় ও অন্দরে পরদার আড়ালে সরলার মাসীমাতা ও মাতা ইত্যাদি। সরসী লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়া গেল লেনীন, স্টালীন, গর্কী, ইবসেন ও রাসেলের কথা; ভুলিয়া গেল ভারতের অর্থ ও রাষ্ট্রনীতির শত সহস্র শাখা প্রশাখার হিসাব। মনে হইল সৃষ্টিতে শুধু এই গ্রামখানাই সব জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত এবং সে দুনিয়ার বাজারে যাচাই হইতে বসিয়াছে।

তাহার সকল কথাতেই জমিদার বাবু "বাঃ বেশ!" ও ভটচাজ মহাশয়, "উত্তম ও যুক্তি সঙ্গত" ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে পরীক্ষায় পুরা নম্বর দিয়া পাশ করাইতে লাগিলেন। অন্দরে মহিলারা, "আহা. কি সুন্দর ছেল্যা গো।" ইত্যাদি মন্তব্য করিয়া বাহির মহলের রায় বহাল করিলেন।

অতঃপর সরলার কপাল গ্রামে একটি প্রবাদের মত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিজয় পরীক্ষার পড়াতে দুই এক দিন ঢিলা দিয়া ফেলিল, কিন্তু সরসী নির্ম্মম ভাবে তাহাকে পুনরায় হালে জুতিয়া দিল।

পরীক্ষার কয়েক সপ্তাহ পরেই সরসীর বিবাহ বিশেষ সমারোহের

সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। জমিদার ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "বাবাজি, আর চাকুরী করিয়া কাজ নাই। অমুক মহলের দেখা শুনা তুমিই কর আর মেয়েটাকে চোখের কাছেই থাকতে দাও। আর আমরা কদিনই বা আছি!"

সরসী ধনতন্ত্রের আবর্ত্তে পড়িয়া হাঁ, না কিছু না বলিয়া কর্ত্তার নির্দ্দেশ মত খাজানা, সেলামী, প্রভৃতির চর্চ্চায় মনোনিয়োগ করিল। সরলা অপরাপর নারীদের উপদেশ মত নিজ বসন্ত চিহ্নিত শ্যাম মুখশ্রীর প্রসাধনে যত্নবতী হইল; কেননা মহিষ অপেক্ষা মানুষ বশ করিতে অধিকতর মেহন্নতের প্রয়োজন হয়।

শুধু বিজয় তাহার পরীক্ষান্তের অনন্ত অবসরে বসিয়া ভাবিত; এ কি হইল? বি, এ, পাশ, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মাষ্টার মহাশয় এ কি করিলেন?

তাহার নিম্ন বিলম্বিত অধর আরও যেন চিন্তায় ঝুলিয়া পড়িল। কথায় তোতলাম কিছু বাড়িয়া গেল। উচ্চ শিক্ষিত মানুষের যে চিত্র সে নিজ মনে আঁকিয়া ছিল, তাহা যেন সর্ব্বৈব ভুল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শেষে কি এই দেখিতে হইবে যে জজেরাও আসামীদিগকে মুক্তি দিয়া নিজেরাই কারাগারে বসবাস করিতেছেন! কলিকাতা শেষে একটা বড় গ্রামেরই মত কিছু দাঁড়াইবে না ত?

শুধু খুল্লতাত বলিতেন, "হুঁ মাষ্টর বটে! তিন চালে বাজি মাৎ!"

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইতে আর কয়েকদিন মাত্র দেরী। গড়াই পরিবারে কাহারও মনে সন্দেহ মাত্র নাই যে বিজয় কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষা পাশ করিবে। তাই সকলে বিজয়ের কলিকাতা যাত্রার বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। কি পড়িবে, কোথায় থাকিবে, কাপড় জামা এখান হইতে করাইয়া লইবে

অথবা কলিকাতায় গিয়া ব্যবস্থা হইবে, ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব ও পাল্টা জবাবে গড়াই গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। কেহ বলিল হষ্টেল নামধেয় বাসস্থানে থাকাই প্রশস্ত, কেহ উত্তর দিল, "হুঁ, জায়গা ভাল বটে, তবে খৃষ্টান হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।" খুল্লতাত বলিলেন, "ডাক্তার হওয়াটাই ভাল হবে।" পিতা বলিলেন, "ওতে সরকারী চাকুরীত হয় না, স্বাধীন ব্যবসার মত। ব্যবসাই যদি করতে হবে ত আড়তের কাজটা কি এত খারাপ?"

মাসিমাতা একবার কলিকাতায় পূজার সময় দশ দিন ছিলেন। তিনি বলিলেন, "এসব গেঁয়ো কাপড় চোপড় ওখানে চলবে না। মিহীন ধুতি, সিল্ক টুইলের সার্ট, পম্পস্থ, এ সব পরতে হবে। তা ছাড়া কলেজের জন্যে আল্লাকার কোট আর ফিতা বাঁধা সু জুতা। একটা বর্ষাতি লম্বা কোট, একটা হাত ছড়ি, একটা হাত ঘড়ি; এও দরকার।"

পিতা বলিলেন, "হুঁ, ছেল্যেটাকে ঐ করে উচ্ছন্নে দাও আর কি।"

পিসিমাতা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "ওখানে ভাল দুধ পাওয়া যাবে ত? না হয় একটা ভাল দেখে গাই নিয়ে যাক। বাছার আমার দুধটা যদি ভাল না জোটে ত শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে!"

মেশো মহাশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি বলিলেন, "কর্ম্মস্থানে পৌছিয়া অবস্থানুযায়ী বিচার ব্যবস্থা করিলেই উত্তম। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া লাভ কি? আমরা কয় জনে উহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা যাইব এবং সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া আসিব। ইহাই সুযুক্তির কথা।"

বিজয় নিজের পুরাতন পুস্তক, খাতা পত্র, কলম, দোয়াত, রুলার প্রভৃতি সরঞ্জম স্টীল ট্রাঙ্কে একবার সাজায় আবার বাহির করিয়া পুনরায় সাজায়। কাপড়, জামা, আলোয়ান, জুতা নাড়িয়া চাড়িয়া সূক্ষ্ম বিচার করিয়া চিন্তা করে, "কলিকাতায় এ সব চলবে ত? না, হয়ত সব কিছুই নতুন কিনতে হবে।" এলার্ম ঘড়ীটা সঙ্গে যাইবে, না রাখিয়া যাইতে হইবে তাহাও ভাবনার কথা। ওটা সকলেরই সময় দেখিবার জন্য প্রয়োজন হয়। উপকথার তিন বুড়ীর এক চক্ষুর মত। লইয়া চলিয়া গেলে অপর সকলে কানা হইয়া বসিয়া থাকিবে। একটা তিন হাত ঘোরা বাইসিক্ল, টেব্‌ল্ ল্যাম্প একটা, আর দুই শত বৎসরের ক্যালেণ্ডার সংযুক্ত একখানা ব্লটিং প্যাড। এগুলি সবই একপ্রকার পারিবারিক আসবাবের অন্তর্গত। লইয়া গেলে গৃহ অন্ধকার হইয়া যাইবে; অথচ লইয়া যাইবার ইচ্ছাও খুবই প্রবল। বিজয়ের পিতা হঠাৎ একদিন চিরসহচর হুঁকাটিকে ঘরের কোণে রাখিয়া আসরে নামিয়া আসিলেন। তিনি এক এক কথায় বহু তর্কের সমাধান করিয়া দিলেন। "বই খাতা প্রভৃতি সবই নূতন হবে, শুধু অভিধান আর ব্যাকরণ এই সব নিয়ে যাবে। শালওয়ালা একখানা নূতন আলোয়ান দিবে যাবে। চার জোড়া নূতন ধূতি, চারটা পাঞ্জাবী কুর্ত্তা, দুইটা কোট চারটা সার্ট ও তা ছাড়া মোজা গেঞ্জি, রুমাল ও তোয়ালে। আর সব এইখানেই রেখে যাও। সাইকেল, আলো, ও সব কিছু নিতে হবে না। সেখানে বাসা ঠিক হ'লে আসবাব পত্র হারু (খুল্লতাত) ঠিক করে দেবে। যাবার আগে দিদিমা, সেজ মাসীমা ও ছোট পিসীমার সঙ্গে দেখা করে এস।"

এইরূপ ডিক্টেটরীয় চালে সকল ব্যবস্থা নিমেষে হইয়া গেল। বিজয়

সমস্যা সঙ্কুল গৃহ ত্যাগ করিয়া কয়েকদিনের জন্য এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বিভিন্ন আত্মীয়, কুটুম্ব মহলে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাংলার এই ভবিষ্যৎ হাকিমটিকে সকলেই অতি ভোজন করাইয়া একেবারে চলৎশক্তিরহিত করিয়া আনিল। অবশেষে বিজয় পেট ব্যথায় কাতর অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিল।

পরীক্ষার খবরও বাহির হইল। সে প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে ও গ্রাম্য স্কুলের অপরাপর ছাত্রদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। সকলে বলিল, "হুঁ, ই ত জানাই ছিল! বিজয় আমাদের লিখাপড়ায় সকলের সেরা। তা ছাড়া মাষ্টর বড্ড পড়াইছিল হে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রাম্য জনমত উভয়পক্ষ হইতেই বিজয় কলেজে পড়িয়া একটা কিছু হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইল, এবং কলিকাতা যাত্রার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে লাগিল। কলেজ খুলিতে এখনও দুই মাস বাকি; কিন্তু এত কলেজের মধ্যে কোনটিতে ভর্ত্তি হইবে, কোথায় থাকিবে, এ সকল বিষয় স্থির বুদ্ধিতে বিচার করিয়া ঠিক করিতে হইবে। এইজন্য বিজয়ের পিতা বিধান দিলেন যে খুল্লতাত, মেশোমহাশয় প্রভৃতি আটজন অল্প বিস্তর নিকট সম্পর্কের লোক বিজয়কে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিবেন এবং সকল বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে পর বিজয়কে পাঠে নিযুক্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। নিখর্চ্চায় দুই মাস কলিকাতা ভ্রমণের সুযোগ পাইয়া সকলে খুবই খুসী মনে যাত্রার জন্য পুঁটুলী বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন।

মাসিমাতা বিজয়ের পিতার সকল নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া পাঁচ প্রকার মোরব্বা, ছয় প্রকার আচার ও দুই তিন প্রকার আমসত্ত্ব টিন

ও বোতল জাত করিয়া ঝুড়িতে বসাইয়া বাঁধিয়া দিলেন। খুল্লতাত ও অপরাপর আত্মীয় স্বজন যাঁহারা সহযাত্রী হইবেন বলিয়া ঠিক হইয়াছিল সকলে আলোচনা করিতে লাগিলেন খাদ্য সামগ্রী কলিকাতায় উপযুক্ত রকম পাওয়া যাইবে কি না। বহু তর্ক বিতর্কের পরে ঠিক হইল, সাবধানের মার নাই এবং বিদেশ বিভূমে কি জুটিবে কি না জুটিবে, আন্দাজের উপর চলিয়া লাভ নাই। সুতরাং থলে ভরিয়া রামশাল, সীতাশাল, অড়র, বিউলি, আলু, পেঁয়াজ, পস্ত, তেঁতুল, গুড়, ছোলা প্রভৃতি রসদ সংগ্রহ করা হইল। ব্যক্তিগতভাবেও কেহ সুপারী কেহ তামাক কেহ বা বিড়ী ও জরদার পুঁজি করিলেন। লেপ, কম্বল, কাঁথা, তোষক, চাদর ও বালিসের পর্ব্বত সৃষ্টি হইল এবং বিভিন্ন আকৃতির তোরঙ্গ, পুঁটুলী ও চুবড়ীর আতিশয্যে বিজয়ের বিজয়যাত্রা গ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

যে দিন সে বাহিনী কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া স্টেসনে গিয়া শিবির স্থাপন করিল, সেদিন মনে হইল বুঝি মধ্য এশিয়া ত্যাগ কালে আর্য্যরা এই রকম করিয়াই অস্থাবর সম্পদভার বহন করিয়া ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দূর হইতে অসংখ্য পুঁটুলী ও চুবড়ীগুলিকে শস্ত্র সরঞ্জাম বলিয়া ভ্রম করিয়াই দ্রবীড় নৃপতিগণ বিনাযুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়া সিন্ধু ও গঙ্গাতট পরিত্যাগ করেন। একথা যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাইত যে ঐ সকল ভয়াবহ পিণ্ডাকৃতি বস্তু নিচয় শুষ্ক, তৈলাক্ত, ঘৃতপক্ক ও অপরাপর জাতীয় খাদ্য এবং সাত পুরুষের সঞ্চিত পুরাতন বস্ত্র, শয্যা ও আসন মাত্রে পরিপূর্ণ, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস ভিন্নপথে চলিত। আধুনিক আর্য্য, আংশিক আর্য্য ও আর্য্য ঘেঁসা মানব সমাজে যাত্রার সরঞ্জাম আরও

বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায় বলীয়ান হইয়াছে দেখা যায়। বর্ত্তমানে মাথা পিছু দুইটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক, তিনটি টিনের বাক্স, ছয় সাতটি পুঁটুলী, চারিটি ঝুড়ি ও চুবড়ী, দুইটি বিছানা ও গণ্ডা দুই বাল্টি, মগ, গাড়ু, ঘটি টিফিন কেরিয়ার ও কুঁজা; মোট অন্তত ছাব্বিশ দফা তৈজসপত্র বর্জ্জিত হইয়া একান্ত ছোটলোক ব্যতীত কেহ ভ্রমণে বাহির হইতে পারেন না। এই হিসাবে প্রাচীন আর্য্যরা দশ হাজার নরনারী শিশু একত্র হইলে সঙ্গে নিশ্চয়ই দুই লক্ষ ষাট হাজার বস্তা পুঁটুলী লইয়া চলিতেন। তৎসঙ্গে যে অন্ততঃ দেড় হাজার ঘোটক, সাড়ে সাত শত উষ্ট্র, আট হাজার গাভী বৎস ও ষণ্ড, একত্রিশ সহস্র ছাগ ও ছাগশিশু এবং সহস্রাধিক সারমেয়, মার্জ্জার ও অপরাপর পশু আকাশ পথ ধূলায় অন্ধকার করিয়া অগ্রসর হইত তাহাও অভ্রান্ত সত্য। এই জাতীয় আগমন যে দ্রবীড়দিগের মার্জ্জিত চক্ষে নৈসর্গিক বিভীষিকার মতই দেখাইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। নচেৎ তাঁহারা রাজ্য ছাড়িয়া ভূত বিতাড়িত গ্রামবাসীর মত পলাইতেন না। শত সহস্র পশুর হ্রেষা, হাম্বা, প্রভৃতি বিভিন্ন রব ও তৎসঙ্গে আর্য্য রমণীদিগের কলহ ঝঙ্কার, শিশুদিগের ক্রন্দন ও আর্য্যদিগের স্বাভাবিক আবেগ প্রসূত বেদধ্বনি, সকল কিছুর সমন্বয়ে যে কলরোলের সূচনা হইত তাহার সম্মিলিত শক্তির নিকট কৃষ্টি জর্জ্জরিত প্রাণ দ্রবীড় জাতি কেমন করিয়া দাঁড়াইবে?

বিজয়রা যখন সপরিবারে ও সবান্ধবে স্টেসনভূমি দখল করিল, ট্রেন আসিতে তখনও তিন চার ঘণ্টা বাকি। সে আবির্ভাবে সৃষ্টি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং দূর দূরান্তর হইতে দর্শকগণ জমা হইয়া ব্যাপারটি আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। ট্রেন আসিলে পর পূর্ণ তের

মিনিট কাল শুধু মাল ওঠান চলিল। গাড়ী লেট হইবে বলিয়া স্টেসন মাষ্টার বিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, শিশুরা কাঁদিয়া উঠিল, নারীরা তারস্বরে উপদেশ দিতে লাগিলেন, গুড়ের হাঁড়ি সশব্দে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল ও সর্ব্বশেষে বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেন হাঁফাইতে হাঁফাইতে চলিতে আরম্ভ করিল। ইণ্টার ক্লাস গাড়ী। বসিবার বেঞ্চিগুলি অয়েলক্লথের গদী আঁটা, আড়ম্বরের ব্যর্থ অভিনয়ের মত। উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণের যে সুখ তাহা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক কারণ বর্জ্জিত। "আমি দেড়া মাশুল" বলিয়া গাড়ীটা যেন অকারণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, গরীবজনকে অবমাননা করিতে উদ্যত। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীই, শুধু ময়লা গদীটা আছে। এত অল্প পার্থক্যের উপর এতটা আভিজাত্য আর কোথাও গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। নগ্ন দেহ, পদ, কেহ ইণ্টার ক্লাশের নিকটে আসিলেই ভিতরের সকল যাত্রী সমস্বরে "এই দেড়া মাশুল, দেড়া মাশুল" বলিয়া চীৎকার করিয়া দূরাকাঙ্খীদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বিদায় করিতেছেন।

মাতুল, খুল্লতাত ও মেশোমহাশয় রেলগাড়ী চড়ায় কিছু অভিজ্ঞতা থাকাতে যাহারা এই প্রথম রেলে চড়িল তাহাদের বিভিন্ন উপদেশ দানে কামরা মুখর করিয়া তুলিলেন। বিজয় দরজার নিকট যাওয়া মাত্র মাতুল বলিয়া উঠিলেন, "চুপ করে বসো, উদিকে যেওনা। দরজা হঠাৎ হঠাৎ খুলে যায়।" যেন রেলগাড়ী হইতে অতর্কিতে যাত্রীদিগকে বাহিরে নিক্ষেপ করিবার জন্যই দরজার ব্যবস্থা। দূর সম্পর্কের এক জ্যাঠা নিজের পুঁটুলীটা খুলিতে গিয়া রেলের ঝাট্কানিতে কাৎ হইরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন। খুল্লতাত হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "বেঞ্চিটা ধরে বস।" একটা কুঁজা

গড়াইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিল ও কামরায় ঢেউ খেলিয়া গেল। মেশো বলিলেন, "তখনই বলেছিলাম রেলে কুঁজাগুলা দুই পাশে ঠেকো দিয়ে বসিও।"

একটার পর একটা স্টেসন পার হইয়া যায় আর বিজয় জিজ্ঞাসা করে, "কলকাতা আর কত দূর?" জ্ঞানীজনে বলেন, "এখনই কি; এখনও বিশ ত্রিশটা স্টেসন বাকি।" বিজয় ভাবে সে আর কত দূর, কত ঘণ্টার পথ!

একটা স্টেসনে কতকগুলি সাঁওতাল আসিয়া হুড়মুড় করিয়া বিজয়দের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। সকলে চীৎকার করিয়া, "দেড়া মাশুল দেড়া মাশুল" বলা সত্ত্বেও সাঁওতালরা পরস্পরকে ঠেলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল। তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহারা বুঝিল যে এই পাপের ফলে পরে তাহাদের প্রত্যেককে আট আনা দশ আনা করিয়া অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইবে তখন তাহারা চলন্ত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আবার হৈ চৈ করিয়া, "মরে যাবি, কাটা যাবি রে।" ইত্যাদি বলিয়া বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী স্টেসন অবধি ধরিয়া রাখা হইল। পরের ষ্টেসনে তাহারা দ্রুতপদে "দেড়া মাশুলের" কামরা ত্যাগ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ একটার পর একটা ঘটনা শেষ করিয়া গাড়ী অবশেষে হাবড়া পৌছাইল। হাবড়ার স্টেসন একটা সহর বিশেষ। এখানে বিশাল ছাউনীর নীচে হাজার হাজার যাত্রী, কুলী, ফেরিওয়ালা, রেলকর্ম্মচারী প্রভৃতি রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত হইতে নিরাপদে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে এখানে জীবন কাটাইয়া দিতে পারে;

কারণ এখানে খাওয়া, শোওয়া, বিশ্রাম প্রভৃতি মানবের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর পূরা ব্যবস্থা আছে। ক্ষণে ক্ষণে ট্রেন আসিতেছে যাইতেছে এবং হাজার হাজার নূতন লোক আসিয়া নামিতেছে। যাহারা পূর্ব্বে ছিল, তাহারা সুদূরের পথে চলিয়া যাইতেছে। যাহারা আসিতেছে তাহারাও অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরাট কলিকাতা নগরীর বক্ষে মিলাইয়া যাইতেছে। মানব জীবনের যাওয়া আসার এ যেন সিংহদ্বার।

বিজয় স্টেসন দেখিয়া অবাক হইয়া হইয়া গেল। তাহার গৃহজাতীয় ইমারত সম্বন্ধে সকল ধারণা নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। "এত বড় ঘর!" শুধু এই কথাই তাহার বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে সকল চেতনার উপর মাথা উঁচাইয়া দেখা দিল। সে খুল্লতাতকে বলিল, "এত বড় ঘর! এখানে কত লোক ধরে?"

খুল্লতাত বলিলেন, "হঃ লোক ধরে! দেখছিস দু কুড়ি রেলগাড়ী এসে ঢুকেছে ত লোক ধরে কত কে বলবে? হবে বিশ হাজার কি এক লাখ।"

বিজয় সসম্ভ্রমে কহিল, "কলকাতায় কি সব ঘর বাড়ী এই রকম!"

মেশো বলিলেন, "চল, চল, একটা বাসা ঠিক করে তারপর সহর দেখবে এখন। একতলা থেকে আরম্ভ করে দশ তলা অবধি সব রকম পাবে এখন।"

বিজয় অবাক হইয়া বলিল, "দশতলা বাড়ী, তাও আবার হয় নাকি?"

"হয় না আবার? একটা মনুমেণ্ট আছে, সেটার উপরে উঠতেই আধ ঘণ্টা সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়।"

বিজয় নীরব হইল। কলিকাতার দানবীয় আকৃতিতে তাহার মুখে

আর কথা ফুটিল না। বাসা খুঁজিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইতেই কয়েকজন হিন্দু হোটেলের দালাল তাহাদিগকে ছাঁকিয়া ধরিল। এক ব্যক্তির সহিত রফা হইল যে একটা কামরা দৈনিক তের সিকা হিসাবে তাহাদের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। তা ছাড়া জল তোলা, ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতির জন্য পৃথক দিতে হইবে। খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেরা করিলে রান্না ঘর ও কয়লার জন্য দৈনিক বার আনা; নতুবা খাওয়ার খরচ মাথা পিছু দৈনিক আট আনা; দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ছাড়া। খুল্লতাত বলিলেন, "রান্না আমারাই করিব; আচ্ছা চল উঠি ত গিয়ে, তারপর কাল সব বুঝে নেব এখন।" একখানা ঠিকা ও একটা ঠেলা গাড়ী ঠিক হইল। হোটেলের একটা লোক ও বিজয়ের এক আত্মীয় ঠেলা গাড়ীটার সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন ও বাকি সকলে ভিতরে, কোচ বাক্সে ও ছাদে বসিয়া যাত্রা করিলেন। দালাল বলিল তাহাদিগকে কলিকাতা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবে। কালিঘাট গঙ্গাস্নান, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর, বেলুড় প্রভৃতি কিছুই বাকি থাকিবে না। উহাকে মেশো মহাশয় কথঞ্চিৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করায় ব্যবস্থাটা পুরাপুরি ঠিক হইল না। মেশো মহাশয়ের মতে কলিকাতায় বহুলোকের একমাত্র ব্যবসাই অসতর্ক মফঃস্বলবাসীদিগকে নানা প্রকারে ঠকান। এই সকল লোক সামান্য লাভের জন্য না পারে এমন কাজ নাই। হয়ত কালিঘাটের নাম করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া গলাটাই কাটিয়া দিবে। একবার নাকি ফলু নামক মেশো মহাশয়ের এক বাল্য বন্ধুকে ঐ প্রকার একটা লোক ফুসলাইয়া বজবজ না কোথায় লইয়া গিয়া যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়। মায় জামা, কাপড় ও জুতা অবধি। একটা

মাদুলি ছিল সেটাও খুলিয়া লয় ও ফলুকে একখানা পুরাণ গামছা পরাইয়া মাঠের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান করে। ফলু বহুকষ্টে লোকালয়ে আসিয়া অবশেষে পুলিশের সাহায্যে দেশে ফিরিয়া যায়। বিজয় যেন কলিকাতায় বাসকালীন কদাপি কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস না করে। ইহারা কখন পানের সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়া মানুষকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে, কখন বা রুমালে ঔষধ মাখাইয়া নাকের উপর চাপিয়া ধরে। কাহারও কাহারও অভ্যাস বিষাক্ত সূচিকা বিদ্ধ করিয়া মানুষকে অবশ চলৎশক্তিহীন করিয়া ফেলা, কেহ বা জাপানী কায়দায় শিকারকে নিস্তেজ করিয়া ধরিয়া পয়সা কড়ি কাড়িয়া লয়। বিজয় এই সকল কথা শুনিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। একে রাক্ষুসে ঘর দালান তায় এ প্রকার দিনে ডাকাতির সমারোহ। এখানে আবার লোকে লেখাপড়া করিতে আসে! আড়তের কথাটা পিতা মন্দ বলেন নাই। গ্রামে ফিরিয়া গিয়া আড়তে বসিলেই প্রাণ বাঁচিবে। জজ হইবার পূর্ব্বেই যদি কেহ জাপানী কায়দায় টুঁটি চাপিয়া পরপারে পাঠাইয়া দেয় তাহা হইলে কলিকাতা প্রবাস খুব কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মামা কলেজেও ঐ রকম লোক যায় না ত ?"

মাতুল বলিলেন. কে কোথায় কোন ছদ্মবেশে কি করিবে তাহ তিনি, গ্রামের বাসিন্দা জানিবেন কি করিয়া! সাবধানে থাকিলে অবশ্য কলিকাতা তেমন মারাত্মক হইবে না; কেননা জীবিত লোকও ত চতুর্দ্দিকে বহু ঘোরা ফেরা করিতেছে।

হঠাৎ খুল্লতাত হাঁক দিয়া উঠিলেন, "আরে দেখ দেখ আতস বাজি! না ত আতস বাজি নয়ত! কি বটে হে!"

একটা বিরাট দালানের গায়ে জ্বলন্ত বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী হরফ তীব্র গতিতে ধাবমান। মনোনিবেশ করিলে দেখা যায় যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দাঁড়কাক মার্কা ঘৃত সেবনই শ্রেষ্ঠ পন্থা, এই কথাই নানান ভাষায় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রচার করা হইতেছে। এইরূপ আতস বাজি সদৃশ বিজ্ঞাপন আরও দুই চারিটি দেখা গেল। সিগারেট, কেশ তৈল, চা, ঔষধ; কিছু বাদ নাই। "সেবন করুন; ব্যবহার করুন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অমোঘ ঔষধ, স্বপ্ন লব্ধ, সন্ন্যাসী প্রদত্ত, আমেরিকান আবিষ্কার" ইত্যাদি দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়। এ পথ, ও পথ, সাত পথ ঘুরিয়া, যথা সম্ভব মোড় ফিরিয়া ঠিকা গাড়ী অবশেষে—হিন্দু হোটেলে আসিয়া পৌঁছাইল। চৌমাথার মোড়ে দু তলার উপরে লম্বা বারান্দা, তাহার দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া সাইন বোর্ড। হিন্দুদিগের পক্ষে কলিকাতার অদ্বিতীয় পান্থনিবাস। ধূলা, কাদা, পানের পিক, ঝুল ও মাকড়সার জালে সুশোভিত হিন্দু হোটেল দেখিয়া মাতুল বলিলেন, "ভাল জায়গায় আনলে বটে!'

দালাল ভগ্ন হৃদয় হইয়া বলিল, "কেন, ভাল নয়? ডবল দাম দিলেও এমন জায়গা আর পাবেন না মশায়।"

"আচ্ছা বাবা, তাই মেনে নিলাম। এখন চলো দিখি নি।"

দু তলার উপরে একখানা ছোট ধরণের ঘর। তাহাতে আসবাবের মধ্যে একখানা ক্যালেণ্ডার ঝোলান। তবে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা আছে। মাতুল বলিলেন এত ছোট ঘরে এতজন লোক কি করিয়া থাকিবে? দালাল উত্তর দিল ইহা অপেক্ষা ডবল ঘরও আছে, কিন্তু তাহার ভাড়া দৈনিক চার টাকা। সকলে বলিলেন "থাক চার টাকার ঘর, আমরা এর মধ্যেই ঠিক ক'রে নেব। একটা রান্না ঘরের

ব্যবস্থা কর।" অনেক তর্ক বিতর্কের পরে একটি রান্না ঘর পাওয়া গেল দৈনিক দশ আনা ভাড়ায়। সেটি আবার বাড়ীর চারতলার ছাদের উপর। বিদেশে সকল সুবিধা হইতে পারে না; সুতরাং ঐ ব্যবস্থাই উপস্থিতের মত ধার্য্য হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সকলে হাত মুখ ধুইয়া, বস্তা পুঁটুলি খুলিয়া ঘর সাজাইয়া বসিলেন। সঙ্গে সকল ব্যবস্থাই ছিল, সুতরাং রান্না করিবার কড়ারেই আনীত দূর সম্পর্কের এক দরিদ্র আত্মীয়, বাসনপত্র ও রন্ধন সরঞ্জাম লইয়া ছাদে চলিয়া গেলেন। সেখানে কয়লার উনান লইয়া কিয়ৎকাল কলহাস্তে রন্ধন আরম্ভ করিলেন।

এদিকে বিজয় বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দোকান, সাইন বোর্ড, গাড়ী ঘোড়া, ট্রাম, বাস, রিকসা আর বিভিন্ন বিচিত্র পথিকের ভীড়। কেহ শন শন করিয়া চলিয়াছে যেন মুহূর্ত্তের বিলম্বে পৃথিবী রসাতলে যাইবে। কেহ হেলিয়া দুলিয়া অনন্ত অবসরের মূর্ত্তিমান চলচ্চিত্রের মতই অগ্রসর হইতেছে, কেহ কেহ বা জটলা করিতেছে। অধিকাংশের মাথায় হয় পাগড়ী, নয় টুপি। বিজয় ভাবিল কলিকাতা কি বাংলার বাহিরে না বাংলা দেশেই? কোথায় কাঁখে কলসী লইয়া মেয়েরা লীলায়িত গতিতে গৃহে ফিরিবে, তা নয় শুধুই রং বেরং এর ওড়না আঁটা বিপুলায়তন বিজাতীয় রমণীগণ অলঙ্কার বাহুল্যে মন্থর গতিতে চটি চটাস চটাস করিয়া চলিয়াছে। ঘাঘরা, পায়জামা, কাঁচুলির ছড়াছড়ি এবং পথপ্রান্ত তাহাদের কলকণ্ঠে মুখর হইলেও একটা কথাও বুঝা যায় না। চারি-ধারের দোকান পাটও কি রকম বিজাতীয় ধরণের। দেখিতে চটকদার হইলেও সবই অজানা অচেনা বলিয়া মনে হয়!

ঘরের ভিতর একটা গোলযোগ আরম্ভ হইল। খুল্লতাত পাইখানা যাইয়া মাটি না পাইয়া আসিয়া চীৎকার স্বরু করিলেন, "ভ্যালার দেশে এলাম! হুঁ! হাত মাটি করব তার জো টি নেই।"

মাতুল পরামর্শ দিলেন, "মাটি আবার কি হে? কলকাতায় মাটি টাটি নেই। সিমেণ্ট, বালি, চূন, পাথুরে কয়লা, আলকাতরা এই সব আছে। চাট্টি সিমেণ্ট চেয়ে নাও, কারও কাছে।" খুল্লতাত আরও চটিয়া গেলেন। মাতুল বলিলেন, "ও সব গেঁয়ো হাব ভাব ছাড়তে হবে বাবা; হুঁ। আজ বলবে হাত মাটি করব, কাল বলবে ডুব দিয়ে চান করব, তারপর বলবে গাছে উঠব; ও সব হবে না বাবা, এ কলকাতা, বুঝেছ?"

রাস্তায় একটা লোক চাপা পড়িয়াছে বলিয়া রব উঠিল। সব গাড়ী বাস, ট্রাম প্রভৃতি দাঁড়াইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা লাল ক্রশ মার্কা মোটর গাড়ী আসিয়া পড়িল এবং আহত ব্যক্তিকে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তার ভীড ও লোক চলাচল ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। কিছু পূর্ব্বেই যে এ স্থলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। বিজয় ভাবিল দানবের দেশে বুঝি মায়া মমতা বলিয়া কিছু নাই। গ্রামে কাহাকেও গরুতে গুঁতাইলে বা সাপে কামড়াইলে সে কথার আলোচনা মাসের পর মাস চলিয়াও শেষ হয় না। জীবন যাত্রার গতি এখানে এত প্রবল যে সকলেই কর্ম্মে বিতাড়িত হইয়া পলাতকের মত ছুটিয়া চলিয়াছে দাঁড়াইবার সময় নাই কাহারও। যে দণ্ডায়মান সেও অপরের সহিত দ্রুত গতিতে কথা চালাইয়া চলিয়াছে। যে মন্দগতি সে হয় পথহারা নয়ত অবসাদে মরণাপন্ন।

রন্ধন শেষ হইলে সকলে ভোজনে বসিলেন। বিশেষ কথা বার্ত্তায়

সময় নষ্ট না করিয়া খাওয়া শেষ হইল। একবার প্রস্তাব হইল যে কিছু-ক্ষণ ঘুরিয়া কলিকাতা দেখিয়া আসা যাউক ; কিন্তু এই রাত্রে বাহিরে যাওয়াটা ঠিক হইবে না বলিয়াই শেষ অবধি সাব্যস্ত হইল। বিজয় তাহার বিছানা পাতিয়া ঘরে শুইয়া পড়িল।

সারারাত্রি খালি ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ ও বাসের থামা ও চলার ঝটকানি ; মানুষের চীৎকার ও কুকুরের ডাকেরও অন্ত নাই। বিজয় স্বপ্ন দেখিল ঝড় উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিক বজ্রপাতের গভীর নিনাদ, বাতাসের তীব্র আস্ফালন ও মাঝে মাঝে মড মড শব্দে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সে যেন শালবনের মধ্যে বড বড কয়েকটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় পাইয়াছে। গাছের ডালগুলি ভাঙ্গিয়া উড়িয়া আসিয়া সেই পাথরের উপরে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। বিজয় কোন মতে মাথা গুঁজিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। হঠাৎ একখামা মোটর বাস চালক বিহীন অবস্থায় গাছপালা ভাঙ্গিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার উন্মত্ত অভিযানের সম্মুখে কিছুই মাথা তুলিয়া দাঁডাইতে পারিল না। একসারি মাঝারি শালগাছের উপর দিয়া বাস খানা তাহার আশ্রয় স্থল পাথরগুলার দিকেই আগাইয়া আসিতে লাগিল। গাছগুলি দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং বাস খানা ঘড ঘড ঝড় ঝড় শব্দে রণস্থল কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার এঞ্জিনের নির্ঘোষ নিষ্ঠুর অট্টহাস্যের মতই ঝড়ের শব্দও ডুবাইয়া বাজিয়া উঠিল। কাহারা যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; "বাবারে, গেলাম !" যেন শতাধিক মানুষের বুকের উপর দিয়া যন্ত্র দানব নির্ম্মম আবেগে চলিয়া গেল। বাস খানা প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। দানব কণ্ঠে কে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "কালী কালী, কালী ঘাট !"

বিজয় ঘামিয়া ধড়মড করিয়া জাগিয়া উঠিল। নীচে রাজপথে গাড়ী চলার শব্দ প্রায় নীরব হইয়া আসিয়াছে। মাতুল প্রচণ্ড বিক্রমে নাসিকা গর্জ্জনে ঘরখানা কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। দূরে কাহারা যেন খুব জোরে ঝাঁট দিতেছে। বিজয় উঠিয়া গামছা দিয়া মুখটা মুছিয়া লইয়া বাহিরে বারন্দায় গিয়া দাঁড়াইল। রাস্তায় জন মানুষ নাই, শুধু কয়েক জন লোক ফুটপাথ ঝাঁট দিয়া চলিয়াছে। একটা লোক ল্যাম্প পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একবার ল্যাম্প পোষ্টটা ছাড়িয়া চলিবার চেষ্টা করিয়া পড় পড হইল। পুনরায় সে লৌহস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল। লোকটা পাগল না কি? খিল খিল করিয়া হাসিতেছে আর বিড় বিড় করিয়া কি যেন আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ সে জড়ান গলায় গান ধরিল "প্রাণের পা আমার; ঘরে যেতে চাও না কেন?" বিজয় বুঝিল পাগল। লোকটা বলিল, "যাবে না? আচ্ছা দাঁড়াও; হেঁটে যেতে কষ্ট হয় ত হামা দিয়ে চল।" বলিয়া সে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অল্পদূর অবধি গিয়া একটা দোকানের সিঁড়ির উপর বসিল। তারপর কি ভাবিয়া পায়ের জুতা জোড়া খুলিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। আর নড়েও না দেখি! বিজয় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল লোকটা ওঠে কি না। কিন্তু সে সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল বলিয়া মনে হইল। দশ পনের মিনিটের মধ্যেও যখন লোকটা উঠিল না, বিজয় তখন ভিতরে যাইয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভোর হইতেই সকলে মাটির হাঁড়িতে চা ভিজাইয়া বাটি, গেলাস, ভাঁড় ও কাপ, যাহার যাহা জুটিল লইয়া চা পানে বসিয়া গেলেন।

দিকে তাকাইয়াছিলেন। এই মহানগরীর বহু যুবক ও অকাল প্রৌঢ় লোকের ধারণা যে প্রাতে গোলদীঘির চতুর্দ্দিকে দুই চারি পাক হাঁটিয়া আসিলেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকিবে। ইহাদের মধ্যে কেহই প্রায় উপযুক্ত রকম পরিশ্রম অথবা ব্যায়াম করেন না এবং প্রাতঃ ভ্রমণ করিয়াছি সুতরাং শরীরের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এই ধারণায় পূর্ণ উদ্যমে গুরু ভোজনাদি করিয়া অকালে জরাজীর্ণ হইয়া পড়েন। গোলদীঘি ভ্রমণকারীদিগের অপেক্ষাও একদল অধিক অলস লোক আছেন যাঁহারা ছাদে পায়চারী করিয়া অথবা দৈনিক বাজারে গমন করিয়াশক্তিলাভের চেষ্টা করেন। শীর্ণ এবং স্থূল উভয় প্রকারের অগঠিত দেহ অসংখ্য লোক কলিকাতায় বাস করেন। বাল্যকালে ও যৌবনে যথারীতি ব্যায়াম করিলে ইহার মধ্যে অধিকাংশই পুরুষোচিত দেহের অধিকারী হইতেন; কিন্তু মনকে চোখ ঠারিয়া প্রায় সকলেই নরদেহের ব্যঙ্গচিত্রের মত আকৃতি হইয়া দুনিয়ার চক্ষে বাঙ্গালীকে হাস্যাস্পদ করিয়া বেড়ান। একজন রুমালে ঘাম মুছিতে মুছিতে সঙ্গের বন্ধুকে বলিতে ছিলেন, "আজ পাঁচ পাক হ'ল। ক্ষিদেটা ভালই হবে, কি বল?" বন্ধু কল্পনার চক্ষে আধ সের সরু চালের ভাত ও তৎসঙ্গে আলু ভাজা, পটল ভাজা, কুমড়া ভাজা, মুগের ডাল, ছ্যাচড়া, ডালনা, গলদা চিংড়ীর কালিয়া, আলু বখরার চাটনী, দধি ও সন্দেশ দেখিতে দেখিতে ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এ রকম যদি রাখতে পারত ওজনে বেড়ে যাবে।"

প্রথম বক্তা নিজের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি উদরের উপর হাত বুলাইয়া মন্তব্য করিলেন, "সেবার মধুপুরে গিয়ে রোজই দু মাইল আড়াই মাইল হ'ত; আর হাতে মেপে লুচি খাওয়া; বুঝলে, হাতে মেপে!"

বন্ধু বলিলেন, "স্বাস্থ্যটা খুব রেখেছ। কে বলবে চল্লিশের কাছে বয়স?"

প্রথম বক্তা হেঁ হেঁ শব্দে নিজ শরীর সম্বন্ধে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া দ্রুতগামী রাজহংসের ন্যায় গোলদীঘির গেট পার হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

একজন ছোকরামত লোক বেঞ্চের উপর বসিয়াছিল। সে স্বগত বলিল, "ব্যাটা খোদার খাসী! বাপ! এর উপর ক্ষিদে হ'লে ত রক্ষা থাকবে না!"

প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুরিয়া ফিরিয়া ও বেঞ্চের উপর বসিয়া বিজয়ের বাহিনী ক্লান্ত হইয়া পুনরায় কলেজের দিকে চলিলেন। এবার কলেজের গেট খোলাই পাওয়া গেল এবং তাঁহারা সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একজন কেরাণী মত লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি চান?" মাতুল বলিলেন, "ছেলে ভর্ত্তি করতে এসেছি; প্রিন্সিপালের নামে চিঠি আছে।" সে ব্যক্তি বলিল, "তা ভর্ত্তির জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন নাই। ফর্ম্ম ফিলআপ করে চিঠিখানা রেখে যান। দু তিন হপ্তা পরে সিলেক্সন হ'লে পর খবর পাবেন।"

"সে, কি কথা; হবে কি না হবে না জানলে অন্য কলেজে চেষ্টা করব কি করে?"

"তার জন্যে কি; সব কলেজে এক একটা দরখাস্ত মেরে দিন। যারা নিতে রাজী হবে তাদের মধ্যে যেটায় খুসী ভর্ত্তি করে দেবেন এখন। প্রিন্সিপাল কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। তা ছাড়া তিনি আসবেন সাড়ে বারটায়। আসুন, এ দিকে আসুন।"

সকলে গিয়া দপ্তরে প্রবেশ করিলেন।

হেড ক্লার্ক নীচু কাউণ্টারের ওপারে টেবিলের উপর পা তুলিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি এতগুলি লোক একত্রে প্রবেশ করায় পা দুখানা নামাইয়া অপর ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার, এত লোক?" সে বলিল, "ছেলে ভর্ত্তি করতে এসেছে।"

"ক'জন ছেলে?"

"ছেলে একটি, মুরুব্বি এক ডজন।"

হেড ক্লার্ক একখানা ফর্ম্ম তুলিয়া বলিলেন, 'কোন ডিভিশন?"

মেশো মহাশয় সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "ফার্ষ্ট ডিভিশন; ছেলে ভাল, স্কুলে ফার্ষ্ট হয়েছে।"

হেড ক্লার্ক ঈষৎ হাই তুলিয়া ফর্ম্মখানা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছেলেকে ফিল আপ করতে বলুন।"

বিজয় অতঃপর লোকচক্ষে পড়িয়া গিয়া, ঘামিয়া কাঁপিয়া ফর্ম্মখানা লইয়া লিখিতে বসিয়া গেল। এক এক করিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া সই করিয়া ফর্ম্ম খানা হেড ক্লার্ককে ফেরত দিল।

তিনি কড়ি কাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সুদূর কণ্ঠে বলিলেন, "পরে খবর পাবেন।" বিজয়ের গুরুজনদিগের ইচ্ছা ছিল একটা সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া বিষয়টার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করার; কিন্তু আবহাওয়া বিশেষ বাধ বাধ ঠেকায় তাঁহারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া ক্রমশঃ কলেজের দপ্তরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মাতুল কহিলেন, "ব্যাটা যেন বাংলার ছোট লাট হে! ও কি করে এখানে?"

বিজয় সরু গলায় বলিল, "বোধ হয় প্রফেসর।"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ, প্রফেসর ওর মাথা! কেরাণী হে, কেরাণী; দেখলে না, তাড়াতে পারলে যেন বাঁচে। যত কাজে ফাঁকি দেওয়া যায় আর কি?"

মেশো মহাশয় বলিলেন, "এখন চল হোটেলে, কাল আবার অপর কোন কলেজে যাওয়া যাবে।"

সকলে অতঃপর হোটেলের পথে ফিরিয়া চলিলেন।

কলেজের উপর কলেজ ঘুরিয়া একটা এই লাভ হইল যে কলিকাতার কালিঘাট অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়াবাগান অবধি সকল পথঘাট বিজয়দের ভাল করিয়া চেনা হইয়া গেল। ট্রাম ও বাস নিরাপদ নহে বলিয়া সর্ব্বত্রই পদব্রজে যাতায়াত করা হইত। বিজয় মধ্যে মধ্যে বলিত, "চলুন বাসে উঠি, নয়ত ট্রামেই চলুন।" কিন্তু সকলের মতে উভয় প্রকার যানই মুহূর্ত্তের অধিক কোথাও থামায় না; সুতরাং আট নয় জন লোকের বাস বা ট্রামে একত্রে ওঠানামা করা সম্ভব নহে। তা ছাড়া সময়ের কোন কমতি নাই; শুধু শুধু বিপদ ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? বিজয় মনে মনে ভাবিল, "আচ্ছা ইহারা চলিয়া যাক, তার পর মনের সাধে ট্রামে বাসে ঘোরা যাবে।"

সব কলেজেই এক ব্যবস্থা। প্রফেসর প্রিন্সিপাল প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষ কাহারও সহিত দেখা করেন না। শুধু কেরাণীরা যথেচ্ছাচার করিয়া নিরীহ ছাত্র ও অভিভাবকদিগকে বিপন্ন করিয়া তোলে। মেশো মহাশয় বলিলেন ইহার একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত। দূর দূর দেশ হইতে সকলে ছেলেদের পাঠের ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে। কত কথা বলিবার আছে, জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার উত্তর কি

ত্রিশ টাকার মাছি মারা কেরাণীতে দিতে পারে? বড় বড় জ্ঞানী বিদ্বান যাহারা তাহাদের সহিত একটা কথা বলিলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এ সকল মূর্খের সহিত ত কথাই বলা চলেনা। তা ছাড়া যা ঔদ্ধত্য! বহু কষ্টে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখে। কথাত বলেই না; শুধু ফর্ম্ম আগাইয়া দিয়া অপর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া লাট সাহেবী চালে গর্দীয়ান হইয়া বসিয়া থাকে। এর একটা বিহিত করা দরকার।

খুল্লতাত একদিন রবিবার দেখিয়া বাজার করিতে গেলেন। ইচ্ছা ভাল দেখিয়া তরকারী মাছ প্রভৃতি আনিয়া বিদেশ বাসের দুঃখ লাঘব করিবেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মহা রাগ। "এমন বাজারে কেউ যায়! হুঁঃ; বাজার বসিয়েছে!" মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে হয়েছে কি হে; বলেই ফেল, শুনা যাক।" খুল্লতাত বলিলেন, "এক ছেদামের মাল নেই যা পাঁচশ মাইল রেলে পচে না এসেছে। পাটনাই কপি, বেনারসের মূলো, এলাহাবাদের পটল, বৃন্দাবনের কচু; হরিদ্বারের ওল, আর মাদ্রাজের তেঁতুল! কেনরে বাবা, রেলগাড়ী পেয়েছিস বলে একটা ভাল মন্দ বিচার নেই? সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ঢেঁকি বসিয়ে ভাত খেতে হবে না কি? হুঁ, জুতা, মোজা, তেল, সাবান, কাপড়, জামা, ঔষধপত্র, আয়না, চিরুণী, ছুরি, কাঁচি, এসব বিলেতি হয় তা মানি; তাই বলে কি বিলেতি লাউ কুমড়া খেতে হবে না কি? দূর ছাই, চিঠি লিখে সব থলে ভরে পার্সেল করে আনিয়ে নেও।"

মাতুল খুল্লতাতকে চটাইবার জন্য বলিলেন "তা জুতা, জামা, তেল সাবান যদি কিনতে পার ত চিঁড়া মুড়ি কিনবে না কেন?

খুল্লতাত "ইঃ, তোমার একটা কথা!" বলিয়া পান সাজিতে বসিয়া গেলেন।

বিজয় বলিল, "পাঞ্জাবী পানের মশলা খেয়েছেন! আমার কাছে আছে, চার পয়সার কিনেছি।"

খুল্লতাত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পানের মশলা দেখিয়া বলিলেন, "না থাক।"

মেশো মহাশয় সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। বলিলেন, "দেখেছ? মেয়ে ছেলেরা পল্টন করেছে। কি ব্যাপার বলত?"

এক বৃদ্ধ আত্মীয় বলিলেন, "তা মহাভারতেও ত মেয়ে ছেলেতে রথ চালাচ্ছে, যুদ্ধ শিক্ষা করেছে দেখা যায়। পল্টন করেছে ত হয়েছে কি?"

মেশোমহাশয় বলিলেন, "সেটা হ'ল দ্বাপর যুগ আর এ হ'ল কলিযুগ। তখন যা হয়েছে তাই কি এখন হতে পারে?"

"তা হচ্ছে যখন তখন হ'তে পারে না ত কি?"

"আমি বলছি হওয়াটা কি ভাল?"

"কেন ভাল নয়! মেয়ে ছেলে যদি ঝাঁটা হাতে সকাল সন্ধ্যে কোঁদল করতে পারে ত বল্লম নিয়ে পারবে না কেন?"

"তবে তোমার গিন্নীকে পল্টনে দাও নি কেন?"

"সে পল্টনে না গিয়েই যা হয়েছে, পল্টনে দিলে ত কারও রক্ষা ছিল না।"

খুল্লতাত বাজারের শোকটা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন "তা আর কি; মেয়েরা পল্টনে গেলে ভয় কিছু নেই, রান্না বান্না লণ্ডন থেকে হয়ে আসবে। টিনের ভাত, বোতলের ডাল, কৌটায় ভরা মাছ চচ্চড়ী; ভাবনা কিসের হে?"

সেদিন দ্বিপ্রহরে সকলে মিলিয়া আলিপুর চিড়িয়াখানায় চলিলেন। একটা তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হইল। যাতায়াত আড়াই টাকা। খাওয়া দাওয়ার পরই বাহির হইয়া পড়িলেন! গাড়ী ঝড় ঝড় করিতে করিতে চলিল। ঝাঁকড়ানীতে সকলের গায়ের হাড়-গুলি প্রায় ঢিলা হইয়া আসিল। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল সেই যন্ত্রনা সহ্য করিবার পর গাড়ী আলিপুর পৌঁছাইল। ঝিঁঝিঁ ধরা পায়ে সকলে নামিয়া চিড়িয়াখানার বাগানে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে বাঁদরদিগের খাঁচাগুলির দিকে যাওয়া হইল। খুল্লতাত হাসিয়াই আকুল, "খরচা করে হনুগুলাকে দালান তুলে রাখা করেছে! ইঃ, কলকাতা বটে।"

মাতুল বলিলেন, "কত রকমারী হনু সেটা দেখ; শুধু হাসলেই হয় না।"

খুল্লতাত বলিলেন, "ইঃ; হনুর আবার রকম! হনু ত হনুই হল, কি বটে?" মাতুল বলিলেন, "চল চল বাঘ ভালুক, গণ্ডার সব দেখবে চল।" সকলে বিভিন্ন প্রকার জানোয়ার দেখিয়া দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন। ক্যাঙ্গারু, জিরাফ, জলহস্তী ও উটপাখী তাহাদের খুবই আশ্চর্য্য লাগিল। খুল্লতাত মানিতে বাধ্য হইলেন যে পৃথিবীতে অনেক প্রকার জীবজন্তু আছে যাহা অপেক্ষা অসম্ভব বেয়াড়া জিনিষ কল্পনাও করা যায় না এবং কলিকাতা সহরের লোকেদের ধৈর্য্য বলিহারি যে এই সকল রকমারি জানোয়ার একত্র করিয়াছে। বিজয় বলিল, "তিমিমাছ কিন্তু নেই। তাছাড়া হাঙ্গর নেই, সামুদ্রিক সর্প নেই।" মাতুল বলিলেন, "কেতাব থেকে মুখস্থ বলে যাচ্ছিস, না? ঐ সব জানোয়ার থাকলে ত নিয়ে আসবে?"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ, মকর নাই, মহিষাসুরও নাই, আর গরুড় পক্ষী, পক্ষীরাজ ঘোড়া আর দশমুণ্ড দশানুন। যা যা আছে তার হিসেব দে দিকি আগে?" বিজয় পরাস্ত হইয়া চুপ করিল। সকলে পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া ময়দানের পথে হোটেলে ফিরিয়া চলিলেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিকটে আসিয়া সকলে স্থির করিলেন একটু ফেরীওয়ালাদিগের নিকট সোডা লেমনেড ক্রয় করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করা হউক। গাড়ী থামাইয়া লেমনেড পানের উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় দূরতম সম্পর্কের দুই আত্মীয় "বাবারে" বলিয়া দৌড় দিলেন। বোতল ফেলিয়া সোজা মাঠের ভিতর দিয়া টানা দৌড়। মাতুল, খুল্লতাত ও মেশোমহাশয়, "হৈ, দৌড়াইছিস কেনে রে" বলিয়া উহাদিগকে থামাইতে না পারিয়া অগত্যা কারণ অনুসন্ধানে তাহাদের পশ্চাতে নিজেরাও ছুটিলেন। সোডাওয়ালা ও অপরাপর দুই একজন ক্রেতা অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। পাগল নাকি? কোথাও কিছু নাই চোঁ চাঁ দৌড় দিল।

প্রায় তিন চার মিনিট পরে মাতুল একজনকে ও খুল্লতাত অপর-জনকে ধরিয়া সোডার দোকানের নিকট লইয়া আসিলেন। সকলের সমবেত প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিল, "হৈ, গোরাগুলাকে আসতে দেখলাম যে!" চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে দেখা গেল কিছুদূরে জনা তিন ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী যুবক পায়চারী করিতেছে। তাহাদের হাবভাব কিছুমাত্র ভয়াবহ নহে; চেহারাও মামুলি ধরণের। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আসছিল ত কি হয়েছে? দৌড়ালে কেন?"

উত্তর হইল, "গোরা ত বটে।"

ধর্ম্মভীরু সজ্জন মাত্রেরই নানা প্রকার ভয় থাকা একটা আধ্যাত্মিক কাঠামোর অঙ্গ বলিলেই হয়। "কোন ভয় ডর নেই" একটা বড় রকমের অপবাদ। সেইজন্য কয়েক শত বৎসর যাবৎ ভারতীয়েরা বিভিন্ন প্রকার ভয়ডর আয়ত্ত করিতে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহার মাত্র দুই এক প্রকার ভয় সে যাহার অধিক প্রকার ভয় আছে তাহার তুলনায় নিকৃষ্ট জাতীয় জীব। জ্ঞানী অর্থে বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি সাধারণের কল্পনার বাহিরেও নানাপ্রকার নবনব ভয়ের উপকরণ *দেখিতে পায় ও দেখাইতে পারে তাহাকেই। ভয় পাওয়াটা কোন* লজ্জার বিষয় ত নয়ই বরং নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মের মতই কর্ত্তব্য।

সকলে মিলিয়া পলাতকদিগকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দানে নির্ভয় করিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া চলিতে সুরু করিলেন। এইরূপে হোটেলে ফিরিয়া আসা হইল।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল একজন ভদ্রলোক তাঁহাদের ঘরের সম্মুখে পাইচারী করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে ফিন্‌ফিনে কাল ফিতাপাড় কোঁচান ধুতি, শক্ত ইস্ত্রি করা করা নীল রং‌এর ডবল ব্রেষ্ট সার্ট ও কাল বার্ণিস করা পাম্প সু। মাথার চুল ঈষৎ পাতলা কিন্তু তৈল ও চিরুণীর সাহায্যে তাহা এরূপ সযত্নে বিন্যস্ত হইয়াছে যে কোথাও অল্পমাত্রও কেশহীনতা সহসা পরিলক্ষিত হয় না।

মাতুল তাঁহাকে দেখিয়া, "আরে, আরে হরেন না ?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনারা এতদিন এসেছেন অথচ একটা খবর নেই। ভাগ্যে, দাদার পত্রে জানলাম, নয়তো দেখাই হত না।"

মাতুল বলিলেন, "যা তাড়াহুড়ার ব্যাপার, কাকেও খবর দিবার

কি সময় হ'ল, তা নইলে তুমি আছ এখানে তাও জানি, খবর নিশ্চয় দিতাম। যা হোক আছ কেমন? কোথায় বাসা? কাজ কর্ম্ম কি করছ? বেতন কত হল?"

হরেন নামধেয় ব্যক্তি এককালীন এতগুলি প্রশ্নের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া হাত তুলিয়া বলিল, "আরে থামুন, থামুন, এত কথার জবাব কি আর এক সঙ্গে দেওয়া যায়; একে একে বলি শুনুন।" সকলে ঘরে ঢুকিয়া মাদুর বিছাইয়া বসিলে পর হরেন বাবুর বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ খবর পাওয়া গেল। তিনি পনের বৎসর পূর্ব্বে পলায়ন পূর্ব্বক কলিকাতা আগমন করেন। প্রথমে একটা দোকানে কাজ করেন, খাওয়া, থাকা ও মাসিক চার টাকা বেতনে। সেইখান হইতে এক মার্চ্চেণ্ট আপিসের বড়বাবুর সহিত পরিচয় হইয়া, পনের টাকা বেতনে একটা চাকুরী হয়। বড়বাবুর সুনজরে থাকিবার জন্য সকালে ও বৈকালে তাঁহার গৃহে হাজিরা দিয়া এবং তাঁহার কুৎসিৎ ও দুর্দ্দান্ত ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া, খেলনা কিনিয়া দিয়া ক্রমশঃ বেতন ত্রিশে উঠে। অতঃপর বড়বাবুর তাসের আড্ডায় বসিয়া, কাজে কর্ম্মে বাজার করা, লোক খাটান প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে বেতন দশম বর্ষে ষাট টাকায় উঠিল। আধুনিক কালে বড়বাবুর কন্যার বিবাহে সোনার হারটা হরেনবাবুই দেন ও পুত্রের বউ ভাতে ভেটকি মাছ সম্পূর্ণ তিনিই সরবরাহ করেন। বড়বাবুর বাড়ীর লোকেরা এখন তাঁহাকে কাকাবাবু বলিয়াই ডাকে এবং তাঁহার বেতন একশত দশ মুদ্রা। উপরিও মন্দ হয় না।

ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে হরেনবাবু সৌখীন লোক বলিয়া পরিচিত। পলাইয়া দেশ ত্যাগ করার পরে বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের

লোকেরা ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি নিজেদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করেন। এমন কি তিনি দুই চার বার গ্রামে ছুটি লইয়া এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ কাটাইয়াও আসিয়াছেন; কিন্তু জীবনের গতি তাঁহার ভিন্ন গামী হইয়া যাওয়ায় ঠিক আর সকলের সহিত খাপ খায় নাই। বিবাহাদি করেন নাই ও করিবেনও না বলিয়াই এক প্রকার স্থির করিয়াছেন। অ্যামেচার থিয়েটারে, বড়বাবুর বাড়ীর তাসের আড্ডায়, ফুটবল গ্রাউণ্ডে তাহার অবসর সময় অবলীলাক্রমে কাটিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে পিকনিক্, পশ্চিম ভ্রমণ প্রভৃতিও আছে। কলিকাতায় বৌবাজার অঞ্চলে একটা মেসে তাঁহারই মত সৌখীন কয়েকজন মিলিয়া একত্রে বাস করেন। সকলেই মানেন যে হরেন বাবুরা মেস জীবনে একটা আভিজাত্যের হাওয়া আনিয়াছেন। এ মেসে চাকরেরা নগ্ন দেহে বেড়াইতে পারেনা; দরজা জানালায় পর্দ্দা দেওয়া হয় এবং মেসের বৈঠকখানা স্প্রিং-এর গদী আঁটা সোফা, কৌচ প্রভৃতি আসবাবে সুসজ্জিত।

হরেন বাবু বলিলেন, "আপনারা এই মেড়ো মহলে এসে উঠলেন কি জন্য? একবার জানাতে হয় ত, একটা ভাল মতন জায়গা ঠিক করে দিতাম।" মাতুল বলিলেন, "আরে বাপু, আমরা গেঁয়ো মানুষ, আমাদের মাথার উপরে একটা ছাদ থাকলেই যথেষ্ট। এতেই যা খরচার খরচা!"

হরেনবাবু বলিলেন, "তা আরত বেশী দিন থাকা হবে না, ত এতেই এক রকম হয়ে যাবে। কিন্তু কলকাতায় করছেন কি? একটা ছেলেকে কলেজে ভর্ত্তি করা, তাত একদিনের কাজ; তারপর? থিয়েটার টিয়েটার দেখলেন একটাও?"

"থিয়েটার ত যাই নি এখনও। তবে যেতে হবে একদিন।"

"চলুন না এই বুধবার দিন। ভাল বই আছে। আমি টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখব এখন।"

হরেনবাবু সার্টের কাফ সরাইয়া হাত ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, "এখন আসি, যেতে হবে আর এক জায়গায়। বুধবারে আমি এসে আপনাদের নিয়ে যাব এখন। তৈরী থাকবেন যেন ভুলবেন না।"

হরেনবাবু যাইবার পর প্রায় আধ ঘণ্টা কাল ঘরটা যেন তাঁহারই উপস্থিতিতে ভরপুর হইয়া রহিল। খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ, হরেন মানুষের মতন মানুষ বটে! পাশ নেই, সুপারিশ নেই নিজের চেষ্টায় একশ দশ টাকা!"

মাতুল বলিলেন, "হরেনের দাদা আমার সঙ্গে পাঠশালে একসঙ্গে পড়ত। হরেন বড় দুষ্ট ছিল। খালি মারপিট ঝগড়া, আম চুরি। তারপর একদিন কোথায় গেল কোন পাত্তা নেই। তিন চার বছর পরে খবর দিলে যে মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করছে। ওর দাদা অনেক চেষ্টা করলে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু কিছুতেই এল না।"

মেশো মহাশয় বলিলেন, "শুনেছিলাম ও খৃষ্টান হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় খৃষ্টান? দিব্য আছে!"

এক আত্মীয় বলিলেন, "রূপার কৌটাটা বার করলে যখন ভাবলাম পান। কৌটায় বাড়সাই রেখেছে! পকেটে সতরঞ্চি পাড়ের রুমাল। তার সার্টের কি জেল্লা! হাতে হীরের আংটি। লোক বটে!"

সকলেই হরেনবাবুকে দেখিয়া বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। গ্রামেরই একটা লোক, তাহাদের মতই চিঁড়া মুড়ি খাইয়া, খাট জলকাচা ধুতি পরিয়া মানুষ, তাহার এ পরিবর্ত্তন, সৃষ্টি কর্ত্তার অপূর্ব্ব লীলা ব্যতীত আর

কি ? বুধবার একাধারে হরেন বাবুর সঙ্গলাভ ও থিয়েটার দর্শন হইবে জানিয়া সকলে দিন গুনিতে আরম্ভ করিলেন। বিজয় কখন থিয়েটার দেখে নাই। তাহার ধারণা ছিল উহা যাত্রারই মত একটা কিছু, শুধু অভিনেতার সংখ্যা কিছু বেশী, আর পোষাক আসাক অপেক্ষাকৃত মূল্যবান। কিন্তু যখন দেখিল তাহারা একটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকিতেছে, চতুর্দ্দিকে শত শত বৈদ্যুতিক আলোক, পাখা ও সুচিত্রিত দেওয়াল, মর্ম্মর স্তম্ভ মালা ও অসংখ্য সুসজ্জিত দর্শকবৃন্দ তখন তাহার মন বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া গেল। ক্রমশঃ থিয়েটার আরম্ভ হইল। একটা পর্দ্দা আপনা হইতে উঠিয়া যাইতেই দেখিল বাদসাহী হামাম। ফোয়ারা, ফুলের বাগান, মর্ম্মর প্রস্তরের সুদীর্ঘ অবগাহন কুণ্ড ও সুসজ্জিত নর্ত্তকীর দল। তাহারা গান ধরিল

"চলে আয় চলে আয় !
শুষ্ক হৃদয়ে পুড়িয়া মরিস হায়,
ফেলেদে ভাবনা ফেলেদে কান্না,
হীরা চুণি মোতি মুকুতা পান্না
রেখেছি সাজিয়ে থরে থরে
তোদেরই তরে।
হেথা বাগিচায় গায় বুল বুল
কোয়েলা পাগল করে চুলবুল
গুলাব বাগের এ শীতল ছায়
চলে আয়, চলে আয়।"

তারই সঙ্গে ঝিন, ঝিন, ঝিন, ঝিনিক, ঝিনিক, ঝুমুরের ঝঙ্কারে রঙ্গমঞ্চ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সমঝদার লোকে বিকট চিৎকার করিয়া

বাহবা দিতে লাগিল এবং নৃত্য শেষে প্রবল করতালি ধ্বনিতে বিরাট থিয়েটার গৃহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

হরেনবাবু খুল্লতাতকে বলিলেন, "ঐ যে সব চেয়ে ডান দিকে যে বাইজী ওর নাম হীরা। ওর মাসে হাজার টাকা বেতন। শুনেছি বড় ঘরের মেয়ে ছিল। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে থিয়েটারে নেমেছে।"

খুল্লতাত অবাক হইয়া বলিলেন, "বল কি হে!"

হরেনবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ সত্যি কথা। আমাদের আফিসের একজন হীরার ভাইকে চেনে। সে বলেছে।"

খুল্লতাত বলিলেন, "বল কি হে!"

এক দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত মুসলমান নৃপতি অতঃপর পারিষদ পরিবৃত হইয়া হামামে প্রবেশ করিলেন। মুখে তাঁহার অনন্ত বিতৃষ্ণার ছাপ, যেন জীবন ধারণ ঔষধ সেবনের সমতুল্য। তিনি একজন সভাসদকে উদ্দেশ্য করিয়া একটা লম্বা বক্তৃতার সূচনা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে তিনি জগতের সকল ঐশ্বর্য্যের মালিক, সকল দেশের সকল উপভোগ্য তাঁহার আয়ত্বে, অথচ তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই। কেন? সভাসদগণ নৃপতিকে বিধি মতে 'ক্রশ একজামীন' করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার ভোজন, শয়ন, মৃগয়া, অবসর, বিলাস, লালসা, আকাজ্ক্ষা, শত্রু, মিত্র, বেগম মহল; তোষাখানা প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া শেষে জানা গেল নৃপতি (বৃদ্ধ বয়সে) প্রেমে পড়িয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অবশ্য গান ও নৃত্য পুরাদমে চলিতে লাগিল। প্রেমের কথা জানাজানি হইয়া যাইতেই ড্রপসিন পড়িল ও কিয়ৎকাল পান, বিড়ি, সিগারেট, চা, সরবত, মামলেট, কাটলেট, সিঙ্গারা, কচুরী প্রভৃতি সশব্দে ফেরী হইলে পর নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল।

এইবার নদীর ধার। একটা ভাঙ্গা নৌকার উপর একজন খোঁড়া ফকির বসিয়া গান ধরিল। গানের মর্ম্ম এই যে প্রেম বড় জটিল ব্যাপার। ইহার জালে পড়িলে সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই, বড় বড় আমির, ওমরাহ, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই কাৎ হইয়া যায়। প্রেম ব্রহ্মাস্ত্র অপেক্ষাও প্রাণঘাতী, গোখুরার বিষ অপেক্ষাও বিষাক্ত, পর্ব্বত হইতেও উচ্চ, পাতাল অপেক্ষাও গভীর, ক্ষৌরকারের ক্ষুর হইতেও শাণিত, বজ্রাদপি কঠোর, কুসুমের চেয়ে কোমল, প্রাণের অধিক জীবন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। গানটা দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নিলামী ইস্তাহার অপেক্ষাও দীর্ঘ। শেষ হইলে আবার হাততালি। "বাবা, বাবা" বলিয়া অকারণ আবেগে আকুল এক বিগত যৌবনা বালিকা ছুটিয়া আসিয়া খোঁড়া গায়ককে জড়াইয়া ধরিল। খোঁড়া তাহাকে "মা আমার, চোখের মণি আমার" প্রভৃতি বলিয়া আদরান্তে তনয়ার সহিত কথোপকথনচ্ছলে দর্শকদিগকে নিজ ব্যর্থতা বিদগ্ধ জীবনের একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস শুনাইয়া দিল। এই ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি বলিবার সময় আবেগাধিক্যে সে থাকিয়া থাকিয়া গান গাহিয়া উঠিতে লাগিল। যথা নিজ মাতৃবিয়োগ। "সে কি ঝড়, কড় কড় কড় বজ্রাঘাতে······প্রাণহীন পড়ে ধরাতলে······ আমি নিরাশ্রয়······" ইত্যাদি। তার পর পত্নীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, কন্যার জন্ম, পত্নীবিয়োগ, সকল সম্পদ নাশ ও অর্দ্ধ সন্ন্যাসী অর্দ্ধভিখারী অবস্থায় জীবন যাত্রা। "চাঁদের আলোতে তাকে দেখিলাম······ ······ভাসাইয়া দিল মোরে আনন্দ সাগরে····· সে এল স্বর্গ হতে অমৃতের মত······আধ আধ কথা শুনে পরাণ-শীতল······প্রলয় গ্রাসিল মোরে···পুড়ে যাই জ্বলে যাই···নিভে আসে আলো···অসীম অরণ্যে

আমি একা…তোকে বুকে ধরে ভুলি দুখ…ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ণ ঘণ্টাধিক কাল গদ্যে, পদ্যে, সঙ্গীতে এই ইতিবৃত্ত শ্রবণের পর ড্রপ সিন পড়িল।

এখন অবধি মুসলমান নৃপতির আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। তিনি এইবার সসভাসদ্ আসরে উপস্থিত হইলেন। জঙ্গলের দৃশ্য। সকলে নৃপতিবরকে বুঝাইতে লাগিল যে তিনি প্রেমাস্পদাকে অবশ্যই খুঁজিয়া পাইবেন। আসল ব্যাপার এই যে বৎসরাধিক কাল পুর্ব্বে মৃগয়াকালে নবাব সাহেব কোন অজানা তরুণীকে দেখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তরুণী, যাহাকে বলে তাঁহার মনের গোপন কোণ অর্থাৎ অর্দ্ধ চেতনার কেন্দ্র বা 'সাব কনশাসে' বসবাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে শুধু নবাব বাহাদুরকে ভিতর হইতে উস্কাইয়া তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। সেদিন স্নানাগারে নবাব সহচরদিগের জিজ্ঞাসার অত্যাচারে তরুণীর আত্মগোপন করা আর চলিল না। নবাব বাহাদুর স্বয়ং এবং সকলে জানিয়া ফেলিলেন যে তরুণী উক্ত নবাবের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সকলে বলিল, "চলুন ইহাকে বাস্তব দেহে নবাব অন্তঃপুরে লইয়া আসা যাউক।" ফলে সকলে তরুণীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন।

আধুনিক ভারতীয় নাট্য কলার একটা বিশেষত্ব এই যে সঙ্গীতের স্থান ইহাতে খুবই উচ্চে। নাট্যচক্র ভারতের আদি যান গরুর গাড়ীর চাকার সহিত এ বিষয় খুব মিল রাখিয়া চলে। উভয়ের আবর্ত্তন হইতে অন্তহীন ধ্বনির সৃষ্টি হয়। ক্রোধ, হিংসা, ভালবাসা, শয়ন, উত্থান, ভোজন, অনাহার, মিলন, বিরহ, যুদ্ধারম্ভ অথবা শান্তিস্থাপন সকল বিষয়েরই একটা সুরের দিক আছে। ফলে, নাট্যে কোন কাজই কৃষ্টি

বর্জ্জিত বেসুরোভাবে হইতে পারে না। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইলেও মরণকালে নায়ককে অন্তত পনের মিনিট গান গাহিয়া রঙ্গমঞ্চের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মরিতে হয়। সুতরাং হারান প্রিয়ার অনুসন্ধানকালে জঙ্গলে যে থাকিয়া থাকিয়া নর্ত্তকীরা আবির্ভূত হইবে ও নবাব বাহাদুরকে গান গাহিয়া উৎসাহ দিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? একবার নিরাশ হৃদয়ে বুক চাপড়াইয়া নবাব বলিলেন "পাব না পাব না।" অমনি একুশ জন নটী দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে অঙ্গভঙ্গ সহকারে বলিয়া গেল "পাবে, পাবে।" সঙ্গীতমুখর সমারোহের সহিত অনুসন্ধান চলিতে লাগিল এবং এগার দফা হা হুতাশ ও নৃত্যগীতের পর সভাজন পরিবৃত নৃপতি যেখানে খোঁড়া গায়ক কন্যাকে লইয়া বসিয়াছিলেন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য হিন্দুরমণীর পক্ষে অতি প্রবল প্রণয়ের খাতিরেও মুসলমানকে বরণ করা সম্ভব নহে এবং যদিও এই তরুণীই সেই তরুণী এবং নবাব বাহাদুর বিশুদ্ধ গুলিস্তানী কায়দায় তরুণীকে প্রণয় নিবেদন করিলেন, এমন কি একটা ভাঙ্গা গলায় গানও গাহিয়া ফেলিলেন, তথাপি তরুণী এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রস্তাবে রাজি হইল না। সে ধীরে ধীরে বেহাগের তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে ভাঙ্গা নৌকাটার উপর দিয়া পরপার্শ্বে জলচিত্রের মধ্যে লুক্কায়িত মই বাহিয়া রঙ্গমঞ্চের নীচের তলায় চলিয়া গিয়া ডুবিয়া মরিল।

নর্ত্তকীরা গাহিল "শুধু রইল একটা ব্যথা।" খোঁড়া গাহিল "চাঁদ ডুবিল, অন্ধকারে আমি ধাই মরণের কোলে।"

নবাব বাহাদুর গাহিলেন, "বসোরায় শুখাল গোলাপ; বুলবুল দেওয়ানা।"

রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা। সকলে হাই তুলিতে তুলিতে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। খুল্লতাত বলিলেন, "এ যা থিয়েটর এরকমটি কলকাতা ছাড়া আর হয় না!"

হরেন বাবু বলিলেন, "এখন ত "অফ সিজন্"! শীতকালে অনেক নামজাদা "অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস" নামে ; এখন তারা সব পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে।"

খুল্লতাত বলিলেন, "এ যা হয়েছে এও ভাল বটে।"

(৪)

মাতুল, খুল্লতাত ও মেশোমহাশয় একমত হইয়া বলিলেন যে বিজয়কে অতঃপর কলিকাতার কলেজ জীবনের উপযুক্ত জামা কাপড় প্রভৃতি করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে হরেনবাবু অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত আর কেহ কলিকাতা সহরে নাই বলিলেই চলে। সুতরাং অভিভাবক সভা অবিলম্বে হরেনবাবুকে অনুরোধ করিলেন যে বিজয়ের কাপড় চোপড়টা করাইবার ভার যেন তিনিই একটু কষ্ট করিয়া গ্রহণ করেন। হরেনবাবু তাঁহার উন্নত রুচির এই প্রকার সমাদরে বিশেষ খুসী হইয়া বিজয়কে লইয়া দুই তিন দিন বাজারে ঘুরিলেন। ফলে বিজয় যেন কোন যাদুকরের সঙ্কেতে গ্রাম্য ভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া চক্ষের নিমেষে আধুনিক কলেজের ছাত্রের রূপ ধারণ করিল। লম্বা বহরের ধুতি, গ্ল্যাড নেক সার্ট, ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী, ডবল ব্রেষ্ট কোট, পাম্প সু, অক্সফোর্ড সু, জালি গেঞ্জি সার্ট প্রভৃতি কত কিছু। ব্যক্তিগত প্রসাধনের ব্যাপারও হরেন বাবু সযত্নে

বিজয়কে নিজ হাতে শিখাইয়া পোক্ত করিয়া তুলিলেন। চার আনা দশ আনা চুল কাটা ও বাঁ কাতে সিঁথা কাটিয়া ব্যাক ব্রাস করা হইল; দুই প্রকার চিরুণী, আয়না, ব্রাস, সেফটি রেজার, সাবান ও শেভিং ব্রাস আসিল। হরেন বাবু বলিলেন, "আরম্ভে ইহাই যথেষ্ট।" পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর ব্যবস্থা হইবে।

বহুবাজারে হরেন বাবুদের মেসের নিকটেই একটি স্টুডেণ্টস্ মেস আছে। সেখানে অপেক্ষাকৃত পয়সাওয়ালা লোকের ছেলেরা থাকিয়া লেখাপড়া করে। বিজয় কোন কলেজে ভর্ত্তি হইবে তাহা ঠিক না হওয়ায় সেখানে বায়না করিয়া রাখা হইল যে দুই এক সপ্তাহ পরে পাকা ব্যবস্থা হইবে।

অভিভাবকেরা দৃঢ় চিত্তে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে অথবা পদব্রজে, গমনা-গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিজয় হরেন বাবুর সহিত ট্রামে বাসে যাতায়াত স্থরু করিয়া দিল। একটা সাইকেল ক্রয় করিয়া অভ্যাস করা হইবে বলিয়া জল্পনা হইল।

একদিন হরেন বাবু বলিলেন, "চলুন কাল ভাল একটা ফুটবল ম্যাচ আছে, দেখে আসা যাক।"

মাতুল ফুটবল খেলাটাকে জাহান্নমে যাইবার একটা সিধে রাস্তা হিসেবে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ফুটবল কি হে? আরে ছিঃ, ভদ্রলোকে আবার ঐ সব দেখতে যায়?"

হরেনবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মানে? যত বড় সাহেব মায় লাটসাহেব অবধি ফুটবল দেখতে যান। হাইকোর্টের জজেরা ফুটবল ক্লাবের মেম্বার হয়। যত উকিল, ব্যারিষ্টার, প্রফেসর, ডাক্তার, এটর্নী সকলে ফুটবল দেখতে যায় ত ভদ্রলোকে যায় না মানে কি হল? ফুটবল

খেলার জোরে খাঁদা গণেশ তৃশ টাকার চাকরী পেয়ে গেল! আপনি আছেন কোথায় আর কি মাথামুণ্ডু বকছেন?"

মাতুল ব্যাপারটা ঠিকমত গড়াইতেছে না বুঝিয়া বলিলেন, "আরে, মানে আর কি, ফুটবল, বুঝলে কি না।"

হরেনবাবু, "খুব বুঝলাম, বুঝলাম না আবার? কাল সাড়ে চারটার সময় তৈরী থাকবেন।" বলিয়া চলিয়া গেলেন। খুল্লতাত বলিলেন "হুঁ হে এ কি সে ফুটবল? তুমিও যেমন। ফুটবল মানে কলকাতায় আর কিছু খেলা হবে এখন। চল দেখে আসা যাক।" পরদিন ময়দানে ফুটবল গ্রাউণ্ডে পঁহুছিয়া সকলের চক্ষু স্থির। হাজারে হাজারে লোক, সারি সারি অগুন্তি মাচা বাঁধা, পুলিশ পাহারা, ঘোড় সওয়ার দেখিয়া ব্যাপারটা কতটা নিরাপদ হইবে বিচার করিতে করিতে হরেন বাবু তাঁহাদিগকে টিকিট কিনিয়া একপ্রকার ধাক্কা মারিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন। টিকিট কিনিয়া কেহ ফুটবল খেলা দেখে একথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও এক্ষেত্রে মানিয়া লইতে হইল।

তারপর গোরা পল্টনের ব্যাণ্ড বাজিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ প্রচণ্ড হাততালির সহিত রং বেরংএর কুর্ত্তা পরিয়া একদল গোরা খেলোয়াড় আসিয়া আসরে নামিল। তাহাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একদল বাঙ্গালী খেলোয়াড় আসিয়া ঢুকিল। হাততালি যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। দূর সম্পর্কের আত্মীয় একজন সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোরাদের সঙ্গে খেলবে?"

হরেনবাবু সহাস্য বদনে বলিলেন, "শুধু খেলবে? খেলে কাৎ করে দেবে দেখবেন এখন।"

খেলা আরম্ভ হইল। এদিক ওদিক জলের ঢেউয়ের মত

খেলোয়াড়গণ ক্রীড়া ক্ষেত্রের উপর দিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যেন প্রবল ঢেউ গিয়া তটে লাগিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। একজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় চিৎ হইয়া পড়িয়া আর উঠিল না। "ফাউল, ফাউল" চীৎকারে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে উঠাইয়া বাহিরে লইয়া গেল। খুল্লতাত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরল না কি ?"

হরেনবাবু বলিলেন, "না, একটু চোট লেগেছে; এই ফিরে এল বলে।" সত্য সত্যই খেলোয়াড়টি দুই এক মিনিট পরেই দৌড়িয়া আসিয়া পুনরায় খেলায় যোগদান করিল। সকলে হাত তালি দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। দুইজন খেলোয়াড় বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিয়া পরস্পরের সহিত ধাক্কা খাইয়া পড়িল। এইবার বাঙ্গালী উঠিল কিন্তু গোরা শুইয়া রহিল। একজন ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "ফাউল"। তাহাকে তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ জন মুখ ভেঙ্গাইয়া উঠিল, "ফাউল, ফাউল না তোমার মাথা! ফুটবল দেখতে এসেছে!" সে নির্ব্বাক হইল। গোরাও কিছু পরে আসিয়া খেলায় আবার নামিল।

হাফ টাইম হইয়া গেল। কোন পক্ষই গোল দিতে পারিল না। একবার বাঙ্গালীদের গোলের উপর গোরারা খুব ভীড় করিল। চতুর্দ্দিকে, "অফ সাইড, ফাউল" প্রভৃতি ধ্বনি উঠিতে লাগিল। কিছু হইল না। বাঙ্গালী ব্যাক সুযোগ বুঝিয়া এক প্রচণ্ড লাথিতে বলটাকে বহুদূরে পাঠাইয়া দিয়া আক্রমণ ভাঙ্গিয়া দিল। বাঙ্গালীদিগের এক ফরোয়ার্ড। ছোট খাট রোগা মতন। তাহাকে দুইজন গোরা সদা সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। যেন সে মহা শত্রু, সুবিধা পাইলেই

কিছু অনিষ্ট করিয়া বসিবে। হঠাৎ এক ফাঁকে সে বলটা লইয়া রক্ষী দুইজনকে এড়াইয়া হাওয়ার আগে ছুট দিল। অতি দ্রুতগতিতে সকলকে ধোঁকা দিয়া পাশ কাটাইয়া সে গোরাদিগের গোলের উপর গিয়া পড়িল। বিকট হুঙ্কারে চরাচর ডুবিয়া গেল, "গো অন, লাটু গো অন!" তার পর মনে হইল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া রসাতলে গেল। "গোল, গোল" ধ্বনি ও ছাতা, টুপি প্রভৃতি মাথার উপরে ছুঁড়িয়া একটা প্রলয়ের সূচনা হইল। বাঙ্গালীরা এক গোলে জিতিবে এই আশায় মরিয়া হইয়া খেলিতে লাগিল। গোরাদিগের খেলা উদ্দাম গতিতে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সময় আর ছিলনা। গভীর বিজয়-ধ্বনির মধ্যে খেলা শেষ হইল।

মাতুল বলিলেন, "হুঁ, এ রকমটা হলে দেখতে লোক আসবে নই কি!"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ, হে; কেল্লার গোরা, বুঝলে?"

মেশোমহাশয় হরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে সব খেলোয়াড়, এরা সব কি করে? এদের কি খেলবার জন্যেই মাইনে করে রাখা হয়েছে না কি?"

হরেনবাবু বলিলেন, "মাইনে করে রাখবে কেন? এরা সব অ্যামেচার। এর মধ্যে কয়েকজন মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ করে; একজন দুজন বড়লোকের ছেলে। কিছু করে না। একজন ডাক্তার, একজন রেলে কাজ করে, দু জন ছাত্র আর একজন প্রফেসর।"

"বল কি হে; ডাক্তার, প্রফেসর! আচ্ছা জায়গা বাপু, এই রকম সব ভদ্রলোক, ডাক্তার, প্রফেসর সব কেল্লার গোরাদের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করে লুটোপুটি খাচ্ছে!"

"তা আর এমন আশ্চর্য্য কি? আজকাল আর সেকাল নেই যে বিশ বছর পেরতে না পেরতেই সব গম্ভীর মুখে পরলোক চিন্তা করতে বসে যাবে।"

খুল্লতাত বলিলেন, "হুঁ, তা যা বলেছ!"

বিজয় বাঙ্গালীর বিজয় গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া হাঁটিয়া চলিতেছিল। তাহার ঈষৎ কুব্জভাব যেন কতকটা কমিয়া সোজা হইয়া গিয়াছিল। মুখের ঢিলা বাঁধুনি যেন এক নবলব্ধ দৃঢ়তায় চিরন্তন রূপ ত্যাগ করিয়া বীরত্ব ব্যঞ্জক হইয়া উঠিল। খুল্লতাত তাহার মুখ দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "আরে বিজয় যে পল্টনের মত হাঁটতে স্বরু করলি। সবাই ভাববে তুইই জিতেছিস।"

বিজয় লজ্জা পাইয়া আবার নুইয়া পড়িল। হরেন বাবুকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার কলেজে ফুটবল খেলে ছেলেরা, না বারণ?"

হরেন বাবু বলিলেন, "খেলা বারণ! আরে বাবা বেশীর ভাগ ছেলে শুধু খেলেই বেড়ায়, লেখা পড়াটা উপলক্ষ্য মাত্র। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, ওয়াটার পোলো, বাস্কেট বল, ভলি বল, দাঁড় টানা, দড়ি টানা, দৌড়ান, লাফান, আর কত নাম বলব? খেলার শেষ নেই। তা ছাড়া তাস, পাশা, দাবা বড়ে, ড্রাফট্‌স, ক্যারম, পিং পং, এসব হ'ল ঘরের মধ্যে খেলবার। আরও আছে। কুস্তি; হাডুডুডু, সাঁতার, বক্সিং, ওয়েট লিফটিং, জিমন্যাস্টিক, লাঠি ছোরা, তলোয়ার .. শেষ নেই হে শেষ নেই। খেলতে যদি চাও ত সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খেলতে পারবে। আজকালকার ছাত্রজীবন মানে খেলা, খেলা, খেলা এবং অবসর সময়ে ভোট ক্যানভাস করা, বক্তৃতা

দেওয়া, নয়ত গান, থিয়েটার, বাজনা, সাহিত্য কি চিত্র কলার চর্চ্চা করা। লেখাপড়াটা, বুঝলে কি'না যাদের কোন কাজ নেই, তাদের জন্যে। কোন ভয় পেওনা, সময় কাটাবার জন্তে কোন চিন্তা করতে হবে না। সকালে উঠবে আর ফস্ করে দিন কেটে যাবে।" মেশো মহাশয় অবাক হইয়া এই বর্ণনা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "সত্যি বলছ না তামাসা করছ? এত খেলার ব্যবস্থা ছেলেদের জন্যে? ত পড়ে কখন?"

"আমিও ত আজ তিন চার বৎসর ধরে ঐ প্রশ্নই করছি। পড়ে কখন? উত্তর, পড়ে না। কোন রকমে পরীক্ষার আগে নোট মুখস্থ করে কাজ শেষ করে। অবশ্য পড়েই বা হবে কি? হাজারটা পাশ করলে একটার চাকরী হয় আর বাকী গুলো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে মরে। যে গুলো খেলতে টেলতে শেখে সে গুলো বরং উৎরে যায়। খেলোয়াড়ের সর্ব্বত্র আদর। ধর না কেন আমার নিজেরই কথা। যদি ভাল তাস খেলতে না পারতাম ত কবে ঘাড ধরে বের করে দিত এত দিনে।"

"তা হলেও পড়াটাই ত আসল কথা। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েই ত ডুনিয়া চলছে; না খেলা দিয়ে?

"আরে জ্ঞান বুদ্ধি আর পড়া এক কথা হল? পড়া মানে হল সিরাজদ্দৌলার কয় জোড়া জুতা ছিল, আকবর বাদসা আব চন্দ্রগুপ্ত কত হাজার পল্টন রাখতেন, রোমিও জুলিয়েটকে আর নলরাজা দময়ন্তীকে কি বললেন, তক্তাপোষ আর সিংহাসন একই জিনিস কি না, পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে যেতে কত সময় লাগে, লাল আর নীলে কত ইঞ্চির ব্যবধান... এই সব বড় বড় কথা। জ্ঞান বুদ্ধি হল তুনিয়ায়

বেঁচে থাকার উপায় জানা। নাক টিপে তৈলাধার আর পাত্রাধার আওড়াও কিংবা চশমা এঁটে মুক্তি কয় প্রকার, নয়ত সেক্ষপীয়ারের ইংরেজীতে কয় ভাগ জল মিশালে সংবাদ পত্রের ইংরাজী হয় বিচার করো; ধুতি যে হাঁটুর উপরেই থেকে যায়; পেটের খিদে যে বেড়েই চলে; ছাদের ফুটো দিয়ে জল পড়া যে আর বন্ধ হয় না! চালের হিসেব রাখতে শিখলেই চাষ করতে শেখা হয় না।”

মেশোমহাশয় চুপ করিলেন। খুল্লতাত বলিলেন, “যা বলেছ! খাঁটি কথা। শুধু বই পড়া বিদ্যেয় কাজ চলেনা। হাতে কলমে কাজ না শিখলে শুধু নামতা মুখস্থ করে কি কারিগর হওয়া যায়। আসলে দরকার কাজ শেখা। বই পড়লে কথা শেখা হয়।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই সংবাদ পাওয়া গেল যে বিজয় একাধারে তিনটি কলেজ হইতে আহুত হইয়াছে। সকলে অমনি সভা করিয়া বসিয়া গেলেন যে এই কলেজ ত্রয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ। কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান কাহারও না থাকায় ঠিক হইল সন্ধ্যা বেলায় হরেন বাবুর নিকট পরামর্শ লইয়া তারপর ঠিক করা হইবে কোনটিতে বিজয় ভর্ত্তি হইবে।

হরেন বাবু আসিলে পরও বহুক্ষণ কথা বার্ত্তা চলিল। তিনি নিজেও এ বিষয়ে খুব খবর রাখিতেন না, সুতরাং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা প্রশ্ন করিয়া বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেখা গেল বিজয় নিজে এ বিষয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে বহু খবর কুড়াইয়া একত্র করিয়াছে। কোন বিষয়ে কোন প্রফেসরের নাম ডাক কি প্রকার, কোন কলেজ হইতে কয়বার কি কি বিষয়ে পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করা হইয়াছে, এই জাতীয় বহু খবর তাহার নিকট পাওয়া গেল। সকল দিক দেখিয়া শেষ অবধি ঠিক

হইল কার্জ্জন কলেজই তাহার পাঠ্য বিষয়ের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ঠিক হইল বিজয় কার্জ্জন কলেজেই ভর্ত্তি হইবে। মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া আহার নিদ্রায় মনোনিবেশ করিলেন।

মাসাধিক কাল কলিকাতা বাসের ফলে বিজয়ের গুরুজন মণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন মানসিক ও ব্যবহার গত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যথা মাতুল এখন সুবিধা হইলেই ফুটবল গ্রাউণ্ডে কাল যাপন করেন। বিশেষ বিশেষ খেলার দিনে তাঁহাকে প্রাতেই ছাতা ও ডিবায় রক্ষিত ফুলুরী, জিলাপি প্রভৃতি লইয়া ময়দানের দিকে যাইতে দেখা যায়। তাঁহার আলোচনার বিষয়ের মধ্যে বড় বড় খেলোয়াড়দিগের গুণ বর্ণনা ও তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। খুল্লতাত আজকাল স্নানের সময় বিকট শব্দে থিয়েটারী সুরের আলাপ করেন এবং সপ্তাহে দুইবার অন্ততঃ রঙ্গমঞ্চের এলাকায় যাতায়াত করেন। ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ ভুমিকায় অভিনয় চাতুর্য্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের আদর্শ কি এবং কোন ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার প্রয়োজন, সীন, পোষাক, পরচুলা ও মেক আপ, প্রভৃতি নানান বিষয়ে খুল্লতাতের মতামত আজকাল স্বয়ং হরেন বাবুও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। খুল্লতাতের সাজসজ্জাও অনেকটা হরেন বাবুর অনুকরণে ভদ্র হইয়া আসিয়াছে। তিনি গার্টার, স্টাড, কলার, কাফ, ইত্যাদি ভদ্রলোকের পোষাকের প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন এবং অবিশ্বাসী মেশোমহাশয়কে তাচ্ছিল্য ভরে গেঁয়ো গুরু আখ্যা দিয়াছেন। মেশোমহাশয় কলিকাতা বাসের সুযোগে নিজ পর কালের ব্যবস্থা পাকা করিয়া লইতে ছিলেন। প্রত্যহ গঙ্গা স্নান ; কালিঘাট, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া, পূজা দিয়া তিনি

প্রায় পুণ্যের বোঝা পূরা করিয়া ফেলিয়াছেন। বদভ্যাসের মধ্যে নস্য গ্রহণ সুরু করিয়াছেন। তাঁহার মতে কলিকাতা একাধারে স্বর্গ ও নরকের সঙ্গম স্থল। এখানে আসিলে মানুষের সত্যরূপ জাহির হইয়া পড়ে এবং কলিকাতা বাসের পরীক্ষায় যে পাশ করে সেই মুক্তিলাভের ফাইনাল পরীক্ষায় বসিতে অধিকারী হয়। মেশোমহাশয় এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দুই আত্মীয় কলিকাতা প্রবাসী রাঢ় দেশবাসীদিগের ভোজন বিভ্রাট দেখিয়া বউবাজার অঞ্চলে নিজ দেশীয় এক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া ভাতের হোটেল খুলিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা আর দলভুক্ত নাই। ইহাদের ব্যবসা বুদ্ধি দেখিয়া খুল্লতাত মন্তব্য করিলেন, "হুঁ, কাজটা করেছে ভালই। নির্ব্বোধের সহায় ভগবান, নিশ্চয়ই উন্নতি করিবে।"

বাকি কয়জন অবস্থা বুঝিয়া কখন ফুটবল, কখন থিয়েটার বা পূজাতে লাগিয়া পড়েন। তাঁহারা অল্প বয়সেই বুঝিয়াছিলেন যে নিজ নিজ চেষ্টায় চলিলে বিপদ অনেক; সাবধান লোকে দলে ভিড়িয়া ব্যতীত চলে না।

বিজয় হরেন বাবুর জানা শোনা দুই একটি বাড়ীর কলেজের পড়ুয়া ছেলেদের সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছে। সে দিন গুনিতেছে গুরুজন বাহিনী তাহাকে মুক্তি দিয়া কবে ঘরে ফিরিবেন। গুরুজনেরাও সুখের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া যথাশক্তি শেষ কয়টা দিন, কলিকাতা বাস সার্থক করিয়া লইতেছেন। ক্রমশঃ দিন আগাইয়া আসিল। গ্রামে ফিরিয়া যাইবার দুই তিন দিন পুর্ব্বে বিজয়কে বৌবাজারের ছাত্রদের মেসে পৌছাইয়া দেওয়া হইল।

তারপর একদিন উপদেশ ও অনুরোধের বোঝায় বিজয়ের মনপ্রাণ আকুল ও ভারাক্রান্ত করিয়া বস্তা বাণ্ডিল ও নূতন নূতন স্টীল ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেশের ঘন ঘটায় গুরুজনরা সকলে হাওড়ায় ট্রেনে চড়িলেন। শেষ অবধি "বিজয় দুধ নিয়মিত খেও। সামান্য অসুখ হ'লেই হরেন বাবুকে খবর দিও। লেখাপড়া যেন ফেলে রেখে খেলে বেড়িও না। দৈনিক পত্র দিবে।" ইত্যাকার শতমুখী আদেশে প্ল্যাটফর্ম্ম মুখরিত হইয়া উঠিল। ট্রেনটা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইলে পর হরেনবাবু বিজয়কে সঙ্গে লইয়া ষ্টেসন ত্যাগ করিলেন। বলিলেন "সাতটা সরষে দিয়ে গঙ্গা স্নান করে মেসে ফিরে চল। আর কিছু দিন এরা থাকলে তোমার পরকাল ঝরঝরে করে ছেড়ে দিত। সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু বুঝিবা এর চেয়ে আরামে ছিল! এ রকম তত্ত্বাবধান আর কিছু দিন চললে তোমার আর টিকি টুকুও খুঁজে পাওয়া যেত না। বাপ!" আশ্চর্য্য প্রদীপ ঘর্ষণান্তে দানবীয় শক্তির সাহায্যে আলাদিন যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজ সরল, সহজ, পুরান জীবন ধারা ত্যাগ করিয়া নূতন আড়ম্বরের বৈচিত্র্যপূর্ণ আসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল; বিজয় তেমনি যাত্রী নিবাস ছাড়িয়া ছাত্র নিবাসে প্রবেশ করিয়া একটা আমূল পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে পড়িয়া গেল। দৈনন্দিন জীবন যাত্রা যে এত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া চলিতে পারে তাহা সে পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সকালে চায়ের সরঞ্জাম, শুধু তাহারই জন্য, ট্রেতে সাজাইয়া ভৃত্য হস্তে আসে। স্নানের ব্যবস্থা হয় তৎপরে, চাকরের হস্তে তেল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি দিয়া স্নানাগারে গমন করে। টেবিলে খাওয়া, তার কাচের বাসন ও কাঁটা, ছুরি, চামচের সমাবেশ।

কলেজের খাতা বই অ্যাটাশি কেশে সাজাইয়া কলেজে যাওয়া,

সেখানে বালকদের পরস্পরকে আপনি সম্বোধন করিয়া বাক্যালাপ, প্রফেসরদের অতি ভদ্র ব্যবহার, কমনরুমের আড্ডা ও ঠাট্টা মস্করা, কলেজ শেষে রেস্তরাঁতে চা পান, মেসে ফিরিয়া পুনরায় ভৃত্য হস্তে আত্ম সমর্পণ, নৈশ ভোজনের আয়োজনের ঘটা ও নিশাকালে বৈদ্যুতিক আলোকে পরদিনের পড়া করা; সবই যেন একটা সুখস্বপ্নের মত মনটাকে সম্মোহিত করিয়া রাখে। ইহা ব্যতীত কখনও ইউনিভারসিটি ইনস্টীট্যুটে, কখন ক্রীড়া ক্ষেত্রে, কখনও বা সিনেমাতে সন্ধ্যা কাটিয়া যায়। কলেজেও কত নব নব চরিত্রের লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। কেহ কথায়, কেহ বা পোষাকে অথবা ব্যবহারে নিত্য নূতন ভাবের প্রকাশে তাহার গ্রাম্য সংস্কারকে নাড়া দিয়া মনটাকে নূতন আকাঙ্ক্ষায় সজাগ করিয়া তোলে। চিন্তায়, ভাষায়, বিতর্কে বিজয় নিত্য নূতন রাজ্য জয় করিয়া অনন্ত প্রগতির পথ বাহিয়া কয়দিনে, যেন গ্রামটাকে সহস্র বৎসর পিছনে ফেলিয়া এক নূতন জগতে আসিয়া পড়িল। গ্রামের বন্ধুরা, পরিবারের লোকেরা যেন দূরে, অতি দূরে, সৃষ্টির কোন এক নিভৃত অর্দ্ধ বিস্মৃত কোণে পড়িয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া মনের ভিতরে তাহাদের কথা ক্ষণিকের জন্য তীব্র বেদনায় জাগিয়া উঠিত; কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্যই। মনটা বর্ত্তমানের বিচিত্র রসে কানায় কানায় ভরিয়া থাকায় স্মৃতির বেদনা তাহাতে নিমেষে অতলে ডুবিয়া যাইত।

হরেন বাবুর সহিত প্রায়ই দেখা হইত। তিনি বলিতেন, "বাঃ, এই বার চেহারাটা কলকাতার মত হয়ে আসছে! আর একটু সোজা হয়ে হাঁটা দরকার। আর ঐ হাঁ করে থাকাটা এবার ছেড়ে দাও। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে থেক। অল্প অল্প তোতলাম; ও কেটে যাবে

দুদিনে। এ সার্টটা বেশ কেটেছে ত? কাঁধের উপর বেশ বসেছে। কলারটা একটু বড় আছে। যাক, একটু মোটা হলেই মানান সই। পাঞ্জাবীর আস্তিনটা ধোপাকে গিলে করে দিতে বলবে, আর ধুতিগুলো যেন কুঁচিয়ে দেয়। চাকর বেটাকে বলে দিও।" বিজয় গ্রামে থাকিতে শুনিয়াছিল কলিকাতায় স্বদেশীর খুব প্রচার। হরেনবাবু যখন নানান প্রকার চটকদার জামা কাপড় তাহার জন্য করাইয়া দিতে লাগিলেন তখন তাহার খুবই আশ্চর্য্য মনে হইল যে এই সকল রং বেরং এর স্ট্রাইপ, চেক, প্রভৃতি সার্ট কোটের কাপড় এদেশে তৈয়ারী হয়। সে বলিল, "আচ্ছা এসব কারা বোনে? খুব বাহার করেছে ত!"

"কারা আবার বুনবে? এ সব খাস বিলিতি মাল বুঝেছ?"

"বিলিতি মাল? আমি ভেবেছিলাম এদেশে তৈয়ারী। আমার ধারণা ছিল কলকাতায় কেউ বিলিতি কাপড় পরে না।"

"হেঁ, পরে না আবার? সবাই পরে। না পরে যাবে কোথায়? ভাল কাপড় কি এ দেশে তৈরী হয়। ভদ্র লোকের গায়ে দেবার মত সার্ট কি কোট বিলিতি কাপড় ছাড়া হতেই পারে না। ঐ মাঝে মাঝে খদ্দর পরে ঘুরে আসে আর কি লোক দেখাবার জন্যে। আসলে বিলিতি কাপড়ের খুব আদর আছে, বুঝলে কি না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝেছি; কিন্তু......"

"ওতে আর কিন্তু টিন্তু নেই। কাপড় চোপড় ভাল না পরলে কোন খাতির পাবে না। আর ভাল কাপড় মানেই বিলিতি কাপড়। যে দেশের মানুষ যে রকম তার মালপত্র সেই রকম, বুঝলে? ইয়া, ইয়া চেহারা; কারুর লাল চুল, কারো বা বাদামী; চোখ কোনটার নীল, কোনটার সবুজ; ওরা যা কাপড় বুনবে তার সঙ্গে কেলে কিষ্টি

মার্কা গেঁয়ো জোলার কাপড়ের তুলনা হয় কখন ! সেদিন হ্যারীস সায়েব দেড়শ টাকায় একডজন সার্ট করালে ফেল্‌প্‌সের বাড়ী থেকে ! আট আনা দশ আনা একটা রুমালের দাম হে, বুঝেছ ? এক জোড়া মোজাই সাড়ে পাঁচ টাকা। হ্যাঁ ধুতিটা দিশী হয় বটে ; কিন্তু সার্ট কি কোট ; রামচন্দ্র ; কখ্‌খন না !"

"দিশী জিনিস আর কি ভাল হয় ?"

"এই ছার পোকা, উইপোকা, পিঁপড়ে। এমন হয় যে দেখে সায়েবদের অবধি পিলে চমকে যায়। আলু, কপি, কড়াই শুঁটি এ সবও বিলিতি ভাল, আমি খেয়ে দেখেছি। রাজার মত, সবই রাজ সংস্করণ বুঝলে কি না।"

বিজয় বিলিতির মাহাত্ম্যে নির্ব্বাক হইল। ভাবিল, প্রকৃতির যদি এই বিধান হয় যে বিলাতে সব কিছু উত্তম হইবে এবং ভারতে অধম, তাহা হইলে আর কি করা যাইবে ? হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় আছে, ঠিক কিনা ?"

"হ্যাঁ, পাহাড় আছে ! পাহাড় খাবে না পাহাড় পরবে ? পাহাড় আছে ত কি হয়েছে ?"

বিজয় বলিল, "আর ভারতের সভ্যতা সর্ব্ব পুরাতন।" "তা হলে আর ভাবনা কি ? সর্ব্ব পুরাতন জুতা আর সর্ব্ব পুরাতন কাপড় খানা পরে লাট সায়েবের দরবারে চলে যাও। খুব খাতির পাবে। সর্ব্ব পুরাতন বলে গর্ব্ব করবার কি আছে ? মানে সব চেয়ে ফাটা, ছেঁড়া, পচা আর পোকায় কাটা এ ছাড়া আর কি ? কোন জিনিসই ত সর্ব্ব পুরাতন চাওনা ত খালি সভ্যতার বেলায় পুরাতন খুঁজে মর কেন ?"

বিজয় কোন জবাব দিতে পারিল না। শুধু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ রহিয়া গেল যে কথাগুলা খুব জোর দিয়া বলিয়া হরেনবাবু জিতিয়া গেলেন। কলেজে? একটি যুবক; সে জনৈক দেশ নেতার দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়। সুতরাং পারিবারিক কর্ত্তব্য হিসাবে সে সদা সর্ব্বদা খদ্দর পরিয়া বেড়াইত। অবশ্য তাহার অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু সবই উচ্চ মূল্যের বিলিতি মার্কার। হাত ঘড়িটা সুইস মেড, কলমটা আমেরিকান, চশমা জোড়া অতি আধুনিক জার্ম্মান কাঁচ ও আমেরিকান ফ্রেমের, বর্ষাতি কোটটা লণ্ডনের, জুতা জোড়াও ফরাসী দেশীয় চামড়ায় চীনা কারিগরের প্রস্তুত। একটা মরোক্কো চামড়ায় বাঁধান নোট বুক ও তদ্রূপ একটা টাকা পয়সা ইত্যাদি রাখিবার ওয়ালেট। রুমালের এসেন্স, মাখিবার সাবান ইত্যাদি যা নাম করিত সবই বিদেশী। তাহার অবসর সময়ে সে বিলিতি নভেল ও ম্যাগাজিন পড়িত কিম্বা বিলিতি ছবির সন্ধানে চৌরঙ্গী অঞ্চলের সিনেমায় সতত ঘোরা ফেরা করিত। সে একদিন বিজয়কে বলিল, "আপনি দেখছি কাপড় জামা সবই বিলিতি পরেন।"

বিজয় আমতা আমতা করিয়া বলিল; "হ্যাঁ, এই ভাল রকম তৈয়ারী করতে বলেছিলাম এই রকম দিয়েছে। বল্লে দিশী কাপড় ভাল হয় না।" সুদর্শন বোস বলিল, "'দিশী কাপড় ভাল হয় না। লোকটা আচ্ছা 'লায়ার' ত! হিষ্ট্রি পড়লে দেখবেন বিলেতের লোকে এদেশ থেকে কাপড়ের 'স্যাম্পল্' নিয়ে গিয়ে নকল করে 'মার্কেট ক্যাপচার করেছে।'

বিজয় বলিল, "সেত আগেকার কথা; এখন শুনেছি এদেশে আর ভাল কাপড় হয় না।" "এই যা বিশ্বাস করলেন, এই 'স্লেভ মেণ্টালিটি!'

মিথ্যা কথা রাষ্ট্র করে লোককে 'হিপ্নোটাইজ' করে রেখেছে। বিশ্বাস করবেন না। সর্ব্বদা নিজেকে বলবেন অপরকেও বলবেন, খালি স্বদেশী চাই, স্বদেশী ছাড়া কিছু চাই না।" "কিন্তু তা হলে যে অনেক জিনিস ব্যবহার করা ছেড়ে দিতে হবে। বিলিতী ছাড়া অনেক জিনিস হয়ই না। তার কি হবে?" "ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, 'সাফার,' করতে হবে, 'সেল্‌ফ্‌ ডিনায়াল' করতে হবে—নইলে ভারতের মুক্তি নেই। প্রথম কথা ঐ কাপড় দিয়ে আরম্ভ করুন। ঐটা হলেই বিদেশীরা জব্দ হয়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে সব হবে।" "কিন্তু বিলিতি ওষুধ, বিলিতি বই, বিলিতি যন্ত্রপাতি, এসব কিনবেন না?"

সুদর্শন বলিল, "তর্কে বহুদূর! বুঝেছেন? একটা জোরালো রকম 'ফেথ' ছাড়া কিছু হয় না। বিশ্বাস করতে হবে যে এই পথেই মুক্তি, নয়ত ঐ তর্কই করতে থাকবেন, পাবেন না কিছুই।"

বিজয় বলিল "কিন্তু সবাই ত হাজার রকম বিলিতি জিনিস কিনছে আপনিও ত অনেক কিছু কেনেন, ত যা বলেছেন সে রকম হবে কি করে?"

সুদর্শন বিরক্ত হইয়া বলিল, "আবার ঐ তর্ক? আমি দেখুন খদ্দর পরেছি। সবাই খদ্দর পরলে কাজটা 'ফিফটি পারসেণ্ট' হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে।"

বিজয় ব্যাপারটার গণিতের দিকটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে অগত্যা বলিল, "তা হবে, আচ্ছা এর পরে সার্ট করাবার সময় দিশী কাপড় দেখব এখন। কেউ পরেনা বলে আমিও কিছু ভাবিনি।"

সেদিন মেসে ফিরিয়া আসিয়া বিজয় দেখিল একজন যুবক তাহার ঘরে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। যুবক অপরিচিত। বিজয়কে

দেখিয়া সে নূতন কায়দায় বুকের উপর হাতজোড় করিয়া রাখিয়া মস্তক ঈষৎ আনত করিয়া নমস্কার করিল। বিজয় প্রতিনমস্কার করিলে পর আগন্তুক বলিল, "আপনি বিজয় গড়াই? আপনার শিক্ষক সরসী দত্তের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

বিজয় বলিল, "ও, মাষ্টার মশাই! কি লিখেছেন তিনি?"

"লিখেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে, আপনার যাতে কলকাতা প্রবাস নির্জ্জনে না কাটে তার ব্যবস্থা করতে আরও কত কিছু। সরসী দত্ত আমাদের বন্ধু এবং গুরু। তাঁর প্রতিভাতে আমরা সকলে মুগ্ধ। আমার নাম সৌম্য ঘোষ। আমি লেখক। ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়ি। আপনি সাহিত্য চর্চ্চা করেন নাকি?"

"আজ্ঞে না, এই পরীক্ষার পড়ার জন্যে যা দুচার খানা বই পড়েছি ঐ অবধি।"

যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "সরসী দত্তের ছাত্র! শুধু পড়ার বই পড়েছেন ঐ অবধি! হাঃ হাঃ হাঃ, হাসালেন মশায়! আপনার মাষ্টার মশায়ের ধারে কাছে গেলে শুকন কাঠে ফুল ফুটতে আরম্ভ হয়, আর আপনি শুধু পাঠ্য পুস্তক পড়েছেন! বেশ যা হোক ঠাট্টা করছেন। আপনি কি কবিতা লেখেন?"

"কবিতা কি করে লিখব? আমায় মারলেও কবিতা বেরোবে না। আপনি কি কবি?" "হেঁ, হেঁ আমি কবিতা লিখি বটে, তবে কবি একথা গর্ব্ব করে বলতে পারি না। জগৎকবি সভায় ঘোরাফেরা করি; এর ওর মুখ চেয়ে থাকি, যদি সঙ্গগুণে কিছুটা তাদের ভাব ও রসের স্পর্শ আমার প্রাণে লেগে যায়। 'ইনফেক্‌শন' চাই, কিন্তু

এমনিই 'ইমিউনিটি' যে ভাল করে ব্যয়রাম ধরে ওঠে না। একটু হাঁচি কাশি ; বাস খতম, আবার যে 'ইয়োরস্ ফেথফুলি' সৌম্য ঘোষ সেই সৌম্য ঘোষ।"

"কিসের বিষয় লেখেন ? রাম রাবণের যুদ্ধ, অভিমন্যু বধ না ফুল পাতা এই সব নিয়ে ?"

"হাঃ, হাঃ, হাঃ আপনি দেখছি খুব রসিক লোক! তা হবে না ; কার সাকরেদ! সরসী দত্ত,—বাংলার হুইটম্যান! রাম রাবণের যুদ্ধ যা বলেছেন! অন্তরের ভিতরে যে দিকে তাকাই প্রবৃত্তিগুলো দশমাথা হয়ে বিশ হাত বাড়িয়ে চিবিয়ে খেতে আসছে ; আর কামনার বাহিনী রাক্ষসে মূর্ত্তি ধরে কার মাথা খাই, কার রক্ত শুষি' বলে বিকট চীৎকারে অন্তর গগন গরম করে তুলেছে! আমি শ্রীরামচন্দ্র হা সীতা, হা সীতা করছি আর মাঝে ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে কোন প্রকারে রাক্ষসদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাচ্ছি! যা বলেছেন! সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর হালই হয়েছে আমার। কাবুলি, মাড়োয়ারী, বেহারী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, গুজরাটি পাওনাদারে ছেঁকে ধরেছে। কোন বেটা দিয়েছে নগদ, কেউ বা কাপড়, কেউ জুতা, জামা, পান, সিগারেট, কাগজ, কলম কি আসবাব বাসন। চক্রব্যূহ ভেদ করে 'ক্রেডিট মার্কেটে' ঘোরা ফেরা করছি। বেরবার উপায় নেই। বেটাদের যত পারি ঘায়েল করছি। শেষ অবধি অবশ্য ওরাই জিতবে। কুছ পরোয়া নেই।"

বিজয় অবাক হইয়া এই উন্মাদের প্রলাপ শুনিয়া যাইতেছিল। কথার মধ্যে সরসীর সহিত সাদৃশ্য কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল, কিন্তু আরও অর্থহীন। সে অগত্যা হরেন বাবুর শিক্ষামত বলিল "এক পেয়ালা চা খাবেন ?"

"তা আর খাব না! নিশ্চয় খাব। এক পেয়ালার বেশীই খাব কেননা ভেতরটি ব্লটিং পেপারের মত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে শুকিয়ে হাঁ করে আছে। আপনাকে আমাদের আখড়ায় আসতে হবে কিন্তু।" মল্ল যুদ্ধ কল্পনা করিয়া বিজয় ইতস্তত: করিতেছে দেখিয়া সৌম্য ঘোষ বলিল "আখড়া নাম দেওয়া হয়েছে আমরা সকলে ভাব নিয়ে কসরৎ করি বলে। ভাব আর রস নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, তাকে ধাক্কা মেরে, গুঁতিয়ে, খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয়। বিদ্রোহী প্রাণ অশ্বতরের মত ডাইনে টানলে বাঁয়ে যায়। আদর করলে লাথি ছোড়ে। সামান্য পরিশ্রমের কথা। মাল মশলা দিয়ে কাজ। সাহিত্য চর্চ্চা এত সহজ নয়। আখড়া বড় ভাল জায়গা, একবার এলে বারে বারে আসবেন।" চা আসিল। সঙ্গে গরম গরম সিঙ্গাড়া, কচুরী ও ছানার মুড়কি। কসরতকারী কবি ভোজনে আখড়ার নাম রক্ষা করিলেন। চার পেয়ালা চা, ডজন খানেক সিঙ্গাড়া কচুরী ও দুই কুড়ি ছানার মুড়কি উদরস্থ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শনিবার রবিবার খুব জোর আড্ডা জমে। ঐদিনই আসবেন, কিছু লেখা থাকে ত সঙ্গে নিয়ে আসবেন ; সকলে শুনতে চাইবে।"

"আমি সত্যি সত্যিই লিখিনা। আপনি আমায় ভুল বুঝে যেন কাউকে বলবেন না যে আমি লিখতে পারি।"

"না তা পারবেন কেন ? সরসী দত্ত আপনাকে লাঠিখেলা শেখাবার জন্যে কলিকাতা ছেড়ে বনগাঁয়ে গিয়ে দশমাস কাটিয়ে দিলেন। আচ্ছা যখন সুবিধা হবে তখন পড়বেন ; উপস্থিত আখড়ায় আসতে আরম্ভ করুন, ক্রমশঃ সব হবে।"

বিজয় হ্যাঁ না কিছু বলিবার পুর্ব্বেই সৌম্য ঘোষ হঠাৎ চীৎকার

করিয়া উঠিল, "আরে সর্ব্বনাশ টিউশনির দেরী হয়ে গেলু। চলি আজকে নয়তো ছাত্রের বাপ এমন হিসেবী যে হয়তো আধঘণ্টার বেতন কেটে নেবে। আখড়ার চিঠি আসবে এখন। ঠিক মনে করে যাবেন। কবিতার খাতাটা ভুলবেন না।" বিজয় পুনর্ব্বার তাহার সাহিত্যে অনাসক্তি জ্ঞাপন করিতে যাইতেছিল; কিন্তু সৌম্য ঘোষ তীরবেগে বাহির হইয়া গেল। চাকর আসিয়া চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

(৫)

রজনীর অন্ধকার রাস্তার আলোর সহিত সংগ্রাম করিয়া পুরাপুরি জয়লাভে অসমর্থ হইয়া আধাআধি রফা করিয়া কোন প্রকারে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। পথে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিতেই মানব সমাজের পতঙ্গকুল সাজ সজ্জা করিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিল। আফিস মহলের গাড়ী ঘোড়ার ভীড় চুকিয়া গিয়া আনন্দান্বেষীর ভীড় স্থরু হইল। রাত্রি জীবনের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। এসময়ের সকল কিছুই দিবাভাগ হইতে পৃথক। বেশভূষা যানবাহন, ফেরীওয়ালা, ভিখারী, সন্ন্যাসী, জুয়াচোর, পাহারাওয়ালা, সকলেরই বিশেষ নৈশ সংস্করণ আছে। গায়ক রাত্রের স্থর ভাঁজিতে লাগিলেন, বাদক রাত্রের বাস্থ বাদনে মনোনিবেশ করিলেন, রাত্রের ঝগড়া কান্না, হাসি, আলাপ প্রলাপ বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া নৈশ আসরে অবতীর্ণ হইল। বিজয় বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আখড়া!" তৎপরে সে একখানা বই পাড়িয়া পড়িতে বসিল। সহবাসী জমিদার পুত্র ঘরের সামনে দিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, "লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে, ট্যাক্সি

ড্রাইভে থাইবে সুখে।" তাঁহার দেহে ভবিষ্যৎ পরিণতির ছায়ার মত "ডবল চিন" ও ভুঁড়ির পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়াছে। মনের ভিতরটাও বনিয়াদী আবেগে ভরপুর। বয়স অল্প। অভিজ্ঞতা অসীম।

বিজয় পড়িতে লাগিল কিন্তু মন তাহার এলোমেলো ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বদেশী কাপড় ও বিদেশী অপর সরঞ্জাম। হাতে বিলিতি ঘড়ি বাঁধলে মুক্তির পথে বাধা পড়ে না কিন্তু বিলিতি কাপড়ের সার্ট পরিলেই মুস্কিল বাধিয়া যায়। কবিতা লেখা আর কুস্তি লড়া একই রকম জিনিস, কেননা কাব্যের জন্য ভাব ও ভাষাকে উল্টাইয়া, মুচড়াইয়া, আছড়াইয়া বাগে আনিতে হয়। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারের অসংখ্য মাল মশলা হইতে বাছিয়া বাছিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাব্যের থালিকায় সযত্নে সাজাইতে হয়। কোনটা হাতের সামনেই পাওয়া যায় কোনটা বা বহু পরিশ্রম করিয়া লক্ষ মণ আবর্জ্জনার স্তূপ ঘাঁটিয়া উদ্ধার করিতে হয়। খনি হইতে হীরকখণ্ড বাহির করা; ডুবুরী নামাইয়া মুক্তা অন্বেষণ, পর্ব্বত শিখরে ঔষধি সন্ধান যেরূপ যুদ্ধের সামিল, কাব্য চর্চ্চাও প্রায় সেইরূপ। এই জন্য নাম হইয়াছে "আখড়া"।

বিজয় নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল তাহা জানিতেও পারিল না। স্বপ্ন দেখিল সে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একাকী ভ্রমণ করিতেছে। চিড়িয়াখানাতে জন মনুষ্য নাই। শুধু জানোয়ারের ডাক ও বাতাসের গর্জ্জন। গাছগুলা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হাওয়ার দোলে ডালপালা সব হাত বাড়াইয়া বিজয়কে ধরিতে আসিতেছে। সে বহুকষ্টে তাহাদের হাত এড়াইয়া চলিয়াছে। একটা বটগাছ তাহাকে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বকিয়া উঠিল। কি বলিল তাহা বুঝা গেল না, কিন্তু খুবই তীব্র ও ঝাঁঝাল রকম কথা।

বিজয় ভাবিল পলাই ; কিন্তু ফিরিতেই কে যেন অদৃশ্য হস্তে তাহাকে আবার সম্মুখ দিকে ঘুরাইয়া দিল। সে ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল। নব দূর্ব্বাদলের উপর পা ফেলিতেই সেগুলি কাঁটা হইয়া পায়ে ফুটিয়া যায়, গাছের ঝরা পাতা উড়িয়া আসিয়া মুখের উপর লাগে সবেগ চপেটাঘাতের মত। একটা চড়ুই পাখী উড়িয়া আসিতে আসিতে ক্রমশঃ আকৃতিতে বিরাট হইতে আরও বিরাট হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ এই রাক্ষুসে চড়ুইটা বিজয়কে ছোঁ মারিয়া ধরিতে আসিল। বিজয় দৌড়িয়া একটা রঙ্গন গাছের আড়ালে আশ্রয় লইতেই রঙ্গনের ফুলগুলি নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটিয়া তাহার অঙ্গে বিঁধিতে লাগিল। সে আবার দৌড় দিল। রাস্তার মোড় ফিরিতেই দেখিল একটা বড় রকম সভা-স্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! সব জীব জন্তুগুলা খাঁচা হইতে বাহির হইয়া মিটিং করিতেছে! বিজয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কেহ তাহার দিকে দৃকপাত করিল না।

সভাপতি হস্তীমূর্খ। সে বলিল, "আমরা সকলে মুক্তি চাই। মানুষের শাসন মানিব না। কখনও না।" দুইটা ওরাং ওটাং হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিয়া নাচিয়া ঘুরিতে লাগিল, "মুক্তি চাই ; আমরা সবাই মুক্তি চাই।" জিরাফ গলা উঁচু করিয়া বলিল, "সাবাস, বেশ ভাই!"

গণ্ডার সকলকে গুঁতাইয়া সভাপতির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "গুঁতাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইব।" হনুমান বলিয়া উঠিল "তার চেয়ে লাফ দিয়ে দেয়াল পার হয়ে চলনা?" একটা বৃহদাকার ছুঁচার মত জানোয়ার বলিল, "সুড়ঙ্গ কাটিয়া বাহির হইবে চল।"

খুবই মতদ্বৈধ। বাঘ বলে, "রক্ষীদের খাইয়া ফেল," বার্বারী ছাগল বলিল, "ঢুঁ মারিয়া শেষ কর।" হুকু বাঁদর পরামর্শ দিল "এমন চীৎকার সুরু কর যে সকলে ছাড়িয়া দিতে পথ পাইবে না।" একটা কুকুর বলিয়া উঠিল, "তোমরা সব খাঁচায় বন্ধ থাক, কিন্তু আমিও ত জানোয়ার, আমি কেমন আরামে আছি দেখ। ল্যাজ নাড়তে শেখ, গলায় কলার পর, সব ঠিক হয়ে যাবে।" সকলে তাহাকে মারিতে উঠিলে, সে পলায়ন করিল।

জলহস্তী এতক্ষণ কিছু বলে নাই। সে হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "মুক্তি যে চাইব, মুক্তি পাইলে যথেষ্ট জল ও পাঁক পাইব ত! আর যথাসময়ে খাবার? তার ব্যবস্থা আছে ত?"

ভল্লুক জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "নিজে খুঁজে নিতে হবে বাবা, 'সেল্‌ফ হেল্প' বুঝেছ?" তাহার মুখটা হঠাৎ হরেন বাবুর মত হইয়া গেল।"

অজগর সাপটা ঘুমাইতে ছিল। সে এতক্ষণে জাগিয়া প্রশ্ন করিল, "এত চীৎকার করছ সকলে মুক্তি কি জিনিষ? গিলিয়া খাওয়া যাবে ত?"

নেকড়ে উত্তর দিল, "মুক্তি মানে খাঁচাব বাইরে অবাধে ঘুরে বেড়ান।"

অজগর বলিল, "তাবপর?"

"তারপর আবার কি?"

"তারপর কিছু না থাকলে শুধু ঘুরবার জন্যে কে মুক্তি চায়?"

হস্তী এইবার বাধা দিয়া বলিল, "সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমাদের এই যে মুক্তি নেই এর জন্যে দায়ী মানুষ।"

শৃগাল তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মানুষ ত নিজেও খাঁচায় থাকে। আমি দেখেছি, হাজার হাজার খাঁচা; ইটের, পাথরের, কাঠের, কাঁচের।"

সিংহ চীৎকার করিয়া বলিল, "কিন্তু মানুষ কাপড় পরে।"

সকলে বলিল, "ছিঁড়ে দাও! ছিঁড়ে দাও।"

হঠাৎ যেন সকলের দৃষ্টি বিজয়ের উপর পড়িল। কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ যে! সার্ট পরে এসেছে।"

সকলে বলিল, "ছিঁড়ে দাও! সার্ট ছিঁড়ে দাও!"

বাঁধ ভাঙ্গা জলস্রোতের মতই সে পশুবাহিনী হুড়মুড় করিয়া বিজয়ের দিকে ছুটিল। সে "বাবারে!" বলিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া দৌড় দিল। পিছনে সহস্র সহস্র হুকুর ডাক, সম্মুখে গাছগুলা শিকড় আগাইয়া দিয়া তাহাকে হোঁচট খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, উপর হইতে শাণিত নখ চঞ্চু পাখীর ঝাড় ছো মারিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। প্রাণ যায় যায়।

ধড়মড় করিয়া বিজয় জাগিয়া উঠিল। ঘামে তাহার জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে।

চাকরটা চীৎকার করিতেছে, "বাবু, উঠুন, আজ কি খাওয়া দাওয়া হবেনা?"

হাতে মুখে জল দিয়া বিজয় ভোজন কক্ষে গমন করিল।

খাওয়ার ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল। মুগের ডাল ও লুচি, আলুর দম, মাছ ভাজা ও পাঁঠার ঝোল। এতদ্ব্যতীত চাটনি, দধি ও তৎসঙ্গে একটি করিয়া সন্দেশ।

একজন শীর্ণকায় যুবক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল, "এত

খাওয়া কখন ভাল নয়। হেনরী ফোর্ড একটা বিস্কুট আর এক গেলাস জল খেয়ে এক বেলায় পাঁচশ মোটর গাড়ী তৈরী করে বাজারে বের করে দেয়; আর তোমরা খালি হাঁসের মত গিলে চলেছ!"

অপর এক যুবক এককালীন দুখানা লুচি আলুর দম সহযোগে মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া জড়িতভাবে বলিল, "আরে বাবা, তোর ডিসপেপসিয়া আছে বলে আমরা খাবনা? আর হেনরী ফোর্ডের আর কোন গুণ বুদ্ধি দেখলি না শুধু একখানা বিস্কুট খায় তাই হিসেব করে রেখেছিস? পুরাপেট খেয়ে হজম করতে পারলে ঐ ফোর্ডই এক বেলায় এক হাজার মোটর গাড়ী, আর সেই সঙ্গে দেড় হাজার এরোপ্লেন বাজারে ছাড়ত। বুঝলি? আগে খেয়ে হজম করতে শেখ, পরে উপদেশ দিস্।"

প্রথম বক্তা না দমিয়া বলিল, "তোর মত চাষাড়ে পেটুকগুলোর জন্যে এ দেশের কখন কোন উন্নতি হবেনা। তোর অর্দ্ধেক খায় অথচ তোর থেকে ডবল জোর আছে এমন পঞ্চাশটা লোক আমি বের করে দেব।"

"আর তোর থেকে চারগুণ খেয়ে হজম করে অথচ তোর দশ ভাগের এক ভাগও কথা বলেনা এমন লোক আমি পাঁচশ দেখিয়ে দেব।"

জমিদার পুত্র শান্তি স্থাপনার্থে বলিলেন, "থামনা বাবা! এখন খেয়ে নাও, পরে তর্ক ক'রে ঠিক করে নিও সত্যি মিথ্যে। 'দেশেত শতকরা নিরাব্বইটা লোক খেতেই পায় না; তা দুচার জন বেশী না খেলে 'অ্যাভারেজ' খারাপ হয়ে যাবে।"

কোনে একটি চশমা আঁটা ছেলে বাঁ হাতে ধরিয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছিল ও ডান হাতে খাবার তুলিয়া অন্ধভাবে কখন নাকে কখন মুখে গুঁজিতেছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "যারা খেতে পায় না, তাদের জন্যে দুঃখ হয় না একটুও? লক্ষ কোটি দরিদ্রের বুকের উপর

চড়াও হয়ে রাবড়ি মেরে উজাড় করছ ; লজ্জা করেনা ? এর শাস্তি পাবে একদিন! সুদ শুদ্ধ রক্তে শোধ করতে হবে। একদিন রজনীর অন্ধকার ভেদ করে শাণিত ছুরিকার মত চাঁদ উঠে আসবে। সেদিন ভোরের আগে চাঁদের মরা আলোয় তোমাদের সকলের মৃতদেহ শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে। আর যাদের সহস্র যুগ ধরে নিপীড়ন করেছ, শুষেছ, ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে পশুর মত অবস্থায় খাটিয়ে খাটিয়ে হাতের, পিঠের চামড়া তুলে দিয়েছ, তারা সেদিন তোমাদের বুকের রক্তে স্নান করে উৎপীড়িত পূর্ব্বপুরুষদের তর্পণ করবে।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লুচি, আলুর দম, মৎস্য প্রভৃতি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া এঁটো হাতে নিজের কেশ নিজেই আকর্ষণ করিতে লাগিল।

একজন বলিল, "আবার ক্ষেপেছে রে! যা না বাবা, মাথায় লেনীন-নারায়ণ তেল দিয়ে চৌবাচ্চায় একটা ডুব দিয়ে আয়! আর ত পারি না। সেদিন বললি পেট চিরে সব পোলাও বের করে নিবি ; আজ আবার নাটকের ভাষায় গালাগালি! তুই কাল থেকে ঘরে বসে আধপো করে ছাতু খাস এখন। আমরা ত পাপাত্মা, আমাদের সঙ্গে নাই খেলি।"

দরিদ্রগত প্রাণ যুবক দাঁত কড়মড় করিতে করিতে খান দুই লুচি মুখে ভরিয়া দিয়া, মাছ ভাজাটা হাতে তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল "ওর কি কোন অসুখ আছে না কি ?" "ও হল আমাদের 'অবলং' টেবিলের স্যর গ্যালাহাড। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়। ওকে ভগবান জানিয়েছেন যে তাঁর আসতে একটু বিলম্ব আছে ; যেন আগে থেকে একটু 'গ্রাউণ্ড প্রিপেয়ার' করে রাখে।"

বিজয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না। এরা সব থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারের ছেলে। কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভোজনান্তে সকলে নানান দিকে চলিল। কেহ একটা সিগারেট ধরাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। কেহ বা বন্ধুদিগের সহিত রসালাপে জমিয়া গেল। বিজয় কাহাকেও ভাল করিয়া এখন চিনে নাই। সে নিজের ঘরে গিয়া একটা পুরাতন মাসিক পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। হঠাৎ দেখিল একটা ছোট কবিতা ও তাহার লেখকের নামের জায়গায় লেখা "সরসী দত্ত"। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। সরসী দত্ত কবিতার নাম দিয়াছে—"আমার কবর।"

"মরিব মরিব বলে মরিয়াছি আমি।
দুর্গম অরণ্য পারে, যেথা কেউ দেখিবে না
যুগান্তরের ঝরাপাতা; শ্যাওলা তারার ধূলি
ধীরে ধীরে রচিবে কবর মোর।
ভূত হয়ে বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া দেখিব আমি
পচা ধসা দেহটাকে চরম ঘৃণায়।
এই আমি, এ-মোর কবর,
গলিত দুর্গন্ধময় অসংখ্য কীটের বাসা!
শুষ্ক মাটি, বোবা গাছ, উই ঢিপি
এরাই হইবে সাক্ষী এই দুর্গতির।
তার পর একদিন ঘটনার তালে
উদ্দাম শুকর পাল ছুটিয়া চলিবে বনপথে
ভেঙ্গে দিয়ে যাবে পদাঘাতে ॥"

(৬)

কার্জ্জন কলেজের প্রফেসারদের মধ্যে অনেকেই স্বনাম ধন্য পুরুষ। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাদের খ্যাতি আছে। কেহ বিশ, কেহ ত্রিশ বৎসর কাল ইতিহাস দর্শন বা রসায়নের চর্চ্চা করিয়া দুই চার খানা করিয়া 'নোট' রচনা করিয়া ভারতের জ্ঞানের ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। বিদেশীয় গুরুদের বহু সাধনালব্ধ জ্ঞানের এরূপ উৎকৃষ্ট হিসাব নিকাশ খুব অল্প দেশেই হইয়াছে। মার্চ্চেন্ট অফিসে যেরূপ উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সাগর বক্ষ বাহিয়া সহস্র সহস্র বিদেশীরা এ দেশের মাল ওদেশে এবং ওদেশের মাল এদেশে আমদানী রপ্তানী করিলে পর কেরাণীরা সেই সকল দ্রব্য সম্পদের চুলচেরা হিসাব রাখিয়া "স্টক" ও চালান লিখিয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে হাত লাগাইবার গৌরবের অধিকারী হয়েন; কার্জ্জন ও ভারতের বহু অপর কলেজের অধ্যাপকরাও এরূপ জ্ঞান সমুদ্র মন্থনের "স্টক টেকার" বা হিসাব লেখকরূপে বিত্থার গৌরবে গরীয়ান। একই মনোভাবের দ্বিবিধ অভিব্যক্তি। কেরাণীরা চাষ অথবা কারখানার কাজ না করিয়া এবং বাণিজ্যের বাস্তব প্রগতির কোন ভার স্কন্ধে না লইয়া শুধু হিসাব লিখিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন। অধ্যাপকেরাও অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের কূলে বসিয়া সহস্র নাবিক ও পর্য্যটকের আবিষ্কার কাহিনী লিপিবদ্ধ ও প্রচার করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা সম্পূর্ণ করেন। মার্চ্চেন্ট অফিসের কেরাণীর মুখে যেমন অহরহ হ্যারীস সায়েব মেরীট সায়েব, ক্যাপ্টেন ওয়াটস, লণ্ডন, বার্লিন ও জেনোয়া শোনা যায়; কলেজের অধ্যাপকেরাও প্রায় তেমনিই ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কাণ্ট, হেগেল, নিউটন, বেশেমার, অ্যাডাম স্মিথ, ম্যাসপেরো, আইনস্টাইন, অক্সফোর্ড, হাইডেলবার্গ ও সরবোন আওড়াইয়া নিজেদের ও ছাত্রদের

জীবন সার্থক করেন। এই জ্ঞানের কেরাণীগিরির ফলে ভারতীয় কলেজ মহলে ছাত্রদের মধ্যে অজানার সীমাহীন সাগরে দুঃসাহসের আবেগে বাহির হইয়া পড়িয়া নূতন কিছু জানিয়া ফেলিবার স্পৃহা নাই বলিলেই চলে। ছাত্রেরা বিভিন্ন তথ্যের "ক্যাটালগ" মুখস্থ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করে। এ সন্দেহ তাহাদের কখনও হয় না যে ইহার বাহিরেও আর কিছু আছে বা থাকিলে তাহার অনুসন্ধানের ভার ছাত্রমণ্ডলীর কিছুটা বহন করা কর্ত্তব্য। "রিসার্চ্চ" নামক এক প্রকার নূতন বিদ্যা অর্জ্জন প্রণালী কিছুকাল হইল চালু হইয়াছে কিন্তু তাহাও বিশেষ সাবধানতার সহিত যথাসম্ভব স্বাদ গন্ধ বর্ণ গুরুত্ব ও স্থিতি বর্জ্জিত ভাবে পরিবেশন করা হয়।

কলেজে বিজয় ও তাহার সহপাঠিরা কি পড়িত, কি লিখিত, কি শুনিত তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক; কেননা সকল ভেজাল বিহীন বিশুদ্ধ শিক্ষা পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রাজশক্তির সহিত সর্ব্বত্র প্রচারিত। তাহার ইতর বিশেষ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদণ্ডের প্রবল প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইয়া খাইয়া বর্ত্তমানে বাঘ ও গরুর মধ্যে প্রায় আর কোন প্রভেদ নাই বলিলে চলে। আসমুদ্র হিমাচল কেন্দ্রীভূত জ্ঞানের স্ফুরণ মাছিমারা কেরাণীতন্ত্রের উচ্চতম আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত। কোন কিছুর নড়চড় হইবার উপায় নাই। বেখাপ্পা রকম কিছু চিন্তা করিয়া বসিবার জোটি নাই। মনের খোরাক পুরাপুরী বিশুদ্ধ; কোন প্রকার চিন্তার দ্বারা স্পর্শিত নহে। সুতরাং ছাত্রদিগের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জ্ঞানের রাজ্যে বিকশিত হইবার পথ না পাইয়া সিনেমার নট, নটী; রাষ্ট্রীয় ঝগড়াঝাঁটি; পরচর্চ্চা ও ছোট বড় দলাদলির ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করে। ফলে ভারতের ছাত্র

মণ্ডলীর মধ্যে যুবাজনোচিত উদ্দামতার পরিবর্ত্তে পরিণত বয়স্কের চক্রান্ত প্রিয়তা ও দলাদলির স্পৃহাই অধিক লক্ষিত হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্র যদি তাহাদিগের জন্য পাঠ্য পুস্তকের দেয়াল দিয়া ঘেরা না হইয়া অনন্ত প্রসারিত হইত; মন তাহা হইলে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিত না। দুনিয়ার মাঠ, জঙ্গল, পাহাড়, নদী ও সমুদ্র তটে এই সকল মুক্ত হাওয়ার জীবগণ তাহা হইলে আনন্দে বিচরণ করিত। ঝড় বাদলে গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিয়া বাহির হইত, জ্যোৎস্না উঠিলে গলা ছাড়িয়া গান ধরিত, ক্রোধে মারামারি করিয়া রক্তপাত করিত ও আনন্দে দিশাহারা হইয়া উন্মত্তের মত ব্যবহার করিত। কিন্তু সূত্রগত চিন্তার ধারায় মানুষ হইয়া ইহারা জীবনের সকল আবেগ কৃত্রিমতার পথে লইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মুখ দেখাদেখি বন্ধ এবং অন্তরের কামনা কেতা মত ছদ্মবেশ ধারণ না করিয়া কখন বাহিরে দেখা দেয় না।

সুদর্শন বোস অকারণে দাম্ভিক। তাহার কথাবার্ত্তা কি ছাত্র কি শিক্ষক সকলের সহিত সতত উদ্ধত। একদিন ক্লাশে প্রফেসরের সহিত কি বাক বিতণ্ডা করায় তাহাকে প্রফেসর ক্লাশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সে প্রতিহিংসার জন্য ব্যগ্র হইয়া কয়েকদিন ধরিয়া দুই চার জন করিয়া ছেলেদের লইয়া জটলা করিতে লাগিল। একদিন বিজয় ও আর একটি ছেলেকে ধরিয়া বলিল, প্রফেসর নরেন গুহকে জব্দ করিতে হইবে। ও লোক মোটেই ভাল নয়। ছাত্রদের সম্মান রাখেনা আর অপমান করে।"

বিজয় বলিল, "কই না! আমরা ত দেখি বেশ ভদ্রলোক। অপমান আবার কাকে করল?

"হ্যাঁ বরাবর যা তা বলে। আমায় বলেছে আরও কত লোককে বলেছে।"

"তা যদি বলেই থাকে ত হাজার হোক প্রফেসর ত। তার জন্যে তাকে জব্দ করার কথা ওঠে না।"

"তোমরা কাপুরুষ, তোমাদের অপমানে ঘা লাগে না? আমার রক্ত টকবক করে ফুটতে থাকে। ওকে শিক্ষা দিতে হবে।" "কি রকম শিক্ষাটা দেবে!"

"এই প্রথমে রব তুলব যে ও কোন কথায় দেশের অবমাননা করেছে। ধর যেমন বলা যাবে নরেন বাবু বলেছেন ভারতবর্ষের লোক সব অসভ্য, কি মিথ্যাবাদী কি ঐ রকম কিছু। অমনি সকলে হৈ চৈ করে ওকে মাপ চাইতে বলা হবে। ও চাইবে না নিশ্চয়। তখন ধর্ম্মঘট করে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। পরে এই নিয়ে ওর চাকরী যাবে দেখবে।" কথাটা শুনিয়া বিজয় হতভম্ব হইয়া গেল। এরূপ করিয়া নির্ল্লজভাবে যে কেহ এত বড় একটা মিথ্যার অবতারণা করিতে পারে ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে বলিল, "কিন্তু বলবে যে, কথা গুলো যে সবই মিথ্যে।

"যুদ্ধে সত্য মিথ্যা নেই। 'অল্‌স্ ফেয়ার ইন লভ এণ্ড ওয়ার' বুঝলে? ও আমাদের শত্রু, ওকে নিপাত করা দরকার। এখন যে উপায়ে সহজে মারা যাবে সেই উপায়ই অবলম্বন করতে হবে।"

বিজয়ের সঙ্গের ছেলেটি বলিল, "তোমার মত জুয়াচোরের সঙ্গে আমরা কোন কথায় থাকতে চাই না।"

সুদর্শন গাঁক গাঁক করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "সাবধান, মুখ সামলে কথা ব'লো। জানো আমি কে?"

"হ্যাঁ জানি, কলকাতার চ্যাম্পিয়ান 'লায়ার' ও নির্লজ্জ বেহায়া।"

সুদর্শনের সাহসটা প্রধানত বাক্যে ও চক্রান্তেই নিবদ্ধ থাকায় সে রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে সেস্থান ত্যাগ করিল। যাইবার সময় তর্জ্জন করিয়া শাসাইয়া গেল, "টের পাবে এখন। মুখ একেবারে বন্ধ করে দেব।"

বিজয় ও তাহার সহচর অবাক হইয়া কিছুক্ষণ সে স্থলে দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে ঘণ্টা পড়াতে ক্লাশে চলিয়া গেল। সুদর্শন বোস কিন্তু সময় নষ্ট না করিয়া নিজ কার্য্যে পুরাদমে লাগিয়া গেল। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ছেলেদের মধ্যে অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিল যে প্রফেসর গুহ ভারতীয় জাতির অপমানসূচক কথা বলিয়া থাকেন। কাহাকে বলিয়াছেন বা কবে কোথায় বলিয়াছেন এ প্রশ্ন কেহ করিত না। তবে এটা প্রমাণ হইয়া গেল যে তিনি লোক বড়ই খারাপ ও শিক্ষক হওয়ার অনুপযুক্ত। এই মিথ্যা প্রচার করিবার মূলে যে সে আবার সময় মত ন্যাকা সাজিয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিত, "হ্যাঁ হে প্রফেসর নরেন গুহ নাকি বলেছে সারা ভারতবর্ষ খুঁজলে একটা ভদ্রলোক পাওয়া যাবে না।"

তাহারা উত্তর দিত, "কি জানি ভাই, বলে ত সকলে।"

তারপর একদিন কলেজ শেষ হইলে পর ছাত্রদের মধ্যে খুব হৈ চৈ করিয়া কাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওকে বের করে না দিলে আমরা এ কলেজে পড়ব না।" অপর অনেকে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়, ঠিক কথা! বের করে তবে ছাড়া হবে।"

অন্যান্য ছাত্রেরা গোলযোগ শুনিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

"কি হয়েছে কি ব্যাপার" প্রভৃতি প্রশ্নে কলেজের আঙ্গিনা মুখরিত হইয়া উঠিল। সুদর্শনের সুশিক্ষিত চরেরা তখন বলিতে আরম্ভ করিল যে প্রফেসর গুহ দেশের অবমাননা করিতে পাইলে আর কিছু চান না এবং তাঁহাকে কলেজ হইতে বিতাড়িত না করিলে এ কলেজে কোন ভদ্র সন্তান আর পড়িবে না। একটা সকলের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত অবিলম্বে করা দরকার এবং দরখাস্তের ঠিক মত বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ কলেজে আসিবে না।

সুদর্শন দূরে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার সস্মিত বদনে দেখিতে লাগিল। তাহার মুখ অপরূপ বিজয় গর্ব্বে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দুই একজন ছাত্র বলিবার চেষ্টা করিল এ সব মিথ্যা কথা; কিন্তু অমনি সুদর্শনের চরেরা তাহাদের চীৎকার করিয়া থামাইয়া দিল, "ফুল, তোমরা কিছু জান না! লোকটা 'ট্রেটর' আর শয়তান।"

ভারতবাসীদের কোন ঋষি কবে শিখাইয়া গিয়াছেন যে শব্দ ব্রহ্ম। তাহারা আওয়াজে খুব বিশ্বাস করে। অতি বড় মিথ্যা ও অসম্ভব কথাও যদি যথেষ্ট সোরগোল করিয়া বলা যায় ত অধিক লোকেই তাহা মানিয়া লয়। মনে মনে যদি বা না মানে ত বাহিরে সে কথা প্রকাশ না করিয়া সায় দিয়া চলে। এই সুবিধা থাকায় এদেশে চক্রান্তকারী মিথ্যাবাদী নিন্দুকদিগের স্বার্থসিদ্ধি সহজেই হয়। সুদর্শনও অল্প বয়সেই এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পরিবারের কেহ কেহ এই জাতীয় কার্য্যে অপরক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্য দেখাইয়া নাম কিনিয়াছেন এবং সে শিক্ষা সুদর্শনের নিকট বিফল হয় নাই। কার্জ্জন কলেজে দুই চার দিনের মধ্যেই প্রায় দুইশত ছাত্রের

সহি করা এক দরখাস্ত প্রস্তুত হইয়া গেল। অতঃপর তাহা প্রিন্সিপালের নিকট পাঠান হইল।

প্রিন্সিপাল প্রথমত এই দরখাস্ত পাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। নরেন গুহ উন্নতমনা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া সহকর্ম্মী মহলে পরিচিত। তাঁহার নামে এ অপবাদ কখন সত্য হইতে পারে না। তাহা ছাড়া তিনি অবান্তর কথা কখনও বলেন না বলিলেই চলে। তিনি হঠাৎ ক্লাশের পড়া ছাড়িয়া ভারতবর্ষের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিবেন ইহাও সম্ভব নহে। যাহা হউক প্রিন্সিপাল মহাশয় দরখাস্তটি সম্মুখে রাখিয়া প্রফেসর গুহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নরেন গুহ আসিলে পর প্রিন্সিপাল বলিলেন, "প্রফেসর গুহ; এই চিঠিখানা দেখুন। আমি ত এর কোন অর্থই করতে পারছি না। আপনি কিছু বলতে পারেন?" গুহ মহাশয় দরখাস্তখানা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যত পড়িয়া চলিলেন মুখ তাঁহার ক্রোধে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে তিনি ঘন ঘন শ্বাস লইতে লইতে বলিলেন "এত বড় মিথ্যা আমি জীবনে কখন দেখি নাই। এ সব ছেলেরা 'ক্রিমিনালস্'।" প্রিন্সিপাল নিরুত্তর। তিনি অবশেষে বলিলেন, "কি উত্তর দেওয়া যায়?" নরেন গুহ বলিলেন, "সব কটাকে 'রাষ্টিকেট' করে দিন! 'টিস্যু অফ লাইজ"। সুদর্শন ও তাহার ষড়যন্ত্রকারী বন্ধুগণ 'কমনরুমে' বসিয়া জল্পনা করিতে ছিল যে প্রিন্সিপাল দরখাস্ত প্রত্যাখান করিলে ধর্ম্মঘট কি ভাবে চালান হইবে। ইতিমধ্যে একজন বোকা ধরণের ছেলে, যাহাকে দিয়া দরখাস্তখানা পাঠান হইয়াছিল, সে কাগজটা হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল। দরখাস্তের উপর বড় বড় করিয়া লেখা, যে, প্রিন্সিপাল বহু দুঃখের সহিত জানাইতেছেন

যে তিনি এ দরখাস্তগত নালিশ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন। তিনি এই মিথ্যা নালিশের জন্য ছেলেদের কিছু শাস্তি দিবেন না; কিন্তু স্বাক্ষরকারীগণের কর্ত্তব্য প্রফেসর গুহের নিকট ক্ষমা চাওয়া।

সুদর্শন বিকট চীৎকার করিয়া কমনরুমের টেবিলের উপর লাফাইয়া উঠিল, "অপমানের উপর অপমান! প্রথমে জুতা মেরে আবার ক্ষমা চাইতে বলা! আমরা কাল থেকে কলেজে আসব না। পিকেটের ব্যবস্থা কর। জেগে ওঠ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে নিজের অপমান, সকলের অপমান, দেশের অপমান হজম করে যেওনা।"

দলের ছেলেরা, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, ষ্ট্রাইক করো, ভেঙ্গে ফেল" ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দে সুদর্শনের বক্তৃতার সমর্থন করিয়া ষ্ট্রাইক ঘোষণা সম্পূর্ণ করিল।

বিজয় ও কয়েকটি ছাত্র এই সকল ঘটনার সময় কলেজে ছিল না। তাহারা পরদিন যথাসময়ে কলেজে আসিয়া দেখিল গেটের সম্মুখে ভীষণ ভীড়। ছাত্রেরা সকলে দাঁড়াইয়া আছে এবং সম্মুখে জন কুড়ি পঁচিশ ছেলে খুব লাফালাফি করিয়া সকলকে ভিতরে যাইতে বারণ করিতেছে। কয়েকজন ছেলে জোর করিয়া যাইতে চাহিল, তাহাদিগকে ধাক্কা মারিয়া ও ভয় দেখাইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। বিজয়ের সঙ্গী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার?"

"আরে বাবা, নরেন গুহ নাকি ভারতবর্ষের ম্যাপের উপর থুথু ফেলে বলেছে, 'এমন দেশে লাথি মার!' তাই ব্যাটা সুদর্শন বোস হাল্লা করছে। লাথিটা ওকে মারলেই ঠিক করত, তা এখন কি হবে বল?"

বিজয় বলিল, "এ সব মিথ্যে কথা। কয়েক দিন আগে সুদর্শন

আমাদের কাছে এসে এই রকম একটা ফন্দি বাতলায় যে মিথ্যে করে রাষ্ট্র করবে প্রফেসর গুহ দেশের অপমান করেছেন, এই সব। আমরা রাজি না হওয়াতে খুব শাসিয়ে চলে গেল।"

অপর ছাত্র বলিল, "এখন সত্যি মিথ্যে নিয়ে কে মারামারি করবে বল? তুমি যদি এই সব বল ত দাঙ্গা বেধে যাবে।" সত্য অপেক্ষা শান্তি অধিকতর কাম্য, এই বিচার করিয়া সকলে সুদর্শনের চক্রান্ত ফাঁস করিতে নিরস্ত হইল। স্ট্রাইক খুব ঘটার সহিত চলিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টার ক্যামেরা হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাকে সুদর্শন পূর্ব্ব হইতেই আসিতে বলিয়া রাখিয়াছিল। এ সম্পর্কে সুদর্শনের একপ্রকার ভাই হয়। রিপোর্টারকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল ষড়যন্ত্রকারীরা, নিজেদের মিথ্যাগুলি গুছাইয়া বলিয়া গেল। সে দুই একখানা ছবি তুলিয়া চলিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল যখন আসিয়া পৌঁছাইলেন ততক্ষণে কার্জ্জন কলেজের সম্মুখে কয়েকশত ছাত্র ও তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক মুটে, মজুর, বেকার লোক প্রভৃতি এক জোট হইয়া এক বিরাট জনতার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই কৌতূহলে পূর্ণ। এত হাল্লা হুজুগের কারণ কি?

প্রিন্সিপাল গাড়ী হইতে নামিতেই সুদর্শন প্রমুখ একদল নেতৃস্থানীয়, অর্থাৎ আপনি মোড়ল জাতীয়, যুবক অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে ফিরিয়া যাইতে বলিল। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে, "সরে যাও এখান থেকে।" বলিয়া ভীড় অতিক্রম করিয়া কলেজের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহিরের দিকের ছেলেরা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ভিতরের দিকে যাহারা পালের গোদা তাহারা তাঁহার পথ

আগুলিয়া শুইয়া পড়িল। তিনি অগত্যা বহু সন্তর্পণে ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া কলেজের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পিছন হইতে বিকটরবে "শেম, শেম" ধ্বনি উঠিল। তারপর, একে একে পিছনের ছেলেরা বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। শুধু কয়েকজন দর্শক, স্থানীয় ছাত্র ও সুদর্শনের দলের ছেলেরা গেট জুড়িয়া জমা হইয়া রহিল। আরও কয়েকজন রিপোর্টার ঘুরিয়া গেল এবং দুইজন পুলিশ আসিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া খৈনি ঘষিতে লাগিল।

সারাদিন সুদর্শন বোসের দল কলেজের দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিল। কোন ক্লাশে কাহাকেও যাইতে দিলনা। প্রিন্সিপাল একবার বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে তাহারা অন্যায় করিতেছে। প্রফেসর গুহ নিঃসন্দেহ বলিতেছেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি বহুবৎসর দেশের ছাত্র সাধারণের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বহু ছাত্র আজ দেশের নানান কার্য্য ক্ষেত্রে সম্মানের সহিত কাজ করিতেছেন। তাঁহার নামে এ জাতীয় অভিযোগ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু প্রিন্সিপালের কথা অরণ্যে রোদন হইল। কেহ তাহাতে বিচলিত হইল না। দিবাশেষে যখন প্রফেসর গুহ কলেজ ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইবেন তখন হঠাৎ একজন ছেলে দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার গলায় একটা ছেঁড়া জুতার মালা পরাইয়া দিল। প্রবীণ অধ্যাপক এই অপমানে কম্পিত কলেবরে থতমত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষু বাহিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কি একটা বলিতে গিয়া বলিতে পারিলেন না। তীব্র অপমানে হতাশার মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একজন ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে সেখানে এক পার্শ্বে দেয়ালে হেলান দিয়া দেখিতেছিল। এখন অবধি তাহার মুখে একটা নিঃস্পৃহ নিরপেক্ষ তামাসা দেখার ভাবই ছিল। এই জঘন্য নীচ ব্যবহার দেখিয়া সে হঠাৎ যেন নিদ্রা হইতে গা ঝাড়িয়া উঠিল। দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া সে প্রফেসারের গলা হইতে জুতার মালাটা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল এবং বিদ্যুৎগতিতে ঘুরিয়া অপমানকারীর নাকের উপর এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল। সুদর্শন চীৎকার করিয়া উঠিল, "মার, মার!" কিন্তু সেই নবীন যুবকের ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত চেহারা দেখিয়া কেহ অগ্রসর হইল না। যুবক ঘৃণার চক্ষে সকলের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কুকুরের দল! কাছে আসবে কেউ ত কামড়িয়ে টুঁটি ছিঁড়ে দেব!" প্রফেসর গুহকে বলিল, "স্যর আপনি এখান থেকে চলে যান। ঐ জন্তুগুলোর জন্যে ভাববেন না। ওরা নিজের বাবার গলাতেও জুতার মালা পরাতে পারে।"

সুদর্শন আবার ক্ষীণ শাণিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কিল হিম, কিল হিম!" কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে কাহাকেও ব্যাঘ্র শিকারেচ্ছু দেখা গেল না। শাসনকারী যুবক বলিল, "আর দু চারটে মানুষ সঙ্গে থাকত, তা হলে ঐ ছেঁড়া জুতাগুলো তোদের মুখে ভরে দিয়ে তবে যেতাম।" বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। সে কিছুদূর যাইবার পরে দুই একটা দুর্ব্বলহস্ত নিক্ষিপ্ত ইষ্টক তাহার দিকে প্রেরিত হইল, কিন্তু কিছু হইল না। রক্তাক্ত নাসিকা ছাত্র এতক্ষণে উঠিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, "মার খাবার বেলায় আমি, আর বক্তৃতা দেবার বেলায় সুদর্শন বোস!"

সুদর্শন তাহাকে এক তাড়া দিয়া বলিল, "স্টুপিড কোথাকার! চল তোর ছবি তুলে তোকে 'মার্টার' বানিয়ে দিচ্ছি। কাল কাগজে বেরবে, দেখবি। কর্তৃপক্ষের গুণ্ডা দ্বারা আহত...' ইত্যাদি। এখন সুদর্শন বোসকে চেনে নি এরা! গুহটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু, না? ও ছোঁড়াটা কে জানিস? ওকে আচ্ছা করে পেটাতে হবে। ব্যাটা আর্ত্তের বন্ধু শ্রীমধুসূদন! টেরটা পাওয়াব, দাঁড়াও।"

পরদিন প্রাতঃকালে সহরে ঢি ঢি পড়িয়া গেল। কার্জ্জন কলেজে ভারতমাতার অপমান ও গুণ্ডা দিয়া নিরীহ বালকদের মার খাওয়ান প্রভৃতি বড় বড় অক্ষরে কাগজে বাহির হইল। তিনটি ছাত্রের ছবিও মুদ্রিত হইল। একজনের মুখ রক্তাক্ত ও অপর দুইজনের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দেখিয়া ছাত্রদের পিতামাতারা বলিলেন "কলেজে গিয়ে কাজ নেই। এ সব থেমে যাক তারপর যাবে এখন।" ফলে সেদিন আর স্ট্রাইককারী ব্যতীত অপর ছাত্রেরা প্রায় কেহই আসিল না। প্রফেসরদিগের উপর এদিন আর কোন অত্যাচার করিবার চেষ্টা হইল না।

তৃতীয় দিন স্ট্রাইকারগণ গোলদীঘিতে একটা মিটিং করিল। মিটিংয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই সত্যাগ্রহের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিল। সুদর্শন বোস উঠিয়া বলিল, "আমরা মাতৃভূমির অপমানে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এই কাজে নেমেছি। আমরা দোষীর শাস্তি চাই। এ ছাড়া আমাদের আর কোন দাবী নেই।"

একজন স্থূলকায় ব্যক্তি। কুতকুতে চোখ, খাঁদা নাক ও বক্র কুটিল হাসি। আপাদ মস্তক খদ্দরে ঢাকা। তাঁহাকে পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। সভার লোকে শুনিল তিনি ভারতশার্দ্দূল

বেচারাম সান্যাল। কয়েকবার জেলে গিয়াছেন ও দেশের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ইত্যাদি। তিনি ছাত্রদের কিছু বলিবেন।

বাল্যকালে ভারতশার্দ্দুল বেচারাম সান্যালকে পাড়ার লোকেরা হুলো বলিয়া ডাকিত। ইহা তাঁহার পৌরুষের খাতিরে অথবা নিশাচরের ন্যায় গতিবিধির জন্য হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। হুলো স্কুলে সকল পরীক্ষায় যথাসম্ভব অকৃতকার্য্য হইয়া, চায়ের আড্ডায়, বড়লোকের ছেলেদের আমোদপ্রমোদের সখা ও এ দোকানের সেলস-ম্যান এবং ও দোকানের ক্যানভাসার হইয়া অবশেষে এক ফুটবল ক্লাবের বেতনভোগী সেক্রেটারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় স্বদেশীর প্রবল বন্যায়, যখন বহু আগাছা কুগাছা, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের সহিত একত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিতেছিল, হুলোরও একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। সে সর্ব্বত্র নেতাদিগের গা ঘেঁষিয়া মিটিংয়ে বসিত এবং একদিন দৈবক্রমে দুই চারজন স্বনামধন্য লোকের সহিত একই লাঠির আঘাতে জখম হইয়া একই পুলিশ ভ্যানে চড়িয়া লাল-বাজার গমন করিল। তাহার নামটা বড় বড় নেতাদের সহিত অতঃপর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে নানাপ্রকার চাল চালিয়া নিজের স্থানটা কায়েমী করিয়া লইল। এ হেন হুলো ওরফে ভারতশার্দ্দুল অতঃপর ছাত্রদের উপদেশ-দানে ব্রতী হইলেন। "ভাই সব, তোমরা ভারতমাতার উপযুক্ত সন্তান। তোমাদের পিছনে আমরা আছি। ভয় পাইও না, কর্ত্তব্যের পথ হতে বিচলিত হইওনা। এই রকম করিয়াই ছোট হইতে মানুষ বড় হয়। আজ তোমরা একটা ক্ষুদ্র অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছ; কাল

তোমরাই বৃহত্তর সমরক্ষেত্রে সেনাপতিরূপে দেখা দেবে। তোমাদের জয় হউক!”

ঘন ঘন করতালি ধ্বনি, রিপোর্টারদিগের পেন্সিলের ঘর্ষণ ও ক্যামেরার চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দের মধ্যে সভা শেষ হইল। সকলে কলেজের দিকে শোভাযাত্রা করিয়া চলিলেন। বেচারামের নামে পুলিশের সংখ্যা বহুগুণ হইয়া গেল। ভীড় খুবই জমিয়া উঠিল এবং বহু বেকার যুবক স্ট্রাইক কমিটির খরচে জলযোগ করিবার আশায় ছাত্র সাজিয়া কলেজের গেটে জুটিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল সংবাদপত্রে একটা পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি সকল বিষয় খোলসা করিয়া লিখিয়া দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ কাগজেই তাহা বাহির হইল না। বরং একতরফা মন্তব্যে সংবাদপত্র ভরিয়া উঠিল। প্রফেসর নরেন গুহ দেশের শত্রু। তাঁহাকে বিদায় না করিলে কার্জ্জন কলেজ চলিবে না।

নীচে একটি কামরা ও উপরে দুইটি। প্রফেসর নরেন গুহ এ বাসায় তাঁহার মা হারা অনূঢ়া কন্যাকে লইয়া বাস করেন। একতালার ঘরে একটি টেবিল ও খান কত চেয়ার। একটা আলমারিতে অনেক-গুলি মোটা মোটা বহু ব্যবহৃত পুস্তক। অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্প বেতনের কার্য্য বলিয়া গুহ মহাশয়ের অবস্থা কোন সময়েই ভাল যায় নাই। তাহার উপর মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু বৎসর রোগ ভোগ করিয়া গুহপত্নী অভাবের সংসারের অভাব আরও

বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সে ধাক্কা প্রফেসর গুহ আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

সে দিন বৈকালে যখন তিনি গৃহে ফিরিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়াই কন্যা অমিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, তোমার কি হয়েছে? মুখখানা একেবারে শুকন আর কি রকম যেন। অসুখ হয়েছে না কি? জ্বর আসেনি ত?"

কন্যাকে আশ্বাস দিয়া পিতা বলিলেন, "না মা ও কিছু না। আজ বড় পরিশ্রম গিয়েছে তাই একটু ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।"

কন্যা কিন্তু ইহাতে ভুলিবার নয়। সে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রফেসর গুহ দুর্ভাগ্য বশতঃ মিথ্যা কথা বলিতে ভাল জানিতেন না। কথায় কথায় এটা বাহির হইয়া পড়িল যে কলেজে ছেলেরা স্ট্রাইক ও নানা প্রকার হাঙ্গামা করিয়াছে। আসল কথাটা কিন্তু প্রকাশ পাইল না।

পরদিন সকাল হইতেই প্রফেসর গুহর গৃহে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। অধিকাংশই খবর লইতে যে ব্যাপারটা কি? কিন্তু সকলেই খবর বাহির করিবার জন্য চীৎকার করিয়া গুহ মহাশয়ের সহিত প্রতি কথায় সায় দিতে যাইতে লাগিল। "যা বলেছেন!" "ঠিকই ত।" "আপনি কি করবেন।" "ছেলেগুলা সব জাহান্নমে যাবে।" ইত্যাদি কথায় ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। অমিয়া বাহির হইতে আংশিকভাবে এই আলোচনা শুনিয়া বুঝিল যে কলেজের হাঙ্গামার সহিত তাহার পিতা বিশেষভাবে জড়িত। পিতা স্নানের জন্য ভিতরে আসিতেই "বাবা, ওরা তোমায় কি করেছে?" বলিয়া অমিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া একটা বেতের মোড়ার উপর বসাইয়া দিল।

"কি আবার করবে ? কয়েকটা মিথ্যেবাদী বদছেলে আমার নামে অযথা নালিশ করে হাঙ্গামা করছে। ও থেমে যাবে দু দিনে।"

"না, বাবা, ঠিক করে বল ওরা কি করেছে। কি কি গোলমাল করেছে। আমি শুনছিলাম একটু একটু।"

প্রশ্নের চাপে ক্রমশঃ সকল কথা অমিয়ার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল। সে ক্রুদ্ধা সর্পিনীর মত গর্জ্জাইতে লাগিল। "কেউ ওদের কিছু বল্লে না। আমি কাল কলেজে যাই, গিয়ে ওদের আঁচড়ে চোখ উপড়ে নেব! এত বড় আস্পর্দ্ধা! এরা কি মানুষ! আমি ছেলে হতাম ত দু চারটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিতাম!"

নরেনবাবু ব্যস্ত হইয়া, "আহা, মা, তুমি কেন এ রকম করছ! ও সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলিয়া কন্যাকে শান্ত করিতে গেলেন; কিন্তু অমিয়া হঠাৎ মাটিতে শুইয়া পড়িয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। "তুমি আজই ও কাজ ছেড়ে দাও! আমরা না খেয়ে মরব তবু ও রকম কাজ করতে দেবনা। কখন তুমি ও কলেজের দরজা মাড়িও না।"

গুহ মহাশয় বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি জীবনে এমন বিপদে পড়েন নাই। অমিয়ার ক্রন্দনে তাঁহার নিজের শোক অপমান কোথায় নিমেষে উবিয়া গেল, তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না। সে খালি কাঁদে আর বলে "আমরা চল কোন দূর দেশে চলে যাই। আমি ত কিছু লেখাপড়া জানি; আমি তোমায় মাষ্টারী করে খাওয়াব।"

গুহ মহাশয় অগত্যা বলিলেন, "আচ্ছা, চিন্তা করে, বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি; না হয় চাকরী ছেড়ে অন্য কাজের চেষ্টাই দেখব। তুমি এখন থাম ত।"

অমিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "যারা এ রকম অপমান করেছে তাদের উপর প্রতিশোধ নেব। যেমন করে হোক নেব।"

সেদিন অধ্যাপকের আর কলেজে যাওয়া হইল না। সুদর্শন ও তাহার দলের লোকেরা বলিল, "দেখেছ, একদিনের ওষুধেই ফল হয়েছে!"

বেচারাম সান্যাল প্রিন্সিপালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলিলেন, "অবস্থা বড়ই গুরুতর! এতদিনের কলেজটা উঠেই যায় না কি? আপনি এর একটা বিহিত করুন।"

প্রিন্সিপাল বলিলেন, "আমি কি করব? এ নালিশ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এর উপরে আমার শ্রদ্ধার পাত্র পুরাণ সহকর্ম্মী অধ্যাপকের কোন অপমান করতে পারব না। কলেজ উঠে যায় যাক!"

বেচারাম সান্যাল মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "আপনার পাঁঠা···। আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন। এ আন্দোলন ক্রমশঃ বেড়ে চলবে। এখনও সময় থাকতে সামলান, পরে হাতের বাইরে চলে যাবে।"

প্রিন্সিপাল বলিলেন, "আপনার চেষ্টার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ; কিন্তু আমায় এত বড় মিথ্যার কাছে মাথা নীচু করতে বলবেন না। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন কথাটা সত্য কিনা।" বেচারাম সান্যাল বলিলেন, "শতাধিক ছেলে কি মিথ্যা কথা বলছে? আমি বল্লেই বা কে বিশ্বাস করবে?"

"তা যেই বিশ্বাস করুক আর না করুক কথাটা মিথ্যা সন্দেহ নেই। নরেন গুহ অতি সজ্জন, নির্ব্বিবাদী লোক! কোন অন্যায় তিনি কখন করেন নি; কাহারও মনে অযথা কষ্ট দেন নাই। তাঁহার জীবনের

প্রতি মূহুর্ত্তে তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য একপ্রাণ হয়ে নিজের কর্ত্তব্য করে এসেছেন। তাঁর নামে এ দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

"আমি তা হলে উঠি। আমার চেষ্টা আমি করলাম। আপনি নরেন গুহকে 'ডিসমিস' না করতে চান, অন্তত 'সাসপেণ্ড' করুন।"

"সে কথন সম্ভব নয়। আমি তা পারব না।"

বেচারাম সান্যাল বিদায় হইলে প্রিন্সিপাল একখণ্ড কাগজ লইয়া লিখিলেন, "যে সকল ছাত্র আগামীকল্য হইতে বিনা কারণে ক্লাশে আসিবে না তাহাদিগের অসংযত ব্যবহারের জন্য শাস্তি পাইতে হইবে। যে সকল ছাত্র অপর ছাত্রদিগকে কলেজে প্রবেশ করিতে বাধা দিবে তাহাদিগকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে।" তিনি আর একখানা পত্র পুলিশ কমিশনারকে লিখিলেন। কল্য হইতে যেন কলেজের গেটে আরও পুলিশ রাখা হয় এবং কলেজে আগমনেচ্ছু ছাত্র দিগকে যেন কেহ কলেজে প্রবেশ করিতে বাধা না দেয়।

পুলিশের ব্যবস্থা হইল কিন্তু ধর্ম্মঘটকারীরা ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া শাসাইয়া, গিনতি করিয়া কলেজ আগমন হইতে নিরস্ত করিতে লাগিল। ফলে কোন দিন জনা কয়েক ছেলে কলেজে আসিলেও পরদিন আর তাহারা আসিত না। কলেজ একপ্রকার বন্ধই রহিয়া গেল।

বেচারাম সান্যাল একটা সংবাদপত্রে লিখিলেন যে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রিন্সিপালের একগুঁয়েমির জন্য কিছু করা গেল না। ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে কোন অধ্যাপক অতি গর্হিত কিছু করিলেও তাহার প্রতিবাদ করা সম্ভব নহে। এই সকল কলেজ 'বুরোক্রেসির' আওতায় জনমতের তোয়াক্কা রাখে না। বিংশ শতাব্দীতে এপ্রকার জুলুম কেহ বরদাস্ত করিবে না, ইত্যাদি।

প্রিন্সিপাল ইহার প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু তাঁহার কথা লোকে পড়িয়াও পড়িল না। জনমত বড়, না একটা লোকের কথা বড়? এ প্রকারে যাহারা জনমতকে তাচ্ছিল্য করে তাহাদের কথা জনসাধারণ শুনিবে কেন?

* * * * *

সন্ধ্যা তখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখে বহু লোক হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। কোথাও মাড়োয়ারীগণ সান্ধ্যবায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শে ক্ষণিকের জন্য 'তেজী মন্দী' ভুলিয়া সকল প্রকার 'ভাও' বর্জ্জিত রক্তিমাভ আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। কোথাও হিন্দুস্থানীরা সুরের 'সর্ট হ্যাণ্ড' বেয়াড়া বেসুরে সঙ্গীতাকাঙ্ক্ষা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভাটিয়াগণ মাড়োয়ারীর মার্জ্জিত সংস্করণ। তাহারা বাজারদরের সহিত রাষ্ট্রনীতির সমন্বয় রক্ষা করিয়া নিজেদের উভচর আদর্শবাদে জাগ্রত। মান্দ্রাজীরা ব্যাঞ্জনবর্ণ সঙ্কুল বাক্যালাপের মধ্যে মধ্যে ইংরেজীতে 'রাইট ও' অথবা 'নেভার মাইণ্ড' প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া মনের কাঠামোর পাশ্চাত্য ছাঁদটুকু বজায় রাখিতেছে। ফিরিঙ্গীরা নরনারী নির্ব্বিশেষে পরস্পরকে 'ম্যান' বলিয়া সম্বোধন করিয়া অকারণ আনন্দে নাচিয়া কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে। অদূরে শ্বেতমর্ম্মর গঠিত স্থাপত্যের অভিনব নিদর্শন ভিক্টোরীয়া মেমোরিয়াল সৌধ প্রাচ্যের স্তিমিত গোধূলীর আলোকে ছন্দহীন গৌরবে ভাসিয়া রহিয়াছে। আড়ষ্ট, জমাট, নিরেট গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কৌশলের 'আইস্ বার্গ' সদৃশ এই 'মর্ম্মর স্বপ্ন' তাজমহলের সহিত প্রতিযোগিতায় গঠিত হইয়াছিল; শুধু তাজের প্রেরণা ছিল চির বিরহ ও প্রেম আর এক্ষেত্রে ছিল ক্লান্তিহীন দম্ভ।

গঙ্গাবক্ষে জাহাজগুলি মাঝে মাঝে ভোঁ ভোঁ করিয়া ডাক ছাড়িয়া সকলকে জানাইতেছে যে বাণিজ্য .জাগ্রত দেবতা ও তাহার আরতি দিবারাত্রি অখণ্ড সমারোহে চলিতেছে।

এক কোনে একটি বেঞ্চিতে এক বৃদ্ধ ও একটি তরুণী নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। বিজাতীয় আড়ম্বর ও আওয়াজে যেন তাঁহারা কোনমতে ভয়ে ভয়ে মুখ লুকাইয়া বসিয়া আছেন। কেহ যেন হঠাৎ আসিয়া বলিয়া বসিবে, "এখানে তোমরা কোন অধিকারে বসিয়া আছ?" তরুণী মাঝে মাঝে বৃদ্ধের হাতে হাত রাখিয়া আবার সরাইয়া লইতেছেন।

বহুক্ষণ পরে তরুণী বলিলেন, "বাবা, দেরী হয়ে যাচ্ছে। এর পরে ট্রামে ভিড় হতে আরম্ভ হবে; চল বাড়ী যাই।"

"আচ্ছা, মা, চল।"

"কাল কিন্তু তুমি আর কলেজে যেতে পাবে না মনে থাকে যেন। সকালেই প্রিন্সিপালকে একটা চিঠি লিখে দিও যে দোষীদের এ জাতীয় অপমানের শাস্তি যতক্ষণ দেওয়া না হচ্ছে, ততদিন তুমি কলেজে যেতে পারবে না।"

বৃদ্ধ নরেন গুহ উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। কার্য্য ত্যাগ করিলে ভীষণ অভাবের তাড়নায় জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে। না ছাড়িলেও অপমানের আগুনে পুড়িয়া খাক হইতে হইবে। শুধু তাই নহে, কন্যার অপমান বোধটা আরও প্রবল। সে হয়ত কাঁদিয়া কাটিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। "আচ্ছা, মা, কাল সকালে ব্যবস্থা করব।" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দূর হইতে একটি যুবক অধ্যাপক গুহকে দেখিতেছিল। সে এখন

অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক মহাশয় তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এই যে বাবা, তুমি কোথা থেকে এলে? সে দিন তুমি আমার খুব সম্মান রক্ষা করেছিলে, তোমার মত ছেলেরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

"না স্যর, কি বলছেন! আপনি আমার পিতৃ স্থানীয়। আপনাকে চাষার মত অপমান করবে আর তাই দাঁড়িয়ে দেখব একি সম্ভব?"

"আচ্ছা বলতে পার এ ব্যাপারটা কি? আমি ত কোন দেশ বা দেশবাসীর কথাই আলোচনা করি নি, ত এই মিথ্যা অপবাদ রাষ্ট্র করলে কে? আর কেনই বা?"

"স্যর, ঐ সুদর্শন বোস বলে একটা গণ্ডমূর্খ আছে, সেই এর মূলে। আপনি তাকে একদিন বারণ করা সত্ত্বেও ক্রমাগত উঠে উঠে লেকচারে বাধা দিচ্ছিল বলে ক্লাশ থেকে চলে যেতে বলেন। আপনার হয়ত মনে নেই। তার পর থেকেই এই সব শয়তানী মতলব পাকাচ্ছিল। ওর সঙ্গে কতকগুলো ওরই মত মূর্খ আছে; কাজ তাদের ভোট কুড়িয়ে বেড়ান, এরাই সব উৎপাত করে কাউকে কলেজে যেতে দিচ্ছে না।"

অমিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপনারা জোর করে গেলেই পারেন! যখন জানেন যে মিথ্যার উপরে ওদের ষ্ট্রাইক চলছে তখন আপনারা দলবদ্ধ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে যান না কেন? মিথ্যাবাদীদের ভয় করবার কি আছে?"

যুবক অমিয়ার কথার ঝাঁঝে থতমত খাইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "না ভয় আর কি? তবে ওদের বিরুদ্ধে কিছু করলেই ওরা

নানান রকম ইতরামি করে। সেদিন ত দিয়েছিলাম নাকে ঘুষি! কেউ ত সাহস করল না এগোতে। আচ্ছা, দেখুন না দু চার দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।"

অমিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, "কাল থেকেই চেষ্টা করুন; দল বেঁধে চেষ্টা করুন, যাতে এই সব দুষ্টেরা আর আস্কারা না পায়। বলুন, করবেন?"

অধ্যাপক মহাশয় লজ্জা পাইয়া, "আহা, থাক না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে," বলিয়া কন্যাকে নিরস্ত করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু কন্যা তাঁহার কথা না শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সত্যের সৈন্যদল গঠন করুন। এ মিথ্যা ভেঙ্গে দিন।"

যুবক অমিয়ার তেজকম্পিত কণ্ঠস্বর ও নির্ভীক দৃষ্টিতে স্তম্ভিত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ তাই করতে হবে কাল থেকে। আমার ত বেশী বন্ধু বান্ধব নেই; তা যা হোক একটা ছোট মত দল করে ফেলছি দেখুন।"

যুবক নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। অমিয়া পিতার সহিত গৃহ-পথে চলিল। ট্রামে অর্দ্ধপথ আসিবার পর আসিয়া পিতাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বাবা, ছেলেটির নাম কি?"

"ওঃ কে? ঐ ছেলেটি? হ্যাঁ ওর নাম কি যেন হ্যাঁ হ্যাঁ অমর কিশোর না ঐ রকম কি। বেশ ছেলে; খাসা ছেলে।"

ট্রাম চলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল আলোক মালা সজ্জিত দোকান পাট। বিভিন্ন প্রকার গাড়ী ঘোড়াতে রাজপথ ভরিয়া গিয়াছে। পথিকেরা কোন মতে ভীড় বাঁচাইয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়াছেন। অমিয়ার মনে হইতে লাগিল যেন সকলেই সকলের ভয়ে

অস্থির। কি যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে পরস্পরকে বিনাশ করিবার জন্য।

অমর কিশোরের পিতা তাহার যখন মাত্র এক বৎসর বয়স সেই সময় হঠাৎ মারা যান। তাহার মাতা শিশু পুত্রকে লইয়া পিতৃ গৃহেই অতঃপর বাস করেন এবং অমরের দাদামহাশয়ের পুত্র সন্তান না থাকায় দৌহিত্র খুব আদরেই মানুষ হয়। অমরের মাতা কিন্তু পুত্রকে এ আদরের ফলে বিগড়াইয়া যাইতে দেন নাই। তাহার খাওয়া শোওয়া, পাঠ, ব্যায়াম, চরিত্র ও মনের প্রসার প্রভৃতি সকল বিষয় লইয়া বিধবা মাতা বহু চিন্তা ও পরিশ্রম করিতেন। পুত্রও সেইজন্য ক্রমশঃ সুগঠিত দেহ মন লইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং মাতা, মাতামহ ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিল এবং বন্ধুবান্ধব মহলে শারীরিক শক্তি, ঔদার্য্য ও বিভিন্ন ক্রীড়ায় পারদর্শিতার জন্য তাহার খ্যাতি জন্মিয়া গেল। সকলের সহিত বেশ মেলামেশা করিলেও অমরের যথার্থ বন্ধুর সংখ্যা কমই ছিল। অধিকাংশ সহ-পাঠির কথাবার্ত্তা ও চাল চলন তাহার পছন্দ হইত না বলিয়া সে মাত্র কয়েকজন যুবকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিত। ইহাদের মধ্যে তাহার এক দূর সম্পর্কের খুল্লতাত পুত্র ও গ্রাম্য যুবক বিজয় মাধব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজয়ের সহিত তাহার পরিচয়টা ভাল করিয়া জমিবার কারণ এই যে অপরাপর হাল ফেশনের ছাত্রগণ এই গ্রাম্য জীবটির উপর প্রথম প্রথম অল্পবিস্তর উপদ্রব করিবার চেষ্টা করিত। একদা সুদর্শন প্রভৃতি কতিপয় ছাত্র বিজয়কে কোণ ঠাসা করিয়া নানাবিধ

প্রশ্নে বিপর্য্যস্ত করিতেছিল। তাহারা গ্রামে কি খায়, কি পরে, ঘরে তাহাদের আসবাব পত্র কি থাকে, গরু চরানটা 'কম্পালসরি' বা 'অপ্‌শন্যাল', তাহারা নাকি গ্রামের স্কুলে পাঠের পরিবর্ত্তে শুধু শিক্ষকের জন্য তামাক সাজিয়াই দিনযাপন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজয়, "না এরকম হবে কেন? তামাক আবার সাজায় না কি।" এই ধরণের উত্তর দিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তাহাকে উত্তরোত্তর অধিকতর অপমানসূচক প্রশ্ন করিয়া তাহার উৎপীড়কেরা প্রায় কাঁদাইয়া ফেলিবার জোগাড় করিল। এই সময় অমর কিশোর সেখানে উপস্থিত হইল। দুই একটা প্রশ্ন শুনিয়াই সে বুঝিল ব্যাপারটা আর কিছু নহে, গ্রাম্য মানুষ পাইয়া ইহারা বিজয়কে লইয়া তামাসা করিতেছে। সে হঠাৎ একজনকে প্রশ্ন করিল, "তুমি যে চিড়িয়াখানা থেকে পলাতক সেখানে বুঝি বাঁদরদের কিছু শেখায় না? এই কেমন করে মানুষের সঙ্গে চলতে ফিরতে হয়, এই সব?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি চটিয়া বলিল, "তুমি আমায় বাঁদর বলবার কে হে?"

"আমি? আমার সত্যি কথা বলা কি রকম অভ্যেস হয়ে গেছে; ছাড়তে পারি না।"

"ভাল হবে না বলছি।"

ঝগড়াটা যেন হঠাৎ বিজয়ের তরফ হইতে সরিয়া গিয়া অমরের ঘাড়ে পড়িল। সকলে অমরকে গালাগালি দিতে লাগিল কিন্তু কথার বেশী আর কিছু হইল না। একজন প্রফেসর সেই পথে আসিয়া পড়ায় ভীড় ভাঙ্গিয়া গেল। এই সূত্রে অমরের সহিত বিজয়ের বেশ বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

ষ্ট্রাইকারগণ সেদিনও খুব ভীড় করিয়া কলেজের গেটে জমায়েত হইয়াছিল। সুদর্শন বোস খুব ছাতি ফুলাইয়া এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করিতেছিল। বেচারাম সান্যালের ভাড়াটিয়া ভলাণ্টিয়ারও জনকয়েক উপস্থিত ছিল। এমন সময় দুই তিন জন ছাত্র ভীড় ঠেলিয়া কলেজের দিকে অগ্রসর হইল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কোথায় যাচ্ছ? কলেজে যাওয়া বারণ।"

"কে বারণ করল?"

সুদর্শন বোস সামনে আসিয়া বলিল. "আমি বারণ করেছি। আমি ছাত্র সভার সেক্রেটারী ও ষ্ট্রাইক কমিটিরও সেক্রেটারী।" "ছাত্র সভাটা কে কবে কোথায় স্থাপন করল? তার সভ্য কারা আর কি করে সভ্য হল? তোমাকেই বা কবে, কোথায় কে সেক্রেটারী মনোনীত করল? তোমার সভা, তোমার সেক্রেটারীত্ব, তোমার মিথ্যা রটনা, আমরা কিছু মানি না, আমরা কলেজে যাব।"

"সকলের হুকুম যেতে পাবে না।"

"দেখ ভগবান তোমায় নাম দিয়েছেন সুদর্শন বোস; অর্থাৎ কি না 'হে সুদর্শন, তুমি বসিয়া থাক; দাঁড়াইওনা, ছুটিওনা; নামে বোস, কাজেও বোস না বাবা!"

"ঠাট্টা ছেড়ে দাও; কলেজে যেতে পারবে না।"

এই প্রকার গোলযোগ চলিতেছে ইতিমধ্যে আরও তিনজন ছাত্র দল বাঁধিয়া অগ্রসর হইল। তৎপরে আরও তিনজন করিয়া কয়েকটি দল। ধর্ম্মঘটকারীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। এরা সব কারা? এ রকম করিয়া দল পাকাইয়া আসিতেছে?

একজন বলিল, "তোমরা দেশের অপমান সহ্য করে কলেজে চলেছ;

লজ্জা করে না ?" "দেশের সব থেকে বড় অপমান তোমরা। ভদ্রলোকের নামে ব্যক্তিগত ঝাল ঝাড়বার খাতিরে এতবড় মিথ্যা কথা চালিয়ে সকলকে ধাপ্পা দিচ্ছ ; তোমাদের মত জাতির অপমানকারী আর কে আছে ? যদি বাধা দেও ত স্বদর্শনের আজ এমন অবস্থা করে দেব যে বাড়ী গেলে মা চিনতে পারবেন না। মানে মানে চলে যাও, প্রিন্সিপালের কাছে ক্ষমা চাও গিয়ে।" স্বদর্শন বলিল, "দেখ, এ সব আমি সহ্য করব না বলছি ! সাবধানে কথা বলো।"

"আমরা খুব সাবধান, কোনও ভয় করোনা ; এত সাবধান যে তুমি আর তোমার যত জুয়াচোর সাকরেদ কি ভাড়াটে বদমাস আছে, সকলকে সামলে আর দু চার ডজন মিথ্যুক এসে পড়লেও সামলে নেব। আমরা প্রফেসর নরেন গুহ নই যে তোমরা পার পেয়ে যাবে, বুঝেছ ?"

স্বদর্শনের চেলাদের মধ্যে যে কয়টি অপেক্ষাকৃত জোরাল মানুষ ছিল তাহারা হঠাৎ "মার, মার" করিয়া এই সকল ছেলেদের আক্রমণ করিল। ইহারা যে ঝুঁটা আস্ফালন করিতেছিল না তাহার প্রমাণ অবিলম্বেই পাওয়া গেল। চার পাঁচটি ছেলে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এই চক্রান্তকারীদিগের ব্যূহের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে পাল্টা আক্রমণ করিল। তাহাদের তীব্র আক্রমণের সম্মুখে ঐ সকল যুবকেরা দাঁড়াইতে পারিল না। অচিরাৎ তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং প্রহারের চোট তাহাদের পৃষ্ঠেই অধিক লাগিতে লাগিল। স্বদর্শন, "আমি আরও লোক ডেকে আনছি" বলিয়া একখানা ট্যাক্সিতে উঠিতে যাইবে এমন সময় অমর তাহাকে পিছন হইতে একটা পা ধরিয়া একটানে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে তাহাকে উঠিবার সময় না দিয়া, টানিয়া হিঁচড়াইয়া একটা বস্তার মত করিয়া তাহার

সহযোগীদিগের নিকটে আনিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও তোমাদের নেতা!" সুদর্শনের ঘড়ির কাঁচ ভাঙ্গিয়া চুরমার, কলমটা কোথায় গিয়াছে ঠিকানা নাই এবং কাপড় জামা কেশ কর্দ্দমাক্ত। সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে গেল "অসভ্য বর্ব্বর..........," কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অপর এক দিক হইতে নিক্ষিপ্ত এক পাটি জুতা আসিয়া তাহার মুখের উপর লাগিয়া বাক্যের স্রোতে ভাটা পড়াইয়া দিল।

বেচারাম সান্যালের চেলাদের মধ্যে দুই একজন ইতিমধ্যে ছুটিয়া গিয়া উক্ত দেশ নেতাকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি দুই গাড়ী লোক জোগাড় করিয়া কলেজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলেদের দলও এতক্ষণে বেশ ভারি হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশই সুদর্শনের পতনে অমরের দলের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ব্যাপার কি।" অমর, বিজয় ও আরও কয়েকজন সকলকে এই চক্রান্তের পুর্ণ ইতিহাস বুঝাইয়া বলায় বহু যুবকই ভীষণ চটিয়া বলিতে লাগিল, "আচ্ছা করে লাগাও। এত বড় স্পর্দ্ধা যে নিজে বাঁদরাম করে সকলের নাম খারাপ করার চেষ্টা! লাগাও জোরসে!" বহু ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া সুদর্শনের গণ্ডীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করায় ঐ দলের যোদ্ধারা 'মানটা রাখিয়া প্রাণটা লইয়া' পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। সুদর্শন একবার ক্ষীণ কণ্ঠে, "আরে বেচারাম বাবুর লোকেরা আসছে, কোন রকমে টিঁকে থাক" প্রভৃতি বলিয়া ভাঙ্গন থামাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। ষড়যন্ত্রের কথা ক্রমশঃ রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় জনসাধারণের মধ্যেও অনেকে চীৎকার করিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল, "ঠিক করে ওষুধ দিয়ে দাও ভাই! এই সব

বজ্জাত ছোকরাদের জন্যে দেশে লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এরপর। বেশ করে ধোলাই করে ইস্ত্রি করে ছেড়ে দাও।"

বেচারাম সান্যাল আসিয়া পড়ায় একবার ক্ষীণ কণ্ঠে জয়ধ্বনির মত. একটা শব্দ উত্থিত হইল; কিন্তু তাহার সহিত আর্ত্তনাদের সাদৃশ্য থাকায় ঠিক বুঝা গেল না যে প্রকৃত অবস্থাটা কি। বেচারাম বাবু গাড়ীর গদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা বক্তৃতার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছেলেরা "শুনতে চাইনা" "গেট আউট", এইটেই পালের গোদা" প্রভৃতি চীৎকার করিয়া সে মর্ম্মস্পর্শী বাণী কাহারও অন্তরে পৌছাইতে দিল না। আধখানা কুমড়া হঠাৎ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া বেচারাম সান্যালের গাড়ীর উপর পড়িয়া সশব্দে ফাটিয়া গেল। তাহার উৎক্ষিপ্ত অংশ কাহার কাহার কাপড়ে জামায় ও মুখে লাগিয়া হাস্য রসের সৃষ্টি করিল। কাহারা কাগজের ঠোঙ্গায় করিয়া ময়দা, ছাতু ও সুরকি লইয়া আসিয়াছিল। কুষ্মাণ্ড নিক্ষেপের পরে মনে হইল শত শত ঠোঙ্গায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে এবং যোদ্ধা, দর্শক নির্ব্বিশেষে সকলে মাথায় মুখে দেহে এই সকল মাল মশলা মাখিয়া দক্ষ যজ্ঞের নিমন্ত্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। বেচারাম সান্যাল অগত্যা আসরের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া যাওয়াতে ইতর ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করিলেন। সুদর্শন পলাইতে পারিল না। তাহাকে ছাত্রেরা ধরিয়া একটা পানের দোকানের সম্মুখে মস্তকে ঘোল ঢালিয়া স্নান করাইয়া দিল।

কলেজের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকেরা এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। শত্রুপক্ষ পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলে পরে ছাত্রেরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিয়া

কলেজে প্রবেশ করিল। কয়েকটি পুষ্পমাল্য কোথা হইতে আনিয়া অধ্যাপকদিগকে মাল্য বিভূষিত করিয়া ছাত্রেরা আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রিন্সিপাল তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া কয়েকটি কথা বলিবার পর তাহারা তাঁহার নিকটে ছুটি লইয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নানান সংবাদপত্র আফিসে চলিয়া গেল। কার্জ্জন কলেজের ধর্ম্মঘটের আসল খবর সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

সুদর্শন বোস অতঃপর কয়েকদিন কলেজে আসিল না এবং তৎপরে শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন 'ট্রান্সফার' লইয়া মফঃস্বলের কোন কলেজে চলিয়া গেল। কলিকাতার ছাত্র মহলে এই ঘটনায় বিশেষ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল এবং অনেক কলেজেই তথাকথিত ছাত্র নেতা-দিগের কার্য্য কলাপ চিরাভ্যস্ত সহজ গতিতে না চলিয়া আড়ষ্ট ভঙ্গীতে চলিতে আরম্ভ করিল।

অধ্যাপক নরেন গুহ কলেজে পুনরায় পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যায় ও মিথ্যা আক্রমণ জর্জ্জরিত এই লোকটির উপর ছাত্রদের সহানুভূতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে বাড়িয়া গেল। তাঁহার নামও সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গেল এবং জীবনে তিনি নব নব রসের আস্বাদ পাইতে আরম্ভ করিলেন। আজকাল তাঁহার ক্ষুদ্র বাসায় হঠাৎ হঠাৎ নামজাদা লোকদের আগমন সুরু হইয়া গেল। কেমন করিয়া বাজারে রটিয়া গেল যে তিনিই চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। সাধু সজ্জনের দুনিয়ায় আদর না থাকিলেও কর্ম্মক্ষম লোকের আদর খুবই আছে। এই নিরীহ ভদ্রলোকটি যে আসলে ধর্ম্মঘটের ধাক্কার প্রায় শেষ হইতে হইতে ঘটনাচক্রে বাঁচিয়া গিয়াছেন, একথা তিনি নিজে বহু লোককে বলিলেও তাহা বিনয় বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিল না, বরং উল্টা উৎপত্তি

হইল। লোকে বলিতে লাগিল, "দেখেছ, কি রকম ব্যবস্থা করে সকলকে ঠাণ্ডা করে দিলে, মায় বেচারাম সাণ্ডেল অবধি; অথচ মুখে কথাটি নেই। ছাই চাপা আগুন হে; বুঝেছ কি না?" নরেন গুহ এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ পাইতে আরম্ভ করিলেন। এ দল ওদলের লোকেরা তাঁহাকে 'মেম্বর', 'কাউন্সিলর' প্রভৃতি নিয়োগ করিবার জল্পনা করিতে সুরু করিল। এ রকম প্রতিভাশালী লোক কলেজে পড়াইয়া সময়ের অপব্যবহার করে কেন? আসরে ঠিকমত নামিলে একটা কেষ্ট বিষ্টু না হইয়া যায় না। পাওনার অধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া নরেন গুহর জীবন একাধারে বৈচিত্র্য ও অশান্তিতে ভরিয়া উঠিল। নবলব্ধ ভক্তদিগকে তাড়াইয়া তাড়াইয়া আর ত পারা যায় না। অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে চাহিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া ছাত্রগণের বর্ত্তমান অরাজক ভাব দূর করা যায়। কি করিয়া বেয়াড়া ছেলেদের হাতে রাখা যায় ইত্যাদি। নরেন গুহ বলিতেন, "আরে মশায়, আমি কি আর কোন কৌশল করে কিছু করেছি। আমার নামে কয়েকটা ছেলে শুধু শুধু একটা মিথ্যা রটনা করে ধর্ম্মঘট করে বসল; তাই দেখে আর কয়েকটি ছেলে মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে দিলে। এই ত মোটামুটি কথা।"

"না মশায়, অত সহজে কি এ সব হয়। মিথ্যা কথা ত এর আগেও অনেকে অনেকবার রাষ্ট্র করে বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে ঘায়েল করেছে। এতে আবার বেচারাম সান্যাল ছিল। খুব ব্যবস্থা করতে হয়েছিল বইকি! আপনাদের প্রিন্সিপাল বললেন আপনি ধর্ম্মঘট হতেই আর কলেজে আসতেন না। বাইরে বাইরে ঘুরে ছেলেদের একত্র

করে, প্ল্যান করে একদিনেই সব ছাতু করে দিলেন। বিনয় করলে কি হবে?”

কয়েকটা প্রস্তাব আসিয়া পড়িল। কেহ তাঁহাকে দ্বিগুণ বেতনে অপর কলেজে লইয়া যাইতে চায়; কেহ বা অন্য কলেজের প্রিন্সিপালই করিয়া দিবে বলিল। নরেন গুহ মহাশয় আমতা আমতা করিতে করিতে কার্জ্জন কলেজের প্রিন্সিপালকে বলিলেন, “এই সব কথা আপনি অপরের মুখে শুনে হয়ত ভাববেন, আমি অন্যত্র যাবার চেষ্টা করছি; কিন্তু এ সবের আমি কিছুই জানি না। আর আমি আর কোথাও যেতেও চাই না।”

প্রিন্সিপাল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে অধ্যাপক নরেন গুহ ছাত্র মহলে অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁহার মত লোক হাতছাড়া হওয়া কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মোটা মোটা ‘অফার’ পাইয়াছেন এবং তাঁহাকেও জানিতে দিয়াছেন যে বেতনটা বাড়াইয়া দিলে তিনি অন্যত্র যাইবেন না। কর্ত্তৃপক্ষ নরেন গুহকে ডাকাইলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে তাঁহার কার্য্যে সকলে খুবই সন্তুষ্ট ও প্রীত, কিন্তু দুর্ম্মূল্যের বাজারে উপস্থিত পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতন বাড়াইবার উপায় নেই। ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি হইলে তাঁহারা আনন্দের সহিত আরও বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন।

নরেন গুহ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, “আপনারা কি বল্‌ছেন! আরে ছিঃ ছিঃ! আমি আপনাদের বেতনের কথা কখন বললাম? কিছু বাড়াতে হবে না।”

কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সভাস্থল হইতে নানা মিষ্ট কথায় বিদায় দিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিলেন। পঞ্চাশ টাকাতে গুহ মহাশয়

সন্তুষ্ট নয়। হইবেনই বা কেন? যাহা হউক একশত টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হউক। তাহাতেও না হয় ত দেখা যাইবে কি কর্ত্তব্য।

বেতন বৃদ্ধির সংবাদে নরেন বাবু আনন্দিত হইলেন খুবই; কিন্তু লজ্জা পাইলেন ততোধিক। ছিঃ কি ঘৃণার কথা! তিনি কখন কাহারও নিকট কিছু চাহেন নাই; আর সকলে প্রায় তাঁহার মুখের উপর বলিয়াই দিল যে তিনি বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া অপর কলেজের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন! বিধাতা একি মিথ্যার আবহাওয়ায় তাঁহাকে আনিয়া ফেলিলেন? প্রথমে মিথ্যা দোষারোপের ধাক্কা। তৎপরে প্রশংসা ও খ্যাতির প্রকোপ। এ আবার এক নূতন মিথ্যার মায়াজালে তিনি অর্থগৃধ্নু বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িলেন! ভদ্রলোক খাওয়ার সময় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলেন।

অমিয়া বলিল, "বাবা, খাচ্ছ না কেন? কি হয়েছে?"

"মাইনে একশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি কিন্তু চাইও নি, কিছু বলিও নি। শুধু শুধু 'কমিটি' ডেকে আমায় কথা শুনিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দিলে। যেন আমি তাদের বলেছিলাম যে না দিলে অন্যত্র কাজ নেব কি ঐ রকম কিছু। বড় লজ্জার কথা!"

"মাইনে বেড়েছে ত খুব ভাল কথা; লজ্জার কি আছে? একশ টাকা! এবার বেড়াতে যেতে পারবে এখন। তা ছাড়া এ বাড়ীতে ত তোমার কুলায় না। বসবার ঘরটা এত ছোট। ভালই হয়েছে।"

"ভাল ত হয়েছে; কিন্তু লোকে বলবে কি? কোথায় দুর্দ্দান্ত ছেলেগুলোর অত্যাচারে কাজ ছেড়ে দিয়ে অনাহারে মরবার ব্যবস্থা করছিলাম. না কোথাও কিছু নেই সবই উল্টে গিয়ে দুনিয়ার উন্মাদ

লোকের ধারণা হয়ে গেল যে আমিই চক্রান্ত করে দল জুটিয়ে ষ্ট্রাইক ভেঙ্গে দিয়েছি! এ রকম বিপদে কখন পড়ি নি!"

অমিয়া পিতার শিশু সুলভ মনোভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল, "আমি আবার কলেজে যাব। এখন ত মাইনে বাসভাড়া দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ তা হবে নিশ্চয়। আর শুনেছ? ডাক্তার ঘোষকে এ মাসে বাকি ওষুধ আর 'ফিসের' টাকা বাবদ পনের টাকা দিতে গেলাম, ত বল্লে, "না গুহ মশায় আর কিছু দিতে হবে না। সাড়ে আটশর মধ্যে আপনিত প্রায় ছয়শ দিয়েছেন, ওতেই হবে। আপনি এত বড় একটা লোক আপনার কাছে আর নেব না কিছু। নির্ম্মল মিত্তিরও ঐ রকম তার সুদের টাকা আর নিতে চাইছে না। বলছে যা দিয়েছেন তাতেই সুদ আসল সব শোধ হয়ে গেছে। সকলে এরা পাগল হয়েছে না আমি পাগল হলাম বোঝা যাচ্ছে না।"

অমিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তা ঠিকই বলেছে।. যে ভাবে শুষে শুষে তোমার কাছ থেকে নিচ্ছিল, তাতে তাদের লজ্জা ত হবারই কথা। কি রকম কড়া কড়া চিঠি আর তাগিদ! ভদ্রলোকে ও রকম করে না ত। ওরা ভুল বুঝে এখন শুধরে নিচ্ছে।"

"তা মা ভগবানের লীলা ছাড়া আর কি বলব। কিন্তু ব্যাপার কিছু বুঝিনা। হঠাৎ এ রকম হয়ে গেল কি করে?"

বিবিধ জল্পনায় সময় কাটাইয়া ও নানান লোকের উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দিবা প্রবীণ অধ্যাপকের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। পরীক্ষকের কাজ, নোট লিখিবার ফরমাস প্রভৃতি জুটিয়া অর্থাগমের পথও ক্রমশঃ আরও খুলিয়া গেল।

* * * *

বিজ্রয়ের কক্ষে বসিয়া অমর কিশোর, বিজয় এবং সত্যেন্দ্র নামক এক তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র গল্প করিতেছিল। আলোচনার বিষয় ছাত্রদিগের চালচলন। অমর বলিল. "জিমনেশিয়ামে একটা লোক দেখা যায় না; কিন্তু ক্যারম আর লুডো খেলতে ডাক ত কুম্ভমেলার মত ভীড় জমে যাবে। কোন কসরত নেই অথচ খায় রাজহাঁসের মত। কিছু বুঝিনা ভেতরে কি দিয়ে গড়া।"

বিজয় বলিল, "ম্যালেরিয়া হলে শুনেছি মানুষের ক্ষিদে বেড়ে যায়। এদের ত জ্বরজাড়ি হয় না ত এরকম ক্ষিদে হয় কি করে?"

সত্যেন বলিল, "প্রাগৈতিহাসিক একটা কি জানোয়ার ছিল, তার তুটো মগজ, একটা মাথায় আর একটা কোমরে। এদের বোধ হয় দুটো করে 'ষ্টমাক' আছে। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের এরা নূতন নিদর্শন। মিথ্যে খাওয়ার মিথ্যে ক্ষিদে, তেমনি মিথ্যে উৎসাহ মিথ্যে সাহস মিথ্যে ভাব প্রবণতা, মিথ্যে সব। যে কোন হুজুগ তোলো অমনি শত উৎসাহী জুটে যাবে। বিপদে চম্পট দেনেওয়ালা বাক্যবীর আর নকল প্রেম, ভক্তি, ভয় ত্যাগ আর বিচিত্র অনুভূতি পূর্ণ সাহিত্য ইত্যাদিতে তুনিয়া ভরে উঠেছে।

বিজয় বলিল, "কত রকমের মানুষ। কারু এ রকম ছাঁটের চুল, কারুর ও রকম, কেউ পাড় দেওয়া পাঞ্জাবী পরে কেউ কাবুলী পায়জামা। কত রকমের চশমা, জুতা, উড়ানী। আমরা গ্রামের লোক, আমাদের ত মাথা গোলমাল হয়ে যায়।"

অমর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "যত ভেতরে ফাঁক হয়ে আসে ততই ভেক রকমারি হয়। দেখ না ওষুধ. চুলের তেল, এসেন্স, এসবের কত

রকমের বোতল আর 'লেবেল' হয়? কারণ আসলে কোনটাতেই ভাল কিছু নেই; বাইরের আড়ম্বর দেখিয়ে লোক ঠকাবার চেষ্টা। দরকার হচ্ছে সব গুলোকে ধরে মাথা চেঁছে হাফ প্যাণ্ট আর হাত কাটা সার্ট পরিয়ে এক ভাবে হাঁটতে, চলতে, উঠতে, বসতে বাধ্য করা। তা হলেই ফাঁকি বাজি বন্ধ হয়ে যাবে। আর পরীক্ষার ব্যবস্থা। যে যা জানে বা পারে বলে বাজারে বলতে সুরু করবে, তখুনি তাকে ধরে পরীক্ষা করা। ফেল হয়েছ কি ঠোক্কর! এই ব্যবস্থা করলেই জুয়াচুরী বন্ধ হয়ে যাবে।"

সত্যেন জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু সব কিছুর পরীক্ষা ত হতে পারেনা। কেউ যদি বলে 'আমি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারি' ত তাকে প্রাণ দিইয়ে পরীক্ষা করলে তার পাশ করার পর আর বিশেষ কিছু করবার থাকবে না!"

অমর বলিল "আরে তা কেন? বলবে 'বাবা প্রাণ দিতে পার? আচ্ছা প্রাণ থাক, দিন কতক খেটে দাও দিকি, কিছু টাকা দাও দিকি, কিছুটা কষ্ট ভোগ কর আগে তার পর প্রাণ দেবে এখন। যত লোক দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তারা প্রাণ না দিয়ে যদি মাটি কেটে দিত আর রোলার টানত তা হলে দেশে যত খাল আর রাস্তা দরকার সব এতদিনে তৈরী হয়ে যেত।"

বিজয় বললে, "হারমোনিয়ম বাজিয়ে চাঁদা তুলে ত বেড়ায় অনেকে। তারা টাকা গুলো দিয়ে কি করে?"

"শক্তি সঞ্চয় করে। টাকাটা এমন ভাবে খরচ করে যাতে দেশ সেবকদের শক্তি বাড়তে পারে। অন্য কথায় সৎকার্য্যে ব্যয় করে। বিষয়টা খুব জটিল। কেউ বুঝতে পারে না।"

"তা যা বলেছ ; কাজও যে কি করে তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। কারুর কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ নেই, সকলেই সব জান্তা আর বিশ্বকর্ম্মা। যদি বলো যে অমুক দেশ নায়ক ইঞ্জিনিয়ার ; তাঁর উচিত যে কাজ জানেন তাই করা, তা হলে 'সিডিসন' হয়ে যাবে। তিনি, যেহেতু নেতা সুতরাং তাঁর প্রতিভা চতুর্দ্দিক ছাপিয়ে উপচে পড়তে হবে। ডাক্তারী, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজনীতি, অর্থ-নীতি, আইনকানুন ; সকল বিষয়েই তিনি হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। অর্থাৎ কিনা কোন কর্ম্মই তাঁকে দিয়ে ভাল করে হবে না।"

বিজয় বলিল, "আমি সে দিন একটা সাহিত্যের সভায় গিয়েছিলাম, তার নাম 'আখড়া'। তারা কি যে বল্লে আর পড়ে শোনালে, কোন কিছুর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। আমি অবশ্য এসব বুঝি না, কিন্তু তবু।" সত্যেন বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি আখড়ায় গিয়েছিলে? কে নিয়ে গিয়েছিল তোমায়? ওরা একদল বদ্ধ পাগল এবং না পারে এমন কাজ নেই। একটা আখড়াই কবিতা শুনবে?

"ল্যাম্প পোষ্ট কেন আছে?
সন্ধ্যায় জ্বলে দিনে নিভে যায়
চুরির আশায় আকাশের কোণে উঁকি মারে ;
অন্ধকার ঠেলে ফেলে দেয় আলোক,
বাগ মানে না ফের গুঁড়ি মেরে চলে ;
অদম্য অসীম তার আগ্রহ চুরির।
কেন, কি চুরি করবে?
তা কেউ জানেনা।

তারা গুলো গোয়েন্দার মত দেখে
পিট পিট করে। ধরতে পারলে
নিয়ে যাবে ছায়া পথ দিয়ে
ধূমকেতুর ল্যাজে বেঁধে, অনন্তের গারদে।
তাই ভয়ে ল্যাম্প পোষ্টের হাত, মানে আলো,
বেশী দূর যায় না তারার দিকে ;
কাছে কাছে ঘোরে নিজের পাড়ায়॥"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিজয় বলিল, "হ্যাঁ ঐ রকমই সব কবিতা। তা ছাড়া একজন একটা গল্প পড়ল, তার কোন মানে হয় না। একজন লোক, সে সিগারেট খায়। তার কিন্তু সিগারেট খেতে ভাল লাগে না। তবুও খায় কেননা যদি না খায় তা হলে তার ছাদ থেকে লাফাবার ইচ্ছে হয় ক্রমাগত। সকলে তাকে বোঝায় সে ধারণাটা তার ভুল। কিন্তু সে প্রাণের ভয়ে ফোঁ ফোঁ করে প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট ফুঁকে চলে।"

"একদিন সে সিগারেট ধরিয়ে বাড়ী ফিরতেই শুনল তার স্ত্রী মারা গেছে ছাদ থেকে পড়ে। অমনি সে সিগারেটের টিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে ছাদে উঠে সেখান থেকে রাস্তায় লাফ দিয়ে পড়ল।"

"আচ্ছা কি মানে হল ?"

অমর হাসিয়া বলিল, "মানে হল না ত কি হয়েছে ? গল্প হল ত ! মানেও ত পরিষ্কার। মানুষটার সিগারেট খেয়ে খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে আত্মহত্যা করল।"

সকলে মিলিয়া নানান বিষয়ে আলোচনা চালিতে লাগিল। এ কথা সে কথার পরে, কথা উঠিল অধ্যাপক নরেন গুহর। অমর বলিল

"ভদ্রলোক বড়ই ভাল মানুষ।" সত্যেন বলিল, "তা না হলে তার উপর বদ ছোকরারা জুলুম করতে সাহস পাবে কেন?"

বিজয় বলিল, "কিন্তু নরেন গুহ মহাশয়ের কন্যা খুবই তেজস্বিনী।"

"ওঁর আবার কন্যা আছেন না কি? জানতাম না ত।"

"হ্যাঁ, বেশ কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয় লেখাপড়া জানা।"

সত্যেন বলিল, "ও, তা হবে। আমরা ওঁকে আগে বিশেষ চিনতামই না। আজকাল অবশ্য সকলেই ওঁকে চেনে।"

বিজয় বলিল, "অমর বলছিল যে ষ্ট্রাইকের সময় একদিন গড়ের মাঠে নরেন বাবুর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল, সেই সময় ওঁর কন্যাও সঙ্গে ছিলেন। তিনি নাকি এমন করে বল্লেন যে অমর দেখলে সকলকে বুঝিয়ে সুদর্শনের ষড়যন্ত্রটা অবিলম্বে ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। কি বলেছিলেন বলত অমর?"

অমর বলিল, "আমার কি পরিষ্কার করে কথাগুলো মনে আছে? অর্থ হচ্ছে এই যে মিথ্যার জোর যখন বেড়ে ওঠে তখন সত্যের সেনাদল গড়ে তুলে তাকে ভেঙ্গে দেওয়া দরকার হয়।"

সত্যেন মন্তব্য করিল, "প্রায় যে ধর্ম্মকে রক্ষা করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবের মত শোনাচ্ছে? সত্যি ওঁর কন্যা এই সব বড় বড় কথা বলেন? মেয়েরা ত আজকাল শুধু সাজগোজ নিয়েই থাকে। আশ্চর্য্য বলতে হবে।"

"মেয়েরা কাছের জিনিসকে খুব তলিয়ে দেখতে পারে। ষ্ট্রাইকটা তাঁর বাবাকে নিয়ে হয়েছিল তিনি তাই তার ভিতরের কথাটা ভাল করেই বুঝেছিলেন। ব্যায়রাম ভাল করে বুঝলে তার চিকিৎসাও সহজ হয়ে আসে।"

(৭)

আখড়ার আসর বসিলে ছোট ঘরখানা জনতায় যাত্রী-পরিপূর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর রূপ ধারণ করে। মামুলী পুঁটলি ও বস্তার পরিবর্ত্তে কামরার চতুর্দ্দিকে ছাতা, লাঠি, বর্ষাতি, জুতা, খাতা, চায়ের পেয়ালা, পানের ঠোঙ্গা ও খাবারের চুবড়ী রাশিকৃত হইয়া জমা হয় এবং চেয়ারে, টেবিলে, টুলে, বাক্সের উপর, সর্ব্বত্র লোক বসিয়া আখড়ার কার্য্য সম্পন্ন করে। সচরাচর এই কামরায় একটা দপ্তর বসিয়া থাকে। শুধু আখড়ার সভা বসিবার দিন সেখানে নীরস কার্য্য বন্ধ হইয়া রসের প্রবল ধারা বহিতে থাকে। এত অভ্যর্থনার আড়ম্বর কয়েকজন পয়সাওয়ালা সভ্যের খরচেই হইয়া থাকে, তবে কখন কখন কোন চির-বেকার সভ্য হঠাৎ কিছু টাকা হাতে পাইলে দুই একটা চুবড়ী হস্তে আখড়ায় উপস্থিত হয়েন। এরূপ ঘটনা বিরল হইলেও ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

আজকের বৈঠকটা খুবই জমিয়াছে; কেন না বংশী দত্তর একটা 'পোষ্টারের ডিজাইন' কোন এক রেলওয়েতে প্রথম প্রাইজ পাইয়া গৃহীত হওয়ায় সে এককালীন পাঁচ শত টাকা পাইয়া বসিয়াছে। ফলে সে অপরাপর অপব্যয়ে অধিকাংশ অর্থ খরচ করিয়া চার পাঁচটা চুবড়ী ও কাগজের বাক্স হস্তে আখড়ায় আসিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে। তাহার পোষ্টারটা কলিকাতার দৃশ্য বলিয়া অঙ্কিত হয়। আধুনিক জার্ম্মান পোষ্টার শিল্প সংক্রান্ত একটা বই কিছুদিন পুর্ব্বে বংশীর হাতে পড়ে। সে তাহাতে বহু চিত্র দেখিয়া বিচলিত অন্তরে সেই সকল ভাব ও রস প্রক্ষেপ করিয়া ভারতীয় বিষয় লইয়া দুই

চারিটা চিত্র অঙ্কিত করে। জার্ম্মানী ফেরত আখড়ার এক সভ্য দেখিয়া বলিলেন, "আপনার কম্পোজিশন একেবারে জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী হাসিসরাউখেরের মত হয়েছে। এই যে মাকড়শাটা অনন্তে পা মেলে দিয়ে হাই তুলছে, আর তার মাথায় আকাশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা কচ্ছপ ব্যাঙ প্রভৃতি পড়ছে, এর নামই 'লাখ গেহেন' অর্থাৎ শিল্পের অন্তরে গভীর ভাবে চলে যাওয়া। আপনি দুটো একটা বড় বড় ছবি এঁকে ফেলুন!"

বংশী অতঃপর এই আদর্শে ভাবের অতি নিকটে পৌছাইতে আরম্ভ করিল। তাহার অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ রেখা ত্যাগ করিয়া সংযুক্ত ইষ্টকের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছেন এবং সর্পটা ভয়ে শুখাইয়া আধমরা হইয়া বল্লমের ফলকে রচিত জলে শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। সর্পের আকৃতি তাহার মনের অবস্থার অনুযায়ী অর্থাৎ চেলা করা জ্বালানী কাষ্ঠের মত। আখড়ায় এ চিত্র দেখাইলে পর প্রশংসার প্রবল বন্যায় বংশী উদ্দীপ্ত হইয়া ঐ পোষ্টার প্রতিযোগিতায় নাম লিখাইয়া ফেলিল।

প্রাইজ পাওয়া "কলিকাতার দৃশ্য" সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। মনুমেণ্ট, ময়দান, ভিক্টোরীয়া মেমোরিয়াল ও চৌরঙ্গী; তৎসঙ্গে কারবারের খাতিরে একজন মাড়ওয়ারী, কেল্লার নিদর্শন হিসাবে একজন ইংরেজ পদাতিক সৈন্য এবং চিড়িয়াখানার জন্য একটা জিরাফ। এই সকল কিছু চিৎ, কাৎ ও ডিগবাজি খাইয়া ডায়মণ্ডকাটা গঙ্গাবক্ষে কয়েকটা জাহাজের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে ও উর্দ্ধ প্রান্তে টেলিফোনের থাম ও তারে লটকাইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে আকৃতিতে মনুমেণ্ট ও ভিক্টোরীয়া মেমোরিয়াল তিন কোণা ও

অষ্টকোণ নক্সায় গঠিত। ময়দানের ঘাস ও গঙ্গার জল সমকোণ মাকু ও ছয় কোণা জলবিন্দুতে রচিত। মাড়ওয়ারী, ইংরেজ ও জিরাফ সর্ব্বাঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধির লক্ষণে জীবন্ত। তার, থাম ও জাহাজ পূর্ণাঙ্গ নহে। এখানে ওখানে তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মম ভাবে কর্ত্তিত। প্রশ্ন হইতেছে যে এই প্রকার চিত্রের জন্য পঞ্চ শত মুদ্রা পুরস্কার দিল কে এবং যদিও বা মাতাল অবস্থায় কেহ দিয়া থাকেও ত পরে উহা মুদ্রিত হইয়া ভারতবর্ষের সকল রেল ষ্টেশনে লাগাইবার পর চিত্র বিচারকের কোন শাস্তি হইল না কেন? ইহার উত্তর খুবই সহজ। আধুনিক জগতে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই, যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দুনিয়ার সকল প্রতিষ্ঠানগুলি ওলটপালট হইয়া মানুষের মনের বদ্ধমূল ধারণা-গুলিকে হঠাৎ বিনাশ করিয়া মানব মনকে উদ্ভট কল্পনা, অসম্ভব জল্পনা ও অন্ধকারে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার আসর করিয়া তুলিল; তখন সংসারের সকল সনাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও পন্থা নিমেষে সেই বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। মানুষ অবলম্বনহীন অবস্থায় কোন ক্ষেত্রেই বাঁচিতে পারে না; তাই হঠাৎ নিঃসম্বল মানব মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মে, বিশ্বাসে, রাষ্ট্রমতে, সামাজিক রীতিনীতিতে শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থায়, খাদ্যে, পোষাকে ও চালচলনে নূতন আদর্শের সন্ধানে ধাবমান হইল। রোগাক্রান্তের আকুল 'কি করি, কি করি' ভাবের সুযোগে যেমন হাতুড়ে চিকিৎসকের মরসুম সমাগত হয়; এই হৃত-আদর্শ অবলম্বনহীন যুগের সমাগমে সর্ব্ববিধ হাতুড়ে, ভণ্ড, প্ররোচক ও বাতিকগ্রস্ত বিধানবাগীশের সুবর্ণসুযোগ আগত হইল। মানুষ এতকাল যাহা কিছু লইয়া সন্তুষ্ট ছিল সকল কিছুই তাহার পরম অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সহস্র যুগের

ভুল-ভ্রান্তি যেন একদিনে সংস্কারের জন্য সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। নূতন কিছু দেখাইলেই সকলে সহজেই মানিয়া লইতে আরম্ভ করিল যে তাহা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠত্বের চরম পরিকল্পনা!

বংশীর চিত্র যে এ হেন যুগে বিচার সভায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? একজন বিচারক বলিলেন, "এই পোষ্টারখানা একেবারে নূতন রকম। যেন অন্তরের অনুভূতির হুবহু প্রতিকৃতি!" অপর বিচারকদিগের সাহসই হইল না কিছু বলিবার। এত বড় একটা কদর্য্যতা যখন সাহস করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে, চিত্রকর তখন নিশ্চয়ই কোন সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত। গতানুগতিক ভাবের লেশমাত্র নাই। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি হইতে পারে? ফলে উক্ত চিত্র শত শত ষ্টেশনে বিলম্বিত হইল।

কেরাণীরা বলিল, "এটা আবার কি রে!"

বেহারী কুলী ভাবিল "ভুকম্পকা তসবির।"

গার্ড ও ড্রাইভাররা মত প্রকাশ করিল, "লেটেষ্ট ষ্টাইল"; ডাইনিং কার হইতে পোষ্টারখানা দেখিয়া বৃদ্ধ কর্ণেল চমকিয়া উঠিয়া মদের গেলাসটা ঠেলিয়া দিয়া কমলা লেবু খাইতে লাগিলেন। বংশী তিন জোড়া জরীর কাজ করা নাগরা জুতা, রেশমের রুমাল, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি ক্রয় করিয়া এককালীন আহারে বহু বৎসরের ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করিল।

আখড়া সরগরম। সকলে বংশীকে পিঠে থাপড়াইয়া প্রায় মৃতপ্রায় করিয়া আনিয়া পরে অপর প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। সত্যেন বিজয়কে বলিল, "এই বারে পালা আরম্ভ হবে।"

বিজয় ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, "সেই দিনের মত হবে ত?"

"দেখ না কি হয়।"

একজন শীর্ণকায় যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটী খাতা হইতে পড়িতে স্বরু করিল:

"কি এনেছ বল?
ব্যাবিলন হ'তে হাসি, মিশরের সুরমা ঘন নীল,
আসিরিয়ার বক্র চাহনি
পারস্যের হাতছানি, সিন্ধুর তাম্বূল?
আর কি এনেছ?
রোম ও অ্যাথেনসের গান
বুয়েনস এয়ারসের গতিভঙ্গী
পারীর দুষ্টুমী?
পেলে না কি আর কিছু?
চীনের ভাঙ্গা পা
কাম্বোজের গয়না বাঁধা গলা
বর্ব্বরের বিঁধান ঠোঁট কি উল্কি
বাঘিনীর তীক্ষ্ণ নখর কিম্বা
টুয়ারেনোর দুর্দ্দান্ত শাসন?
ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার বাগানে
হাত বাড়িয়ে কুসুম চয়ন করতে যাই;
লম্বা লেবু-গন্ধ ঘাসের আড়ালে
ক্রুদ্ধা সর্পিণী ছোবল মারে।
কেন স্বপ্ন দেখি?
মরণই সহজ সরল॥"

সকলে উৎকট চীৎকার করিয়া বাহবা দিয়া উঠিল। "চমৎকার, ষ্ট্রেট ফ্রম দি হার্ট! এইত মুক্তি! স্বপ্নের মত, ডিলিরিয়ামের মত, সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেঁড়া নিছক অনুভূতির চিত্র!"

বাহবার বন্যা সংযত হইলে পর আর এক জন সাধক উঠিয়া একটি গল্প পাঠ করিতে সুরু করিলেন। গল্পের নায়ক ক্যানসারে ভুগিতেছেন। বাঁচিবার কোন আশা নাই। এটা অবশ্য তাঁর প্রিয় বন্ধুদের ধারণা। ডাক্তাররা তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য যখন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন সেই সময় তাঁহার বন্ধুরা কষ্ট হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহাকে হত্যা করিবার বিধিমত চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। বিষাক্ত ঔষধ; ছুরি ছোরা রিভলভার প্রভৃতি বিভিন্ন অস্ত্রে চেষ্টা চলিতে লাগিল। অবশেষে এক বন্ধু বিশেষ পরিশ্রমের পর রুগীর ঘরে চেয়ারে আসীন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে ভুল ক্রমে গুলি মারিয়া হত্যা করিয়া বসিলেন। ইহাতে হত্যাকারীর ফাঁসী হইল এবং ক্যান্সার হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া নায়ক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্ধুর প্রণয়িণীকে বিবাহ করিয়া গল্পের প্লট সম্পূর্ণ করিলেন। নব বিবাহিতা বধূ বাসর কক্ষে স্বামীকে বলিলেন, "আমার অন্তরের নিভৃত কোণে একটা ক্যান্সারের মতই তোমার প্রতি গোপন ভালবাসা বেড়ে উঠছিল। আজ তাই ফেটে বেরিয়ে পড়ল। এ আমার মৃত্যু না পুনর্জ্জন্ম কে বলবে?" সবাই বলিলেন, "বা চমৎকার! 'ডাইন্যামিক'!" সত্যেন বলিল, "চল আমরাও 'ডাইন্যামিক' ভাবে এ স্থল ত্যাগ করি।"

দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। বিজয় কহিল, "এরা যদি রামায়ণ লিখিত তা হলে কি রকম দাঁড়াত?"

"বোধ হয় রামচন্দ্র দশাননকে আলিঙ্গন করে বলতেন 'হে বন্ধু,

তুমি, আমার একটা বড় রকম 'রিপ্রেশন' ভেঙ্গে দিয়েছ। কিছু যদি মনে না কর ত আমি মন্দোদরীকে লইয়া 'ইলোপ' করি।' দশানন বলতেন, 'ভাই প্রস্তাবটা ভালই, কিন্তু মন্দোদরীর পাত্তাই নাই, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণও পলাতক।"

(৮)

গ্রীষ্মের ছুটি ঘনাইয়া আসিয়াছে। কলেজের ছেলেরা সারা বৎসরের লেখাপড়ার ধাক্কা সামলাইয়া ছুটির জন্য নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলিতেছে কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইবে কেননা এই খানেই নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় আনন্দে কাল কাটাইবার মাল মশলা অপর্য্যাপ্ত। মফঃস্বলে দিন কাটান কঠিন। তাহার উপরে গুরুজনদিগের সান্নিধ্য মনের প্রকৃত বিকাশের পথে অন্তরায়। অপরাপর ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুরী, কেহ রাঁচি, কেহবা দার্জ্জিলিং যাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

আজকাল পাঠে মন্দা পড়িয়া আসিয়াছে, তাই ছাত্রেরা বাজারে জিনিস পত্র ক্রয় করিবার ধান্ধায় ঘোরা ফেরা আরম্ভ করিয়াছে। নিজেদের জন্য পরিবারের লোকদের ফরমাস অনুসারে, উপহারের জন্য, বা শুধু অকারণ আগ্রহে দোকান মহল ছাত্র জাতীয় জীবে সতত জন বহুল।

অমর ও সন্তোষ পুরী যাইবে স্থির করিয়া সাঁতারের কাপড়, বালিতে হাঁটিবার জন্য বিশেষ জুতা ইত্যাদি ক্রয় করিয়া আনিল। বিজয়কে বলিল, "তুমিও চলনা। পুরী খুব ভাল জায়গা। তা ছাড়া সমুদ্রটা দেখে নেও।"

বিজয় বলিল, "একবার দেশে যেতেই হবে। বাবা লিখেছেন

ছুটি হলেই প্রথম ট্রেনে চলে আসতে। ওখানে যাই; তার পর তোমাদের লিখে জানাব যদি পুরী যেতে পারিত। বাড়ীর লোকেরা খুব গোলযোগ করবে ; তবে, বলা যায় না; হয়ত রাজী হয়ে যেতেও পারে। সত্যেন ও অমর অতঃপর বাক্স গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া পড়িল। ছুটি হইলেই সেই দিনই রাত্রের গাড়ীতে রওনা দিবে। পুরীতে একটা জানা শোনা লোকের হোটেল আছে। সেখানেই উঠিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বিজয়ও বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

* * * *

গ্রামে ফিরিয়া আসিতেই বিজয়ের প্রথমত পরিবারের ও গ্রামের সকল লোকের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আলবোলার নলটা মুখ হইতে সরাইয়া বলিলেন, "এস বাবা ; কেমন ছিলে, শরীর ভাল ছিলত, লেখাপড়া বেশ চলছে ত?" বিজয় একবার, "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পিতা অপর কোন প্রশ্ন না করায় সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার এ সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী হইল। অপর গুরুজন, আত্মীয় ও পরিচিতেরা তাহাকে এত অল্পে মুক্তি দিতে চাহিলেন না।

খুল্লতাত একটা কলিকাতার ইস্ত্রি করা সার্ট গায়ে দিয়া বিজয়ের সম্ভাষণে আগত হইলেন। তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত সংবাদ পিপাসু প্রাণ বিজয়ের আগমনে মেঘ দর্শনে চাতকের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। "বলি কলকাতার সব খবর কি? হরেন ভাল আছে ত? আজকাল থিয়েটারে কি কি বই হচ্ছে? কাগজে দেখলাম 'পাপের বোঝা' বলে একটা বই খুব চলেছে, দেখতে গিয়েছিলে না কি?

কারা কারা নেমেছে? 'হৃদয়ের ক্ষত' গানটা নাকি এক এক দিন পাঁচটা ছটা এনকোর পায়। ঐ অরনী লোকটা কে বটে? না কি এমনই সুপুরুষ আর গাইয়ে যে এমনটি আর দেখা যায় না?"

বিজয় যখন বলিল যে, সে "পাপের বোঝা" দেখিতে যায় নাই, তখন খুল্লতাত অবাক হইয়া বলিলেন, "কলকাতায় থেকে 'পাপের বোঝা' না দেখে চলে এলে!" যেন বিজয় কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে থাকা সত্ত্বেও গঙ্গাস্নান ভুলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

মাতুল, মেশো মহাশয় ও অপরাপর গুরুজনেরা বিজয়কে ফুটবল, সাগর স্নান প্রভৃতি বিভিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া মাথা ঘুরাইয়া দিলেন। বিজয় যথাসাধ্য উত্তর দিয়া বাড়ীর ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানেও তাহার চেহারার পোষাকের ও চাল চলনের নানান সমালোচনায় টেঁকা দায় হইয়া উঠিল। "রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন? এসব দামী দামী কাপড় পরে নষ্ট করছিস? খুব টেরী কাটতে শিখেছিস ত? তিন আঙ্গুলে খেতে শিখলি কবে থেকে; না রান্না ভাল লাগছে না?" ইত্যাকার কথায় তাহার শান্তিতে খাওয়া শোওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহার উপর প্রতিবেশিনীরা আসিয়া, "ওমা, চেহারা একেবারে শুখিয়ে কেমনতর হয়ে গেছে গো!" অথবা, "বি, এ, পাশ দিয়ে এল না কি?" প্রভৃতি চীৎকার করিয়া তাহার কান ঝালাপালা করিয়া দিলেন।

বিজয় অবশ্য আগের কুব্জভাব ও হাঁ করিয়া থাকা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে ভিন্ন রকম হইয়া গিয়াছিল। তাহার তোতলামও অনেকটা নাইএর মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলের কৌতুহল পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিল। অনেকের মতে

কলিকাতার জলবায়ুর গুণে তাহার মুখশ্রী কার্ত্তিক ঠাকুর সদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। আবার অপর কাহারও মতে সে না খাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে।

পুরাতন বন্ধুরা সকলে বিজয়কে আর ঠিক আগের মত করিয়া দলে টানিয়া লইল না। তাহাদের বন্ধুত্বের মধ্যে একটা আড়ষ্ট ভাব ফুটিয়া উঠিল। কেহ কেহ কলিকাতার স্কুল কলেজের বর্ণনা শুনিবার জন্য তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিল বটে ; কিন্তু খুব যে প্রাণ খুলিয়া আড্ডা জমাইয়া কোন কথা হইল এমন নহে।

বিজয় যেন গ্রামে থাকিয়াও গ্রামের বাহিরের হইয়া গেল। কলিকাতার লোক সম্বন্ধে গ্রামবাসীর যে স্বভাব সুলভ দ্বন্দ্বের ভাব তাহা এ ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান না থাকিলেও আবছা আবছা দেখা যাইত।

বিজয় একটি ছেলেকে বলিল, "চল সকলে একদিন শালবনে চড়ুই ভাতি করি।" সে বলিল, "ও কি আর তোমার ভাল লাগবে ? ওর চেয়ে আমাদের দু একটা নূতন তাসের খেলা শিখিয়ে দাও।"

বিজয় বুঝিল গ্রামে তাহার মানসম্ভ্রম বাড়িয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে বাল্য বন্ধুদের সহিত সংযোগ বন্ধন ঢিলা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের ছেলেরা তাহার উপদেশ শুনিতে রাজী, তাহার অনুকরণেও আপত্তি নাই ; কিন্তু আপনভোলা হইয়া তাহার সহিত গল্পে বা খেলায় মাতিয়া যাইতে কেহ প্রস্তুত নহে।

সরসী দত্তর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সে যে বিবাহের পরে কোন সব মৌজা সামলাইতে লাগিয়া পড়িয়াছিল ; তাহার জীবনের ধারা পূর্ণমাত্রায় সেই সময় হইতে ঐ মৌজা, খাজনা ও মোকদ্দমার

পথেই বহিতে আরম্ভ করিল। সরসীকে পাওয়া গেলে না হয় দুটো "আখড়া"র কথাই বলিয়া সময় কাটান চলিত। কিন্তু বিজয়ের কপালে সে সুখও জুটিল না। সে হাঁফাইয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল কোন ছুতা করিয়া পুরী চলিয়া যাইতে পারিলে অমর ও সত্যেনের সহিত ছুটির বাকি কটা দিন কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পিতাকে গিয়া বলিল "কলেজের পড়া টড়া ত এখানে সুবিধে হচ্ছে না, আমি ভাবছি পুরীতে অনেক ছেলেরা গিয়েছে, সেখানে চলে গেলে কাজ একটু এগিয়ে রাখা যায়। সামনের বছরেই পরীক্ষা, একেবারে ঘুরে বেড়ালে চলবে না।" পিতা সটকা ছাড়িয়া মন্তব্য করিলেন, "এখানেই একটা ঘর আলাদা করে নেও না।"

"সেখানে কয়েকজন উঁচু ক্লাশের ছেলে আছে; তা ছাড়া সহ-পাঠিরাও আছে; পড়ার সুবিধা হয়।"

"তা যদি একান্ত প্রয়োজন মনে কর ত যাও। কোথায় থাকবে? খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা?"

"সে সব ঠিক আছে। ওখানে ত রয়েইছে; তারা ঠিক করে দেখে এখন।"

"ব্যবস্থা সব ঠিক করে তবে যেও। একটা পত্র দিয়ে জবাব আনিয়ে নাও।"

চিঠির জবাব আসিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। অমর লিখিল, "এখানে খুব ফুরফুরে হাওয়া; গরম নেই বল্লেই চলে। আমরা দু'বেলা সমুদ্রে স্নান করি, আর বালির উপর শুয়ে পড়ে রোদে গায়ের রংটা পাকিয়ে তুলি। তুমি এলে ভালই হবে। দুই একজন নূতন বন্ধু

জুটেছে, তাদের মধ্যে একজন খুবই রগুড়ে লোক। তার হাসানর উৎপাতে আমরা প্রায় গম্ভীর হবার কোন সুযোগই পাই না। পুরীর মন্দির দেখা হয়েছে। ভুবনেশ্বর আর কোনারক দেখতে যাওয়া হবে। তুমি যদি শীঘ্র আস, তা হলে তখনই যাব ভাবছি। সুতরাং বেশী বিলম্ব করো না।

"আর একটা কথা; প্রফেসর নরেন গুহ এখানে বেড়াতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়।.........."

বিজয় পিতাকে বলিল "সংবাদ খুবই ভাল। থাকিবার জায়গা ও পাঠের সহচর ত আছেই, উপরন্তু একজন অধ্যাপকও ওখানে গিয়াছেন এবং ইহাতে পাঠের বিশেষ সুবিধা হইবে।" ইহার পরে পিতা আর কি বলিবেন? বিজয় পুরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, দুই একদিন পরে যাত্রা করিল। পিসিমাতা আপত্তি তোলায় তাঁহাকে ক্ষেত্রে বাসনের লোভ দেখাইয়া বিজয় কোনমতে তাঁহার আপত্তি কাটাইল।

সারাদিন ট্রেনের ঝাঁকড়ানি সহ্য করিয়া বিজয় রাত্রের দিকে পুরী পৌছাইল। ষ্টেশনে অমর ও সত্যেন তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। তাহারা বিজয়কে লইয়া একখানা গাড়ী করিয়া হোটেল অভিমুখে চলিল। দুই একটা মোড় ফিরিবার পরেই স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে অনন্ত বিস্তৃত জলরাশি দেখা যাইতে লাগিল। দ্রুত ধাবমান অশ্বারোহী বাহিনীর ন্যায় সাগরের বিক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালা বেলাভূমির উপরে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। যেন শত সহস্র শাণিত তরবারি ঝলমল করিয়া

জ্বলিয়া উঠিতেছে ও অসংখ্য পতাকা বর্শার ফলকের সহিত উৎক্ষিপ্ত হইয়া সহসা দৃষ্টিপথে আসিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। অস্ত্র সংঘাতের ঝনৎকার থাকিয়া থাকিয়া আকাশ বাতাস মুখর করিয়া তুলিয়া মানুষকে চমকাইয়া দিতেছে। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যায় না; কিন্তু সমুদ্রের সে সীমাহীন শক্তির জাগ্রত চিত্র বিজয়ের মনে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া গেল। সে শুধু বলিল, "এত বড়!"

"দিনের বেলা দেখবে এখন কত বড়।"

"তোমরা স্নান কর কোথায়?"

"ঐ ঢেউয়ের মধ্যে। এখন ফসফরাস আছে বলে চকমক করছে। দিনের বেলা ও রকম থাকে না। তবে একটা ঢেউ দুতালার সমান।"

"তবে স্নান কর কি করে?"

"ও সে ঠিক শিখে নেওয়া যায়। ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে ডুব দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। এখন চলত। খেয়ে দেয়ে এক চক্কর সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসব এখন। আর কাল সকালে তোমায় শেখান হবে সব।"

গাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে হোটেলে পৌছাইল। কলিকাতার তুলনায় হোটেল একান্তই ছোট খাট দেখিতে। অবশ্য একেবারে সমুদ্রের গায়ের উপর। বিজয় বলিল, "বাঃ, এ যে একেবারে বাড়ীর মত! কত লোক আছে এখানে?"

অমর বলিল, "তা জনা পঁচিশ হবে। বেশ জানা শোনা হয়ে গেছে সকলের সঙ্গে। কারণ সকলেরই এক চিন্তা আর আর একই কাজ। স্নান আর খাওয়া, খাওয়া আর স্নান। দুনিয়ার আর কোথাও এরূপ খালি খাওয়া, শোওয়া, আর স্নান করে লোকে দিন কাটায় বলে শুনি নি। যাকে বলে নিছক জান্তব অস্তিত্বে দিন কাটান।

লেখা পড়া, কূট তর্ক, আইন আদালত, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, ধর্ম্মঘট কিম্বা সভা সমিতি ; কোন কিছুই নাই ; অথচ সবাই বাঙ্গালী। মানব সভ্যতার সব অলঙ্কার বর্জ্জন করে এ রকম কাঠামোটুকু মাত্র নিয়ে বসবাস করার একটা নূতনত্ব আছে, দেখবে এখন।"

সকলে খাইতে বসিল। জীবনযাত্রা যেরূপ খুঁটিনাটি বর্জ্জিত, শুধু দুই চার আনন্দেই কানায় কানায় ভরিয়া আছে ; আহারের সরঞ্জামও সেইরূপ রকমারি নহে। শুধু এক প্রকার মৎস্য, একটা মাংস ও মিষ্টান্ন কিন্তু পরিমাণে অপর্য্যাপ্ত। পরিমাণ দেখিয়া বিজয় ভাবিল এত কখন কেহ খাইতে পারে না। তাহার ধারণা যে ভুল তাহা শীঘ্রই প্রমাণ হইয়া গেল, বিজয় ব্যতীত আর সকলেই অবলীলাক্রমে দুই চারিটা পায়রা চাঁদা মৎস্য, তিন পোয়া মাংস ও বৃহৎ বৃহৎ ছানার জিলাপির সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিয়া পড়িল। বিজয়ও ভবিষ্যতে ঐরূপ খাইতে পারিবে বলিয়া অনেকে আশ্বাস দিল।

আহারান্তে সকলে বালুতটে ভ্রমণে বাহির হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলি ঝপাৎ ঝপাৎ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও হাওয়া লবণাক্ত জলবিন্দুতে পরিপূর্ণ। হাওয়ায় মানুষকে প্রায় উড়াইয়া লইয়া যায়। বিজয় ভাবিল, হাঁ, প্রকৃতি এখানে সত্যই জীবন্ত।

পরদিন সমুদ্র স্নানের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইল। অমর ও সত্যেন বেশ অবাধে ঢেউগুলিকে প্রায় তাচ্ছিল্য করিয়া পার হইয়া গেল। এক একটা ঢেউ আসে আর তাহারা হয় তাহার উপর ভাসিয়া উঠে নয় ডুব দিয়া তাহা ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির হয়। মধ্যে মধ্যে দূরে যাইয়া পড়িলে একটা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ঢেউয়ের সহিত সতেজে সাঁতার কাটিয়া তীরবেগে বালির উপর আসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

বিজয় প্রথমে দূরে বসিয়া ভাঙ্গা ঢেউয়ের জলে হাত পা ভিজাইয়া খেলা করিতে লাগিল। সে যদিও সন্তরণে পারদর্শী তবু এই উদ্দাম জলরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অমর ও সত্যেন হঠাৎ আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া গভীর জলে লইয়া গেল। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেই তাহারা বলিল, "ডুব দেও, ডুব দেও।" বিজয় মরিয়া হইয়া ডুব দিল। মাথার উপর দিয়া গভীর গর্জ্জনে শত শত মণ জল সেতু অতিক্রম নিরত রেলগাড়ীর মত সশব্দে চলিয়া গেল। তাহারা ভাসিয়া উঠিল। ঢেউটা শতধা বিভক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া বালু বক্ষে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর একটা করিয়া ঢেউ আসে আর সকলে তাহার সহিত যুদ্ধে মাতিয়া ওঠে। এই প্রকারে দুই ঘণ্টা কাল স্নান চলিল। শ্রান্তির সূচনা হইতে অমর বলিল, "চল, এ বেলার মত অনেক হয়েছে। খেয়ে দেয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবে চল, তারপর ও বেলায় আবার এসে নামা যাবে।

সকলে অঙ্গে তোয়ালে জড়াইয়া হোটেলে চলিল। সর্ব্বাঙ্গ জলের ঝাপটায় চিনচিন করিতেছিল। প্রত্যেক শিরা উপশিরা বাহিয়া রক্ত প্রবাহ সতেজে ছুটিয়াছে। সৃষ্টির জীবনীশক্তি যেন ঐ সমুদ্রবক্ষে ছিল। এই সব কৃত্রিম জীবনযাত্রার পথিকদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার স্পর্শে সজাগ হইয়া উঠিল। ক্ষুধাও তীব্র আক্রমণ প্রকোপে সকলের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল। নিয়মরক্ষার ক্ষুধা নহে। জাগ্রত সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা।

সমুদ্রের জোলো হাওয়ার একটা প্রধান কাজ মহিলাদিগের মাথার কাপড় উড়াইয়া দেওয়া। এই কারণে পুরীতে বহু পর্দ্দানসীন বাধ্য

হইয়া দক্ষিণী নারীদের মত অবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া ভ্রমণ করেন। বাংলার পুরুষ জাতির যে ইহাতে খুব বেশী অবনতি হইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহা সমুদ্রসৈকতে তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয় না। বরং মনে হয় তাঁহারা পবন দেবের এ কৌশলের সবিশেষ তারিফই করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগুণ্ঠন বিমুক্তা রমণী-দিগের মুখ শোভা দর্শনে এত ব্যস্ত থাকেন যে ঘটনাচক্রে ব্যতীত সমুদ্রের জল তাঁহাদের বড় একটা চোখেই পড়েনা।

পুরী পৌঁছাইবার দুই একদিন পরে বিজয়, অমর এবং হোটেল নিবাসী বিখ্যাত রসিক জর্জ্জ একদা ভ্রমণে বাহির হইল। জর্জ্জ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সন্তান, আসল নাম কি যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার নামটা কি করিয়া জর্জ্জ হইল এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলিত তাহার রংটা খুবই কালো বলিয়া তামাসা করিয়া তাহাকে ইংরেজের নাম দেওয়া হইয়াছিল; কেহ বলিত তাহার মাতুলের একটা পোষা ময়না ছিল, সেটা পূর্ব্বে এক মাতাল ফিরিঙ্গীর পোষ্য ছিল। উক্ত পক্ষী জর্জ্জের বাল্যকাল হইতেই তাহাতে নিজ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিপালকের নামে ডাকা আরম্ভ করে। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন ময়না নামটা বদলাইতে দিল না, তখন পরিবারের লোকেরা হতাশ হইয়া ময়নার কথাটাই মানিয়া লইলেন। জর্জ্জ নিজে বলিত তাহার পিতার একটি সখের আমড়া গাছ ছিল। একদা একটা কুঠার সংগ্রহ করিয়া সে ঐ আমড়া তরুটি নির্ম্মূল করে। পিতা প্রশ্ন করায় সে বুক ঠুকিয়া নাকি বলে যে প্রাণ যাইলেও সে মিথ্যা কথা বলিবে না; আমড়া বৃক্ষ আর কেহ কাটে নাই সেই কর্ত্তন করিয়াছে। পিতা তাহাকে এক টাকার সন্দেশ কিনিয়া খাইতে দিলেন এবং তাহার নাম সেই দিন হইতে দিলেন জর্জ্জ,

কেননা ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা মাত্র আর একবার ঘটিয়াছিল। সেবার আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা জর্জ্জ ওয়াশিংটন বালক অবস্থায় একটি বৃক্ষ নিপাত করিয়া ঠিক ঐ রূপ ভাবেই সত্যনিষ্ঠা দেখাইয়া চিরকালের মত সত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া যান।

তিনজনে চলিয়াছে। এক ব্যক্তি উল্টা দিক হইতে আসিতেছিল। তাহার চক্ষুমনপ্রাণ অদূরে পলাতকা অবগুণ্ঠনের সহিত যুদ্ধনিরতা এক মহিলার উপরেই পূর্ণরূপে নিবিষ্ট ছিল। অমর ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠিক ঐ ব্যক্তির পথে দাঁড়াইয়া গেল। সে অন্ধের মত আসিয়া অমরের সহিত ঠোক্কর খাইয়া চমকাইয়া থতমত খাইয়া জাগিয়া উঠিল। বলিল, "মাফ করবেন, আপনাকে দেখতে পাইনি।"

জর্জ্জ বলিল, "দাদা, চোখজোড়াকে এমন করে নয়ন করে তুলেছ ; গরীব আমরা যে মারা যাই। একেবারে নিছক সৌন্দর্য্য মদিরা ছাড়া নয়ন আর কিছুই পান করতে চান না, ত, অধম আমাদের দেখে কে ?"

অমর বলিল, "মশায় অচেনা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বেড়াতে চান বেড়ান, তবে একটু সামলে চলবেন।"

লোকটা মহা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "কিছু মনে করবেন না, দেখতে পাই নি।"

জর্জ্জ গান ধরিল,

"এসেছিলাম কাঠকুড়ুতে
কাঠ কুড়ান হ'ল না
লাজের কথা, বড়ই ব্যথা !
কাউকে সখী বলো না !

"এমন করে ঘুরনা ভাই, অপঘাত মৃত্যু হবে। ঐ সব মেয়েদের

পরিবারের লোক আছে, খানা খন্দ, ঢেউ, নৌকা কত কিছু আছে। চোখ দুটি সযত্নে সামলিয়ে রেখ ভাই; বড় কাজের জিনিস।"

লোকটা সমুদ্রসৈকত ত্যাগ করিয়া একেবারে সোজা সহরের দিকে চলিল গেল। অমর বলিল, "এই সব জানোয়ারদের জ্বালায় ভদ্র-লোকের মেয়েরা যে একটু স্বাধীনভাবে বেড়াবে তার জো নেই। এদের উপযুক্ত সাজা হচ্ছে খেতে ঘুমতে না দিয়ে জোর করে জাগিয়ে রেখে একটি খাঁচায় বন্ধ করে রাখা। আর সেই খাঁচার সামনে দিয়ে খালি মেয়েরা যাতায়াত করবে। চোখ বন্ধ করলেই সপাং করে এক চাবুক।"

জর্জ্জ বলিল, "লঘু পাপে গুরু দণ্ড দাদা! কি করবে বল? ভগবান এমন করে গড়েছেন আর মাথাগুলিও এমনই যে সাধ করে কোনও নারী যে কখন কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াবে এ আশা সুদূর পরাহত। তাই যতটা পারে দূর থেকে দেখে নেয়। গরীবের দোকান দেখে বেড়ানর মত। বুঝলে না?"

অমর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তুমি ত রোগের কারণ দেখাচ্ছ। আমি বলছি চিকিৎসার কথা।"

বিজয় মন্তব্য করিল, "যাই বল ভাই এ ব্যায়রাম সহুরে, কেননা গ্রামে এ সব দেখা যায় না। কেউ কারুকে চিনলে তার সঙ্গে কথা বলে, শুধু শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকা এ আমি খালি সহরেই দেখি।"

অমর বলিল, "ভদ্রতার প্রথম নিয়ম হচ্ছে এমন ভাবে চলাফেরা করা যাতে অন্য কারুর কোন অসুবিধা না হয়। যথার্থ ভদ্র সেই যে কখন কাজে, কথায় ও ব্যবহারে অপরের অসোয়াস্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আমাদের দেশে বহু লোক ভদ্রতার এই নিয়ম জীবনে কোন

সময়ই মেনে চলে না। এই মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা এর একটা চূড়ান্ত উদাহরণ। আপন মনে যার যা খুসী করবে; তোমার হাঁ করে তাকাবার কি অধিকার আছে?"

জর্জ্জ বলিল, "শাস্ত্রে আছে, চোখে যদি লাগে ভাল, কেন দেখব না...আ...আ...আ!"

অমর উত্তর দিল, "আর পায়ে যদি লাগে ভাল কেন মারব না? যা ভাল লাগবে তা যদি তুমি করতে পার ত অন্য লোকের তোমায় চাবুক লাগাতে কি দুট দাঁত ভেঙ্গে দিতে ভাল লাগতে পারে; তারাই কি এমন ভেসে এসেছে? তখন রাজী হবে ত?"

জর্জ্জ বলিল, "এসব কাব্যের কথা, ন্যায়শাস্ত্রের কচকচিতে এর বিচার হতে পারে না। কবির প্রাণ, সে কোন বাধা মানে না, তার আবেগ সৃষ্টির সব নিয়ম কানুন এক লাফে পার হয়ে কোথায় চলে যায়, তা তোমার মত কাঠখোট্টা লোকে কি বুঝবে?"

"লাফ যে দেয় তা বেশ বোঝা যায়। লাফ দেওয়াটা স্বভাবতই অল্পকষ্টেই পারে। কিন্তু কবির প্রাণ, ত বেশ, সব কবি একত্র হ পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে দিন কাটাক। মেয়ে কবিও ত আছে অনেক? কাব্যের ধাক্কায় আমরা সাধারণ লোকে কেন মারা পড়ি আর, তা ছাড়া, ঐ যে বনমানুষের মত লোকটা এখনি গালাগালি খে গেল, ওকে দেখলে কবি মনে হয় কি? সম্ভব রেলে টিকিট বিক্রি ক আর সমুদ্রের ধারে এসে ঘোরা ফেরা; এই কাজ। আহাম্মকের ম মুখ ব্যাদান করে মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকলেই মানুষ কবি হয়, না যত কবিত্ব মেয়েদের দেখলে। কেন সমুদ্র, আকাশ, সূর্য্য, তারা, গা ফুল, মাঠ, নদী, এরা কি দোষ করলে?"

"তুমি বন্ধু কাঠ গোঁয়ার বুঝবে না। একে কাব্যের একমুখী প্রতিভা বলে। এরা প্রকৃতির সব কিছু মধ্যে নারীর প্রকাশ দেখতে পায়। চামার যেমন জীবজন্তুর অপরাপর শারীরিক লক্ষণ উপেক্ষা করে খালি চামড়াটাই দেখতে পায়; এই জাতের ভাবুকরা শুধু নারীরূপের প্রতিবিম্ব মাত্রই চরাচর বিশ্বে প্রতিফলিত দেখতে পায়। যখন দেখতে পায় যে সর্ব্বত্রই নারীর কটাক্ষ, কেশপাশ, অঞ্চল, কুটিল হাসি, লীলায়িত গতি, মৃণাল বাহু, বঙ্কিম গ্রীবা, ও অন্যান্য নারীর হেন নয়ত নারীর তেন, তখন তুমি রাগ করিলে কি হবে? আমার এক বন্ধু আছে তার নাম কালু। কালু নাম হলে কি হবে; বুকভরা ভাব আর ব্যথা। সে এমন যে লাল পাগড়ী পাহারাওয়ালা দেখলেও মনে করে কার যেন সিঁথির সিঁদুর। পায়ে কাঁচা চামড়ার দেড় ফুট করে নাগরা জুতা; তাতে কি হয়েছে? 'হে সুন্দরী, অপূর্ব্ব ঐ সিন্দুর ছটা তোমার! ঐ চর্ম্ম মেখলা কেন? তুমি কি কিরাত কন্যা? হে সুন্দরী, দুই নৌকায় পা দিয়ে থেকনা' ইত্যাদি, বুঝলে? ভাব বড় কঠিন জিনিস। তোমার মত মারকুটে, মাথা গরম ছেলে ছোকরার জন্যে নয়। তোমার ওটি ত হৃদয় নয়, সেগুনের তক্তা!"

অমর বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে দূর! গাঁজাখোরের মত আবল তাবল বকে চলেছ! ও সব পাগলদের সব ভাব ঘা কতক পড়লেই ছুটে যাবে।"

এক জায়গায় কয়েকটা পোষা কুকুর মতদ্বৈধবশতঃ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মাতিয়াছে। অমর, বিজয় ও জর্জ্জ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কুকুরেরা যখন লড়াই করে তখন তাহাদের আগ্রহ দেখিলে মনে হয় যে এ যুদ্ধ শুধু মরণেই শেষ হইবে। কিন্তু তাহা নহে।

কিয়ৎকাল পরে তাহারা আবার নিশ্চিন্ত মনে পরস্পরের কথা ভুলিয়া আপন মনে চলিয়া যায়। একটা টেরীয়ার জাতীয় কুকুর একটা স্পানিয়েলের ডান পা খানা নিবিড় আবেগে কামড়াইয়া চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একটা দোআঁশলা কুকুর টেরীয়ারের কানটা কামড়াইয়া ধরিল। বিদ্যুৎগতিতে এ উহার উপর এবং ও ইহার উপরে নীচে গড়াইয়া, গর্জ্জাইয়া ও আর্ত্তনাদ করিয়া সে স্থলে সহস্র কুকুরের লড়াই চলিতেছে এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল। অমর প্রথমে একটা চক্রের বাহিরের দিকের কুকুরকে সরাইয়া লইয়া পিঠ চাপড়াইয়া স্বস্থানে পাঠাইয়া দিল। ক্রমে এক এক করিয়া সে সব কটাকেই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিয়া শান্তি স্থাপন করিল। অতঃপর তাহারা নিজ নিজ যুদ্ধলব্ধ ক্ষত লেহন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

জর্জ্জ বলিল, "তুমি বাবা কুকুরের লড়াই থামাবার ওঝা বল্লেই চলে! এ রকম যদি হিন্দু মুসলমান কি জাতীয় ঝগড়া থামাতে পারতে ত একটা নেতা হয়ে যেতে।"

অমর উত্তর দিল, "কুকুরেরা ত মতলব করে ঝগড়া করে না; তা ছাড়া আড়াল থেকে কেউ তাদের উস্কায় না। তা হলে কি আর রক্ষা থাকত? তারা ঝগড়া করে শুধু লড়বার জন্যে। আর মানুষ ঝগড়া করে বদ লোকের পরামর্শে; নয়ত অনেক দিনের পুষে রাখা শত্রুতার তাড়নায়।"

"তোমার এত অল্প বয়েস, এত জ্ঞান কি করে হল বলত?"

"আমরা বাড়ীতে প্রায়ই তর্কসভা করি! তার প্রেসিডেণ্ট আমার দাদামশায়। দাদা মহাশয়ের মতে সমস্ত ভারতবর্ষে সাচ্চা ধর্ম্মভাব খুব কম লোকেরই আছে। এ জন্যে অধার্ম্মিক লোকেরা খুব লজ্জিত আর

মনে মনে খুব ইচ্ছে যে সকলে তাদের ধার্ম্মিক বলে মেনে নেয়। ধার্ম্মিকের যথার্থ কর্ত্তব্য করা বদ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, আর খুবই কষ্টসাধ্য। তাই তারা নিজেদের স্বভাব রুচি ও অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করে 'ধর্ম্মের জন্যে করেছি' বলে চেঁচিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে তারা ধার্ম্মিক। এই যে ধর্ম্মযুদ্ধ বলে একটা কথা আছে এটা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত একটা অসম্ভব জিনিস। দাদু বলেন ঐ হিসাবে মানুষ ধর্ম্মচুরী, ধর্ম্মডাকাতি, ধর্ম্মমিথ্যা কিম্বা ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বলে কয়েকটা নাম তৈরী করে নিলেই পৃথিবীর সব পাপী পুণ্যবান বলে চালু হয়ে যাবে।"

জর্জ্জ বলিল, "এই ঠগীরা যেমন ধর্ম্মের খাতিরে লোকের গলায় ফাঁস লাগাত আর কি? তবু শুধু ধর্ম্মের জন্য কেন? দেশের জন্যেও ত ঐ রকম অনেক মিথ্যে, ভণ্ডামী আর জুয়াচুরী আজকাল খুব চলছে।"

বিজয় বলিল, "যেমন সুদর্শন বোসের স্ট্রাইক।" জর্জ্জ পূর্ব্বেই সুদর্শনের খ্যাতির কাহিনী শুনিয়াছিল; তাই নূতন করিয়া সে আর শুনিতে চাহিল না। "কলকাতায় গিয়ে তোমার দাদুর সঙ্গে দেখছি আলাপ করতে হবে। আজকাল দুনিয়ার সব লোকই এত হাস্যকর হয়ে উঠেছে যে আমার লোক হাসিয়ে আর পদমর্য্যাদা রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে। অন্য কোন রাস্তায় চলতে হবে। ইতিহাসে প্রথমে বিখ্যাত লোকেরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে কাঁদিয়ে নাম কিনত। তারপর এল হাসিয়ে 'পপুলার' হবার যুগ। এখন যে কি হবে বলা যায় না।"

"কেন? লোক নাচানর যুগ এটা তা জাননা? লোক নাচাতে শেখ।"

সকলে অতঃপর হোটেলে ফিরিয়া চলিল। কয়েকদিন পরে একদিন সমুদ্রের ধারে বিজয়, অমর, সত্যেন প্রভৃতি বেড়াইতে বেড়াইতে

অধ্যাপক গুহ ও তাঁহার কন্যাকে দেখিল। নমস্কার করিতে গুহ মহাশয় বলিলেন, "এই যে বাবা, তোমরা সব কেমন আছ? আমি এক বন্ধুর বাড়ীতে রয়েছি, তাই তোমাদের ডাকতে পারি নি।" সকলে বলিল, "আজ্ঞে না, তাতে কি হয়েছে? আমরা সারাদিন নানান হুজুগে মেতে থাকি, আর এখন দলে আরও ভারি হয়েছি, বিজয় আসাতে। আপনারা ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ, স্বাস্থ্য ভাল মনে হচ্ছে। তবে ঐ ভরসা করে ঢেউয়ের ধাক্কায় নামতে পারি না। অমিয়া বন্ধুদের সঙ্গে নুলীয়া নিয়ে স্নান করে রোজ, তার বেশ ভাল লাগছে।" অমিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনাদের মত আমরা অত দূরে যাই না। সেদিন দেখছিলাম অমরবাবু খুব তিন চার লাইন ব্রেকার পার হয়ে রেস দিচ্ছেন।" গুহ মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও রকম করোনা বাবা! এখানকার 'কারেণ্ট' বড় খারাপ। শুনেছি টেনে নিয়ে যায় একেবারে।" অমর লজ্জা পাইয়া বলিল, "না, কোথায় 'কারেণ্ট'? আর আমি অত দূরে যাই না। বেশ অনায়াসে ওর ডবল দূরে যাওয়া যায়।" অধ্যাপক মহাশয় উপদেশ দিলেন, "থাক আর বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। যা যাও সেই ঢের।"

সত্যেন প্রস্তাব করিল, "স্যার, আমরা ভাবছি একদিন কোনারকের মন্দির দেখতে যাব। ট্যাক্সি করে যাওয়া যায় মন্দিরের প্রায় খুব কাছ অবধি। আপনি আর মিস গুহ যাবেন কি? তা হ'লে ব্যবস্থা করতে পারি।"

অমিয়া খুব খুসী হইয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা, চল! আমার কোনারক দেখবার খুব ইচ্ছে। শুনেছি ভারতবর্ষের মধ্যে কোনারকের মন্দির একটা দেখবার মত জিনিস।"

গুহ মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা তা বেশ, কবে যাবে ?"

"আপনাকে জানাব যাবার একদিন আগেই।" কোনারক যাত্রার দিন দুইখানা ট্যাক্সির সহিত ব্যবস্থা হইল। একখানায় অধ্যাপক গুহ, অমিয়া এবং অমিয়ার এক বন্ধু মিস বোস। ড্রাইভারের পাশে বসিল অমর। অন্য গাড়ীতে সত্যেন, বিজয়, জর্জ্জ ও গুহ মহাশয়ের এক ভক্ত, সাধুবাবু। প্রায় ঘণ্টাধিক অতিবাহিত হইলে পর কোনারকের নিকটে এক গ্রামে আসিয়া গাড়ী থামিল। এখান হইতে মন্দির অবধি বালিতে ঢাকা, মোটরগাড়ী চলেনা। সকলে নামিয়া একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে গুহ মহাশয় ও সাধুবাবুকে তুলিয়া দিয়া পদব্রজে বালি ভাঙ্গিয়া মন্দির পথে অগ্রসর হইলেন। খাবারের বাক্স ও জলের কুঁজা প্রভৃতি গুহ মহাশয়ের সহিত গোযানে চলিল।

বালির উপর দিয়া হণ্টন দ্বিগুণ পরিশ্রমের কাজ। শক্ত মাটিতে চলা যেরূপ অবাধে হয়, বালিতে ক্রমাগত পা বসিয়া যায় বলিয়া চলা সহজসাধ্য নহে। অমিয়া ও মিস বোস প্রথমে খুব হাসিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেও অর্দ্ধেক পথ শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে হাসি মিলাইয়া গিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে কষ্টের ছায়ায় মুখশ্রী মলিন হইয়া উঠিল। সত্যেন বারম্বার বলিতে লাগিল, "আপনারা গাড়ীতে উঠিয়া পড়ুন। আরও প্রায় আধ মাইল পথ বাকি আছে।" কিন্তু দুই তরুণী পণ করিয়াছিলেন যে যুবকদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন না। কষ্ট হইলেও তাঁহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বলে বলীয়ান হইয়া ক্রমশঃ বালুকা সাগর উত্তীর্ণ হইয়া মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ স্থলে বালি অনেকটা কম এবং সম্মুখে মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কষ্টের কথা সকলে নিমেষে ভুলিয়া গেলেন।

কোনারকের সূর্য্য মন্দির খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। যে শিল্প প্রেরণা মহাবল্লিপুরম, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, ইলোরা প্রভৃতি বিশ্ব বিখ্যাত মন্দির স্থাপত্যে বর্ত্তমান; কোনারকের সূর্য্য মন্দিরে সেই প্রেরণাই যেন চরম উৎকর্ষে পৌছিয়াছে। যে মহাশিল্পী এই অপরূপ মন্দির কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া, প্রস্তরে সে কল্পনাকে বাস্তব করিয়া তোলেন, তাঁহার রূপ সাধনা ধন্য! পুষ্পে, পত্রে, বৃক্ষে, বেলাভূমিতে, জলতরঙ্গে, প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে যে রূপের প্রকাশ দেখিয়া মানব মন বিমুগ্ধ, এ যেন তাহারই আর এক অভিব্যক্তি। প্রস্তর যেন হোমাগ্নি শিখার মত দেবতার চরণচুম্বন আশায় উর্দ্ধগামী। সে গতির ভিতর কোন আড়ষ্ট ভাব নাই; সুলিখিত কাব্যের ন্যায় তাহা সহজ গতিতে লীলায়িত। অমিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "কি সুন্দর! কোথাও একটু বাড়াবাড়ি নেই, জড়তা নেই, দেখতে বাধা নেই। যেন খোলা হাওয়ায় ভেসে রয়েছে!" অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "গঠনের খুব কৌশল দেখা যায়। পাথরে গড়তে হলে কি করে গড়তে হবে শিল্পী তা ঠিক বুঝেছিলেন। একে বলে মানানসই করে তৈরী করা। ধাতু নির্ম্মিত বস্তু যে ভাবে গড়া যায়, কাঠ বা পাথরে ঠিক সে রকম সম্ভব নয়। তাই কারিগর এক এক রকম জিনিস এক এক ভাবে গড়েন। কার্পাসের সূতাতে যা হয় রেশমে তা হয় না; পাথরে যা হয় কাঠে তা সম্ভব নয়। এখানে পাথরের মধ্যে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; অথচ শিল্পী বরাবর মনে রেখেছেন যে তিনি পাথর নিয়ে কাজ করছেন। তুলি দিয়ে ছবি আঁকা আর ছেনি দিয়ে পাথরের ছবি গড়া এক কাজ নয়।"

অমিয়া বলিল, "যেমন পশমের ছবি। কোন মাথা মুণ্ডু নেই। যা

খুসী তাই রং, যেমন ইচ্ছে তেমন চেহারা ; অথচ মেনে নিতে হবে যে এটা গোলাপ ফুল আর ওটা বাঘ কিম্বা হাতি।"

অধ্যাপক বলিলেন, "শিল্প চেষ্টা যাতে ব্যর্থ না হয়ে যায় তার জন্যে শিল্পীর বোঝা দরকার যে তার হাতের হাতিয়ার আর মাল মশলা দিয়ে কতদূর কি করা সম্ভব। অসম্ভব চেষ্টা না করে, সৌন্দর্য্য ও ভাব বজায় রেখে নক্সা বদল করে কার্য্য সিদ্ধি করতে হয়। হাতুড়ি ঠুকে তামার উপর যে ফুল ফোটান সম্ভব তার পাপড়ি, গাছের ফুল সূচিকার্য্যের ফুল কিম্বা তুলি দিয়ে আঁকা ফুলের নিছক অনুকরণ হতে পারে না। হাতুড়ি ব্যবহারী শিল্পীকে সৌন্দর্য্য ও রূপ বজায় রেখে নিজের মত ফুল কল্পনা করে নিতে হবে। যদি পারে তা হলেই সে শিল্পী। নয়ত তার শিল্প ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।"

চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া সকলে এক জায়গায় বসিয়া জলযোগ করিয়া লইলেন। অমিয়া মন্দির ছাড়িয়া যাইতে চায় না। ক্রমাগত এক একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়া বলে, "এখানে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিলেও একঘেয়ে লাগবে না। কত লোক কতদিন ধরে এত পাথর কেটে এমন করে সাজিয়ে বসিয়েছে তার ঠিকানা নেই।"

অমর এতক্ষণে মুখ খুলিল, "ভারতবর্ষের এ সব লোক হঠাৎ কি করে শেষ হয়ে গেল? এতবড় কাজ যারা নিখুঁত ভাবে করেছে, তাদের সন্তানরাই শেষকালে অলি গলিতে ফাঁকিবাজি করে নিম্নস্তরের জীবের মত কাল কাটাচ্ছে? ভাবলে লজ্জাও হয় বিশ্বাসও হয় না।"

জর্জ্জ বলিল, "ইভোলিউশন', অর্থাৎ ক্রমবিকাশ। আমার একটা ধারণা আছে যে বাঁদর মানুষের পরবর্ত্তী জীব, পুর্ব্ব পুরুষ নয়। ব্যবহারে সব কিছুই ক্ষয়ে যায়, মানুষেরও রূপ, গুণ ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষে

বাঁদরে দাঁড়িয়েছে। আমরাও ক্ষয়ে যাচ্ছি। ক্রমশঃ ক্ষয় হতে হতে বেঁটে খাট শাখামৃগ হয়ে দাঁড়াব। এত কথা আর কবিত্বের পরিণামে শুধু ঐ বাঁদুরে ভেংচিটুকুই রয়ে যাবে।"

অমিয়া হাসিয়া উঠিল, "আপনার কল্পনা খুব উদ্ভট। আপনাকে একটা মন্দির গড়তে বললে কি করতেন?"

"স্রেফ একটা গম্বুজ। প্রকাণ্ড, মাটির থেকে সোজা তুলে দিতাম। দরজা, জানালা, সুড়ঙ্গ, কিছু না। ঢোকবার কোন রাস্তাই রাখতাম না। বিরাট এক গম্বুজ, যেন একটা রাক্ষুসে জামবাটি উল্টে রাখা হয়েছে। খুব 'পপুলার' হত।"

"পপুলার হত কি করে? ভিতরে যাবার রাস্তা নেই, দেব দর্শনের ব্যবস্থা নেই; লোকে যেতই না আপনার মন্দিরে।"

"খুব যেত, ওদের ঘাড় যেত! রাষ্ট্র করে দিতাম যে যথার্থ ভক্ত মাত্রেই যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করে তখন একটা দরজা খুলে যায় এবং দেবদর্শন হয়। পাপী আর অবিশ্বাসীদের জন্যে দরজা খোলে না। দেখতেন সব লোকে এসে এক পাক দু পাক একশ পাক ঘুরে যেত আর বাড়ী গিয়ে বলত, 'একটা সোনার কপাট হঠাৎ খুলে গেল আর ভিতরে গিয়ে দেখলাম আরতি হচ্ছে; আর সে কি আরতি! এমন আর কোথাও দেখিনি'।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। অমিয়া বলিল, "আপনি দেখছি মানুষের মনের খুব খোঁজ রাখেন? আপনার মতে সব লোকই মিথ্যা বলে, না?"

"আজ্ঞে না, সকলেই বলে, তা নয়। অনেক মূর্খ আছে তারা ঠিক মত বলে উঠতে পারে না। দুই একজন আছে ভয়ে বলে না।

শুনেছি এমন লোকও আছেন যাঁরা, পারলেও বলেন না। তবে 'মেজরিটি কমিউনিটি' নিয়েই ত ব্যবস্থা করতে হবে, ঠিক কি না?"

সকলে পুনর্ব্বার হাস্য করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "এইবার সব ফিরতে আরম্ভ কর। নয়ত অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে।"

অমিয়া এবং মিস বোস এবার সৎপরামর্শ মানিয়া লইয়া গো যানে আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই যেখানে মোটর গাড়ীগুলি ছিল সেখানে আসিয়া সকলে পুনর্ব্বার পুরীর পথে চলিলেন। অমর জিজ্ঞাসা করিল, "মিস গুহ, কেমন লাগল?" অমিয়া বলিল, "খুব ভাল। এমন যে মন্দির আছে তা জানতাম না। এখানে পূজা হয় না কেন?"

"বহুশত বৎসর বালিতে ঢাকা ছিল। সূর্য্যের পূজা বোধহয় অন্ধকারের যুগ আরম্ভ হওয়াতে কেউ বিধান দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে থাকবে?"

গাড়ী পুরী পৌঁছাইলে সকলে নিজ নিজ গৃহ ও হোটেলের পথে চলিয়া গেলেন।

পুরীর একটা বড় রকম উপভোগের জিনিষ বালির উপর চিৎ হইয়া হইয়া শুইয়া থাকা। মধ্যে মধ্যে সাঁতার ও তৎপরে আকাশ অবলোকন মুদ্রায় বিশ্রাম। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। আকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকার সুবিধা এই যে ইহাতে পৃথিবীর কদর্য্যতা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টির বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে জীবের জীবন সুদূরতম অতীতে কোন এক সময় আকাশ পথে আলোক রশ্মি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ

হয়। সেই দিন জীবনের স্পর্শে প্রথমে কোন একটা নির্জ্জীব কিছু নড়িয়া উঠিল। তারপর ক্রমবিকাশের ধাক্কায় প্রাণীগণ একে একে ধরার বক্ষে দেখা দিতে সুরু করিল। প্রবাসে মানুষ যেমন দেশের দিকে কখন কখন মুখ ফিরাইয়া কোন এক অবর্ণনীয় আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে, আকাশের দিকে চাহিয়া মানুষ সম্ভবতঃ ঐ রকমই একটা আবেগ অনুভব করে। প্রাণের জন্মভূমি ঐ অনন্ত আকাশের কোন্ কোণে লুকান আছে কে জানে? হয়ত প্রাণ ইথারের পরপারে সীমাহীন আকাশের এক প্রান্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, গুরুত্ব, প্রভৃতি সকল গুণ বর্জ্জিত নিবিড়তায় জমাট হইয়া আছে। রেডিয়ামের বিকীর্ণ শক্তির ন্যায় সে প্রাণশক্তি যুগে যুগে অনন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অথচ তাহার ক্ষয় নাই। তাই মানুষ আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ভাবে, "ঐ পথেই ঘরে ফিরে যেতে হবে।" পরিষ্কার এই ভাবেই কথাটা মনে জাগ্রত না হইলেও একটা আহ্বান ও আকর্ষণ সে অনুভব করে সন্দেহ নাই।

অমর, সত্যেন ও বিজয় চিৎ হইয়া পাশাপাশি বালুতটে শায়িত। কথা নাই, শব্দ নাই শুধু শ্বাস গ্রহণের চিহ্নরূপে বক্ষের উপর একটা ঈষৎ আন্দোলন। হঠাৎ একটা কলরব শুনিয়া তিন জনে এক কালীন উঠিয়া বসিল। দেখিল জলের ধারে কয়েকজন লোক উন্মাদের ন্যায় লাফালাফি করিতেছে। "গেল, গেল, কে আছ, বাঁচাও!"—ইত্যাদি শব্দে শত কণ্ঠ মুখর। অমর দেখিল প্রথম সারি ঢেউয়ের ওপারে, যেখানে জল অপেক্ষাকৃত গভীর মন্দগতি, সেইস্থলে একটা শাড়ীর মত কি ভাসিতেছে, ডুবিতেছে। একটা হাত নড়িল বলিয়া মনে হইল। সে এক দৌড়ে জলের ধারে আসিয়া একটা প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মধ্য

দিয়া ডুব দিয়া সেইদিকে সাঁতার দিয়া চলিল। বিজয় ও সত্যেন কিছু না বুঝিলেও বন্ধুর পশ্চাতে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইল। আধ মিনিটের মধ্যেই অমর সেই বস্ত্রখণ্ড লক্ষ্য করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া পড়িল। দেখিল দীর্ঘ কেশপাশ ও শাড়ীর আঁচল। সে দ্রুতগতি ডুব দিয়া অর্দ্ধ নিমগ্ন সেই নারীর নীচে চলিয়া গেল। তৎপরে সাবধানে তাহার মাথার পিছনে হাত চালাইয়া ঘাড়ের কাছে ধরিয়া নিজে চীৎ হইয়া ভাসিয়া উঠিল। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ অদূরে যেন শিকার ফসকাইয়া যায় এইভাবে গর্জ্জাইতে আরম্ভ করিল। অমরের উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। এ অবস্থায় ডুব দেওয়াও চলে না এবং ডুব না দিলে ঢেউটা উপরে আসিয়া পড়িলে কি হইবে কে জানে। সে স্থির করিল ডুব দিয়া দেখিবে পারা যায় কি না। ঢেউটা আর মাত্র অল্প দূরে এমন সময় অমর দেখিল তাহার দুই বন্ধু তাহার পার্শ্বে উপস্থিত। একবার শুধু চীৎকার করিয়া বলিল, "সত্যেন ও পাশে ধর; বিজয় পায়ের দিকে। জোরে সাঁতার দেবে ঢেউটা এলেই।"

প্রবল গর্জ্জনে ঢেউটা আসিয়া পড়িল। অর্দ্ধ অচেতন নারীদেহ এক হাতে ধরিয়া অমর ও সত্যেন লাফ দিয়া ঢেউয়ের উপরে উঠিয়া জলে মাথা ডুবাইয়া প্রাণপণে জল টানিতে লাগিল। পিছন হইতে বিজয় যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হঠাৎ সকলে সদ্য জ্যা-মুক্ত তীরের মত ঢেউটার সহিত ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা বালির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

সত্য কথা বলিতে গেলে স্ত্রীলোকটি যে প্রাণে বাঁচিল তাহা একান্তই ঘটনাচক্রে। তাহার অবস্থা খুবই খারাপ এবং আর দুই এক মিনিট জলে থাকিলেই শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যাইত। ঢেউয়ের

উপর দ্রুতবেগে ভাসিয়া আসায় তাহার তখনও ধুক ধুক করিয়া একটু প্রাণের আভাস বুকে জাগিয়া ছিল। একজন ডাক্তার জুটিয়া গেল। কিছুক্ষণ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালাইলে পর স্ত্রীলোকটি চোখ খুলিল। তাহার স্বামী পাগলের মত খালি ছোটাছুটি করিতেছিল। হঠাৎ একটা জলের টানে পত্নী নাগালের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই সে একই ভাবে উন্মত্তের ন্যায় ঘোরাফেরা করিতেছিল। এখন সে একবার অমরের পা জড়াইয়া বলে, "আপনি ওকে ফিরিয়ে এনেছেন; আপনাকে আমি কি করে জানাব আমার কি উপকার করেছেন! ও আমার একমাত্র জীবনের আশ্রয়। ছেলে নেই মেয়ে নেই শুধু ওকে নিয়েই আমি সব দুঃখকে সুখ মনে করে বেঁচে আছি। কেন যে এসেছিলাম সমুদ্রে স্নান করতে" ইত্যাদি। অমর অপ্রস্তুত হইয়া, "আহা, তা কি এমন একটা বড় কাজ করা হল; অমন করছেন কেন? জলে ডুবে যাচ্ছে দেখলে তুলে আনবার চেষ্টা ত সকলেই করে," প্রভৃতি বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বালু তটের জনতা তাহাকে ছাড়িবে না বলিয়া মনস্থ করিল। সকলে অমর ও তাহার দুই বন্ধুকে লইয়া এমন একটা প্রশংসা সভা আরম্ভ করিল যে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ লোক জমিতে আরম্ভ করিল। সকলে জিজ্ঞাসা করে, "কি হয়েছে, ব্যাপার কি? এত ভীড় কেন?" জবাব হয় "একজন মহিলা জলে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। এক যুবক ও তাহার দুই বন্ধু তাঁহাকে বাঁচাইয়াছে।" প্রশ্ন হয় "কে, কে?" সকলে অমর সত্যেন ও বিজয়কে দেখাইয়া দেয়। মহা হট্টগোল। অমর লজ্জায় লাল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; পলাইবার পথ নাই। সত্যেন ও বিজয় বলিল, "ভাল উৎপাতের মধ্যে

ফেল্‌লে বাবা ; এবার গলায় মালা দিয়ে রাস্তা ধরে 'মার্চ্চ', করাতে সুরু না করে !"

অমর বলিল, "কি করব ; এমন জানলে যেতাম না।" স্ত্রীলোকটির জ্ঞান হইলে তিনিও অমরের পদযুগল লক্ষ্য করিয়া ডুব দিলেন। অমর একলাফে সরিয়া গিয়া, "কি করেন, কি করেন !" বলিয়া কোন মতে বাঁচিয়া গেল। কিন্তু এমন সময় বিষয়টা চূড়ান্তে পৌছিয়া গেল। "এত ভীড় কেন, কি হয়েছে ?" বলিয়া অধ্যাপক গুহ ও তাঁহার কন্যা অমিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমবেত সকলে তাঁহাদিগকে খবর দিল যে তিনজন যুবক এক স্ত্রীলোককে সলিল সমাধি হইতে উঠাইয়া আনিয়াছে। তাঁহারা ঘাড় উঁচাইয়া কষ্ট করিয়া এই যুবক দিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "আরে তোমরা ! কি হয়েছিল ? কেমন করে হ'ল ? কি ব্যাপার।" অমর অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রায় দোষ স্বীকার করার মত করিয়া বলিয়া গেল যে ভদ্রমহিলা স্রোতের টানে ভাসিয়া যাওয়ায় তাহারা তিন জনে তাঁহাকে টানিয়া তীরে লইয়া আসিয়াছে। বিজয় এই সময় বলিয়া বসিল, "আমি আর সত্যেন তেমন কিছু করিনি, ঐ অমরই আসলে ওঁকে বাঁচিয়েছে।"

অমিয়ার মুখ চোখ একটা অস্বাভাবিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "অমর বাবু, আপনি দেখছি খুব সাহসী। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে পরের প্রাণ বাঁচান।" অমর থতমত হইয়া বলিল, "সাহস না ছাই ! ও রকম তুলে আনতে আবার সাহসের দরকার হয় না কি ? দিব্যি অনায়াসে তুলে আনা যায়।"

অমিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমরা যখন স্নান করি, আপনাকে কাছে কাছে রাখলে ভাল হয় দেখছি।"

অমর লজ্জায় লাল হইয়া বলিল," আপনি ঠাট্টা করছেন! এ দেখছি মহা মুস্কিল হল। এর পরে কেউ জলে ডুবলে তার ত্রিসীমানায় যাব না।"

অমিয়া গম্ভীর হইয়া গেল, "না ঠাট্টা মোটেই করছি না। খুবই আনন্দের সঙ্গে বলছি যে আপনার কাজে আমরা গর্ব্ব অনুভব করছি।" গুহ মহাশয় বলিলেন, "ঠাট্টা আবার কি? এ রকম কাজ কজনে করে? তুমি আমাদের কলেজের সম্মান রক্ষা করেছ। ভগবান তোমায় বড় করবেন।"

বহুকষ্টে সমবেত জনতার প্রশংসা ও অভিনন্দনের ধাক্কা সামলাইয়া তিনজনে হোটেলে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের খ্যাতি কিন্তু তাহাদের আগেই হোটেলে পৌছিয়া গিয়াছিল এবং সকলে মিলিয়া সাগর-সৈকতের প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পুনরাবৃত্তি করিয়া তিন যুবককে আর এক পালা বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

দুই তিন দিন এই রকম চলিল। তাহাদের প্রায় বেড়ান, স্নান করা সব বন্ধ। সর্ব্বত্র লোকে বলে, "ঐ যে, ঐ তিনজন, ওরাই বাঁচিয়ে ছিল।"

যে ব্যক্তির পত্নীকে বাঁচান হইয়াছিল তাহার বয়স প্রায় ষাট। পত্নীর বয়সও পঞ্চাশের উপরে। সে কলিকাতায় একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। আজন্ম কুড়ি পঁচিশ টাকার চাকুরী করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তীর্থ করিতে আসিয়া এই বিপদ। তাহার কৃতজ্ঞতার বন্যায় অমর ভাসিয়া যাইবার জোগাড় হইল। এক ঝুড়ি আম ও আর কি সব খাদ্য সম্ভার লইয়া সে হোটেলে উপস্থিত হইল। তাহার সে অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করা নবীন যুবক অমরের পক্ষে অসম্ভব হইল। সে যে

স্বয়ং জগন্নাথের অবতার এ বিশ্বাস বৃদ্ধের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। পারিলে তাহাকে পুজা করে। জর্জ্জ বলিল, "বাবা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে চুপচাপ থাক না। আমরা ভক্ত পূজারীরা সব ব্যবস্থা ঠিক করে নিচ্ছি।" ব্যবস্থা ঠিক হইল; অর্থাৎ সে সকল খাদ্যসামগ্রী জর্জ্জ প্রমুখ যুবকেরা অবাধে উদরসাৎ করিল। অমর বলিল, "পুরী ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি। এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।"

ক্রমশঃ ছুটিও ফুরাইয়া আসিল। বিজয় একদিন বাক্স গুছাইয়া গ্রামের দিকে রওয়ানা হইল। তাহার পরিবারের লোকেরা কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে আর একবার গ্রামে ঘুরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া পত্র দিয়াছেন। অমর ও সত্যেন বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতার পথে যাত্রা করিল। অমর তাহার মাতার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে, "তুমি একজন মহিলার প্রাণ বাঁচাইয়াছ শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমার অনেক পুণ্যে তুমি তোমার পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়াছ," ইত্যাদি। অমর সত্যেনকে বলিল, "পাগলামির হাওয়া অনেক দূরে পৌছেছে। পোড়া দেশে সাধারণ মনুষ্যত্বের দাবী রাখাও মুস্কিল। অমনি হাজার খানেক লোক জুটে হাল্লা করে, মাথা খারাপ করে তুলবে। কি এমন একটা মহা কাজ। আমি ডুবলেও তোমরা গিয়ে তুলতে না কি? ভাল বিপদেই পড়েছি।"

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াও অমর নিষ্কৃতি পাইল না। সে যে কত বড় একটা কাজ করিয়াছে তাহার বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া তাহার

প্রায় নিজেরই বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে তাহার প্রাণ বিশেষ রকম বিপন্ন করিয়া সে ঐ স্ত্রীলোকটির জীবন বাঁচাইয়াছে! কেহ বলিল আধ মাইল দূর হইতে টানিয়া আনিয়াছিল, কেহ বলিল এক মাইল, কেহ বা তিন মাইল। অমর বলিল, "হ্যাঁ দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল, আমি প্রায় সাতাত্তর দিন ও সাতাত্তর রাত সাঁতার কেটে ওকে তুলে আনলাম। ক্যাপ্টেন স্কটের পরে অতদূর আর কেউ যেতে পারে নি।"

সত্যেন বলিল, "বাবা, খ্যাতির বিড়ম্বনা, বুঝেছ? এর পর দেশ-রক্ষক বা অমনি একটা কিছু খেতাব জুটে গেল বলে!"

অমর হাত দুইটা উল্টাইয়া বলিল, "নসিবে যা আছে! আর পারা যায় না!"

(৯)

অধ্যাপক গুহ একদিন তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ষ্ট্রাইক ভাঙ্গিয়া যাইবার পর হইতেই তাঁহার অমর ও তাহার বন্ধু বান্ধব দিগকে একদিন খাওয়াইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আগেকার ছোট বাড়ীখানায় কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ায় একটা বড় রকম বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। এখানে দুইটা বড় ঘর ও বারান্দা আছে। তদ্ব্যতীত আরও তিনটা ঘর আছে। সুতরাং এখানে পনের কুড়িজন যুবককে অনায়াসে বসাইয়া খাওয়ান চলে।

সকলে খাইতে বসিলে ঠাকুর ও অমিয়া পরিবেশন করিতে লাগি-লেন। অমর ও বিজয় পাশাপাশি বসিয়াছিল। অমিয়া তাহাদের

ভর্জ্জিত মৎস্য কিছু অধিক পরিমাণে দেওয়াতে অমর আপত্তি করিয়া উঠিল, "এত খেলে মারা পড়ব দেখুন ; আর দেবেন না।"

অমিয়া বলিল, "আপনার মত যোদ্ধা লোকের ও সব কথা শোভা পায় না। মানুষ ত শুনেছি না খেয়েই মারা যায়। খেয়ে আবার কে কবে মরে ?" "ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'ডিগিং ওয়ানস গ্রেভ উইথ দি টিথ' অর্থাৎ দাঁত দিয়ে নিজের কবর খোঁড়া। তার মানে অনেকেই বেশী খেয়ে মরে।" "উপস্থিত ক্ষেত্রে মাছ ভাজা কখানা খেয়ে ফেলুন ত ! স্বদেশী মাছ খাবার জন্যে ইংরেজী নজিরের কোন দরকার নেই। ইংরেজরা কি বলে তার খোঁজে আমার দরকার নেই। আপনি সমুদ্র তোলপাড় করে সাঁতার দিতে পারেন আর দুখানা মাছ খেতে পারেন না ?"

সমুদ্রের নাম করিলেই অমর আজকাল চুপ করিয়া যাইত ; ভয় পাছে কেহ সেই জল থেকে টেনে তোলার কথাটা পেড়ে বসে ; সে তাই আর কথাটি না বলিয়া মৎস্যে মনোযোগ দিল। এরপর বিভিন্ন প্রকার খাদ্য একের পর এক করিয়া খাইতে সুরু করিল। বাহান্ন ব্যাঞ্জন কথাটা একেবারে কল্পনা যে নহে তাহা প্রায় প্রমাণ হইয়া গেল এবং খাইয়ের দল পরাজিত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সোনার বাংলায় নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রকের দ্বন্দ্বের এত সহজে নিষ্পত্তি হয় না। যতক্ষণ ভোক্তারা একেবারে বিধ্বস্ত না হইয়া যায় ততক্ষণ পাত্রে খাদ্য নিক্ষেপ অক্লান্ত নির্ম্মমতার সহিত চালাইয়া চলা হয়। আধুনিক যুগে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া দেশবাসী অপরাপর ক্ষেত্রে যুদ্ধ স্পৃহার নিবৃত্তি চেষ্টা করেন। কোথাও বাক্য যুদ্ধ চলে, কোথাও বা ভদ্রতা করিয়া পরস্পরের পাগল করিয়া তুলিবার চেষ্টা হয়। নিমন্ত্রক

ও নিমন্ত্রিতের যুদ্ধ, ক্রেতা ও বিক্রেতার যুদ্ধ, কন্যা ও বর পক্ষের বর্ব্বর আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ, প্রভৃতি ছদ্মবেশী সমরাকাঙ্ক্ষার বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র ; মনে হয় যে সত্য সত্যই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলে মানুষ স্বাভাবিক ব্যবহারে পূর্ণানন্দ লাভ করিবে এবং সামাজিক জীবনেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ছেলেরা গুরুভোজনান্তে আই ঢাই করিতে করিতে গৃহে গমন করিলে পর অমিয়া নরেন গুহ মহাশয়কে বলিল, "এরা অনেক খাবার ফেল্‌ল। সব যেন মেয়েদের মত খায়।"

গুহ মহাশয় বলিলেন, "তুমিও মা খুব বেশী বেশী ব্যবস্থা করেছিলে। অত কি কেউ খেতে পারে ?"

"হ্যাঁ বেশী আবার কি ? এরা সব প্রফেসরের বাড়ী বলে লজ্জা করে খেলনা। নয়ত খাবারে কম পড়ে যেত দেখতে।"

পিতা হইলেও গুহ মহাশয় কন্যাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি আর তর্কটা বাড়িতে দেওয়া সুবুদ্ধির কথা বলিয়া মনে করিলেন না। বলিলেন, "তা হবে! আমার সব ত চোখে পড়ে না। তা লজ্জা করবার কি আছে ? প্রফেসর যখন ডেকেছেন খাবার জন্যে ত ভাল করে খেলে দোষ কি হত ?"

অমিয়া বলিল, "আমার কলেজের মেয়েদের একদিন ডাকব খেতে। দেখ এখন তারা এদের চেয়ে বেশী খাবে ত কম নয়। খায়না বলেই সব চেহারা রোগা রোগা। মনে হয় ফুঁ দিলে উড়ে যাবে।"

"না কিন্তু আজকাল অনেক ছেলে ব্যায়াম ট্যায়াম করে বেশ সুন্দর শরীর গড়ে তুলছে। আমাদের যৌবন কালে এ রকম ছিল না।"

"ও ঐ দুই চারজন। বাকি সব খালি কথা বলে আর কোন রকমে পরীক্ষার সময় কলমটা শক্ত করে ধরে লিখে যায়। আমার মনে হয়না

যে শতকরা দশজন ছেলেরও আজকাল ঠিক মত খেয়ে হজম করবার ক্ষমতা আছে।"

লেডি ক্যানিং কলেজের ছাত্রীরা সকলে মিলিয়া প্রায়ই কমন রুমে সভা করে। তাহাদের সভার একটা বিশেষত্ব যে তর্ক আলোচনা ও উচ্ছ্বাসের কথা সবই উচ্চারিত হয়, শ্রুত বড় একটা হয় না। কারণ সকলেই এক সঙ্গে কথা বলে, কাহারও কথা অপরে শুনিল না বলিয়া কেহ কোন দুঃখ করে না। সকলের সমান অধিকার। দ্রুতবেগে যাহা বলিবার আছে বলিয়া যাও। কেহ শুনিল কি না শুনিল ইহার উপর বক্তৃতার সার্থকতা নির্ভর করে না। বক্তার কর্ত্তব্য বলিয়া যাওয়া শ্রোতার কর্ত্তব্য শোনা। শ্রোতা যদি নিজ কর্ত্তব্য না করে তজ্জন্য বক্তা কখন নিজ কার্য্যে অবহেলা করিবে না। এই নীতির সুবিধা এই যে সমস্বরে চীৎকার করিয়া গেলে মনটাও হাল্কা হয় অথচ কোন মত-দ্বৈধের সৃষ্টি হয় না। কলেজের মেয়েরা এই কারণে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সদ্ভাব রাখিয়াও বিবিধ মতামত পোষণ করিয়া থাকে।

অদ্যকার সভার বিষয় বিবাহের আদর্শ। বিষয়টা সভার ন্যায় পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা হয় নাই। সভা যেমন আপনা হইতে হঠাৎ বসিয়া যায়, বিষয়ও তেমনি ঘটনা চক্রে অবতীর্ণ হয়। আজকার আলোচনা কিন্তু বিষয় গৌরবে অনেকটা বক্তা শ্রোতার সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। সুমতি অমলাকে বলিয়াছে যে তাহার মতে উচ্চ শিক্ষিত চিন্তাশীল স্বামী বিবাহিত জীবনের পক্ষে উত্তম। অমলা বলিল, "চিন্তাশীল শুধু সারাক্ষণ চিন্তাই করতে থাকবে; তার বিয়ে

করবার দরকার কি?" সরলা বলিয়া উঠিল, "বেশ হাসি খুসী লোক অনেক রোজগার করে; ঐ রকমটি হলে ভাল।" আর একজন কে বলিল, "আমার মাসিমার খুব সুখের জীবন। মেসো মহাশয় কোন -পাশ ন'ন, ব্যবসাদার। ব্যবসায়ী লোক খুব ভাল হয়।"

"যাই বল; গভর্ণমেণ্টের চাকরী করে এরকম লোকই খুব নিয়ম রেখে চলে। জীবন ঠিক ঘড়ির মত চলতে থাকে।"

"ডাক্তার হলে অনেক সুবিধে। রোজগার বেশী, অসুখ বিসুখ হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা।"

"আমার কিন্তু প্রফেসর ভাল লাগে।"

"তাই না কি? কোন জনকে ভাল লাগে? বলে ফেল্, ঘটকালি করা যাক।"

"দূর হও গিয়ে! ফাজলামি করতে এলে!"

"লেখক স্বামী হলে খুব আনন্দ। সব কথা কত সুন্দর করে বলবে। সাধারণ আটপৌরে জীবনও ভাষার গৌরবে সুন্দর হয়ে উঠবে।"

"যাই বল, খুব জোরাল অথচ শান্ত প্রকৃতির লোকই শ্রেষ্ঠ। তাদের উপর নির্ভর করা চলে।"

"শুনেছি বোকা লোককে ভাল 'ম্যানেজ' করা যায়। আমি যদি বিয়ে করি ত একটু বোকা মতন ভাল মানুষ দেখে নেব।"

"তোমার সে ভাবনা নেই। তোমাহেন সর্ব্বগুণসম্পন্নাকে যে বিয়ে করবে সে বোকা হবে নিঃসন্দেহ।"

"আর তোমায় বিয়ে করবার জন্যে পৃথিবীর সব পণ্ডিতেরা ভীড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।"

"যাই বল বিয়ে না করাই ভাল। এক দফা উপদেশ শুনে শুনে ত

প্রাণ গেল, আবার কে কোথা থেকে এসে জুটে যাবে সারাক্ষণ উপদেশ দিতে।"

"উপদেশটা সম্ভবতঃ মেয়ের দিক থেকেই বেশী চলে; 'কার্টেন লেকচার' না কি বলে, সে ত স্ত্রীরাই স্বামীদের দেয় শোনা যায়। তা ছাড়া দোষ যা কিছু সে ত স্বামীর, উপদেশ দেবার বেলায় স্ত্রী কেন কথা শুনবে?"

"ও বাবা, বিয়ে না হতেই এত ঝাঁঝ, হলে পরে দেখছি পতি দেবতার দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না।"

"আমার মতে বিয়ে একটা সমান অধিকারের 'কনট্রাক্ট'। সব পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকবে, আর ঠিক সেই মত কাজ চলবে। আমি খালি রান্না আর ঘরকন্না এই করব, আর দুনিয়ার যত বুদ্ধির কাজ করবে পুরুষে, এ একটা অপমান। যে নিছক সমানাধিকারে বিশ্বাস না করে তেমন লোককে বিয়ে করা কারো উচিত নয়।"

"জ্যোৎস্নায় যখন আকাশ ভিজে উঠে, হাসনাহানার মৃদু গন্ধে বাতাস মিষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে; সে সময় যে বাঁশের বাঁশীতে বেহাগের সুর বাজিয়ে আমায় ভালবাসা জানাবে, রাগ করবে না, ঝগড়া করবে না, শুধু অল্প হেসে বলবে, 'তোমার জন্যে আমি সব দিতে পারি'; সেই রকম লোকই আমার প্রিয়।"

"এ 'ফিমেল ওমার খায়য়াম'টির মাথায় এই বেলা কবিরাজী তেল ঘষ, তা নইলে কি হবে বলা যায় না।"

"আসল কথা হল ভালবাসা। যে ভালবাসা জানাতে পারবে, যে আমার জন্যে ঘুরে ঘুরে পাগল হয়ে উঠবে, যার জীবনে আমি না থাকলে সবই কাঠের মত শুখিয়ে উঠবে; তাকে পেলেই জীবনে সুখ

আসবে। টাকা, বিদ্যা, শক্তি, বুদ্ধি, ও সব কিছু নয়; আসল সার বস্তু হ'ল ভালবাসা। যার জন্যে প্রাণের ভিতরটা খালি মনে হবে সেই ঠিক লোক।"

"কিন্তু, হঠাৎ খালি মনে হবে কেন? কি গুণ দেখে অমন ভাব জেগে উঠবে?"

"সে কি বলা যায়? শুধু একটা কথা, একটা চাউনি, কি একটা হাসি; এর উপরেই সব খুইয়ে বসা যায়।"

"ও সব সেকেলে পাগলামী। আধুনিক জগতে দেখতে হবে বৈজ্ঞানিক ভাবে মিলন উপযুক্ত কি না। বিয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা নয়। জাতির উন্নতি। সকলের শরীর, মন, পারিবারিক ইতিহাস দেখে ঠিক হবে কার সঙ্গে কার বিয়ে হলে জাতি বড় হবে।"

"জাতি বড় হোক বা না হোক, মাথায় যদি কারুর টাক থাকে ত সেখানে আমি নেই, বলে দিলাম। বাবার টাক, মামার টাক, কাকার টাক; দেখে দেখে আমার মনের মধ্যেও টাক পড়ে এসেছে। ঘন কাল আধ কোঁকড়া চুল; মাথা ভরা। আনতে পার'ত বিয়ে করি। নয়ত চিরকুমারী; 'নেভার মাইণ্ড'।"

ঘণ্টা বাজিয়া যাওয়ায় সভা ভাঙ্গিয়া গেল। আবার যে কখন এ বিষয়ের আলোচনা হইবে একথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। মেয়েরা সকলে কেহ ইতিহাস, কেহ দর্শন, কেহবা বিজ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। অমিয়া পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বৎসরাধিক কাল কলেজে পাঠ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে আবার কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। তাহার বন্ধু বান্ধব বেশী নাই এবং অনর্গল কথা বলিতেও তাহার বাধে। সেইজন্য কলেজের

অনাহূত সভায় তাহাকে বক্তা হিসারে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু তাহার মতামত নাই একথা বলা চলে না। কখন কখন ছোট খাট 'কমিটি' বসিলে সে তাহাতে বেশ ভাল করিয়াই যোগদান করে।

একদিন আলোচনা হইতেছিল স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া। সহপাঠী রমলার মতে ব্যাপারটা লইয়া অনাবশ্যক হৈ চৈ করা হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে স্ত্রীলোকদিগকে জোর করিয়া সর্ব্বঘটে উপস্থিত করিয়া সকল কার্য্যে যোগদান করাইতে হইবে। যেরূপ কার্য্য স্ত্রীজাতির মনের মতন ও যাহাতে তাহারা সক্ষম হইবে, তাহাই তাহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। "ফুটবলের কমিটিতে কিম্বা সমর সচিবের কাজে মেয়েদের যাওয়ার দরকারও নেই, যাওয়া উচিতও নয়।"

রেণু বহুকাল অসুখে ভুগিয়া ঈষৎ রুক্ষ মেজাজ। সে বলিল, "সব মেয়েরা এক রকম নয়। সব পুরুষও এক ছাঁচে ঢালা নয়। সমর সচিবের কাজ পুরুষে যদি পারে ত মেয়েরাও পারে। আজ না পারলেও পরে পারবে। অধিকার কেন থাকবে না? আমার মতে সব কাজে সকলের যাওয়ার অধিকার থাকবে।"

অমিয়া মন্তব্য করিল, "অধিকারের দোহাই দিয়ে অনধিকার চর্চ্চা একটু বেড়ে যায় না কি? স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অধিকার ক্ষমতা অনুসারে পাওয়া উচিত। শুধু তর্কের খাতিরে অধিকার দাবী করলেই হয় না। ভিতরের থেকে সে অধিকার নিজের ক্ষমতা দিয়ে সফল আর সার্থক করে তুলতে পারা চাই। পড়বার অধিকার সকলের থাকলেই কি সকলে সব বই পড়তে পারে? গাধা লোকের হাতে

দর্শন বিজ্ঞানের বই তুলে দেওয়া বাঁদরের গলায় মুক্তার মালার মতই শোভন। ভিতরের দাবী যার নেই তাকে বাইরের থেকে অধিকার গিলিয়ে দিয়ে শুধু বদহজমের ব্যবস্থা হয়।"

"তোমার তর্কটা একান্তই ইংরেজী ছাঁদের। আগে সাঁতার শেখ পরে জলে নামবে এখন, কেমন ?"

"হ্যাঁ কিন্তু কথাটা অসম্ভব বলে এও প্রমাণ হয় না যে সাঁতার না শিখে ক্রমাগত জলে নেমে চলা খুব বুদ্ধির কাজ। যদি বোঝা যায় যে জলে নামার ফলে খুব সাঁতার শেখাটা অগ্রসর হচ্ছে এবং সাঁতার শেখার প্রবৃত্তি আর চেষ্টা চির জাগ্রত তাহলে জলে নামবার অধিকার সকলকে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে সাঁতারের ইচ্ছেটা একেবারে নেই, শারীরিক অবস্থা এমন যে শেখবার সম্ভাবনাত নেইই ; শুধু জলে নেমে পাঁচজনের গায়ে জল ছেটানই আসল মতলব, অর্থাৎ অক্ষমের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র, তা হলে জলে নামবার অধিকার না দেওয়াই উচিত। এক কথায় অধিকার আর অনধিকার কোন স্থির নিশ্চল অবস্থা নয় ; তার একটা মতিগতির দিক আছে। মতি-গতি বিচার করে তবে অধিকার অনধিকার বিচার সম্ভব। এ কথা নিশ্চয় মানতে হবে যে, স্ত্রীলোকের যদি মতিগতি মোটামুটি ফুটবল আর যুদ্ধের বিপরীতগামী হয় তা হলে স্ত্রীলোকের যুদ্ধ আর ফুটবলের অধিকার নেই বলে ধরতে হবে।"

রেণু চটিয়া বলিল, "মতিগতি বিচার করবে কে, তুমি ?"

"যার যা দাবী সে যদি নিজেই তার বিচারক হ'ত, তা হলে সৃষ্টিতে কোন দাবীই অন্যায় বলে প্রমাণ হত না। তোমার যদি দাবী থাকে ত বিচার আমিই তোমার চেয়ে ভাল করব।"

"আসল কথা তোমার মতে ইংরেজ যে আমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছে না, সেটা খুব ঠিক করছে, কেমন ?"

অমিয়া উত্তর দিল, "কথা হচ্ছিল স্ত্রী-স্বাধীনতার। তুমি কোণ ঠাসা হয়ে চিরাভ্যস্ত প্রথামত চট করে ইংরেজের কথা পেড়ে বসলে। আশা, এইবার "গ্যালারীর" লোকেরা তোমার দিকেই সায় দেবে, তাই না ? কিন্তু ইংরেজ আর ভারতবাসীর ঝগড়া এবং স্ত্রী পুরুষের মত-বিভেদ এক জিনিস নয়। ইংরেজ শুধু দাবী মঞ্জুর করছে না, তা ত নয়, সে একটা নিজের দাবী খাড়া করে নানান ওজুহাতে সে দাবীর বিচার ভার নিজের হাতেই রেখে নিচ্ছে। ইংরেজের ভারত দখল করে বসে থাকার দাবী এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী এ দুটো আলাদা আলাদা দাবী নয়। একই দাবীর দুই দিক। ইংরেজের দাবীটা যে অন্যায় তা সবাই জানে। স্ত্রী পুরুষের অধিকার অনধিকারের ক্ষেত্রে কেউ কাউকে ঠিক পূর্ণমাত্রায় বঞ্চিত করছে বলা চলে না; তাই তার আলোচনা উভয়ের পক্ষেই অনেকটা সহজ।"

"বাবারে বাবা, তুমি এর পর কূটতর্কের রাণী উপাধি পাবে।" বলিয়া রেণু উঠিয়া চলিয়া গেল। অমিয়া হাসিয়া রমলাকে বলিল, "যার যত ভিতরের দৈন্য সে তত বেশী করে বাইরের দাবী বাড়িয়ে চলে। রেণুর মতে জগতের সকল লোক মিলে ষড়যন্ত্র করে তাকে দাবিয়ে রেখেছে, তা নইলে সে এত দিনে উন্নতির চরমে পৌছে যেত।"

কলেজের পরে মেয়েরা সব বাসে চড়ে বাড়ী যায়। যাদের কপাল ভাল তারা শীঘ্র নেমে যায় আর কেউ কেউ কলিকাতার সকল গলি ঘুঁচি ঘুরিয়া সর্ব্বশেষে গৃহে পৌছায়। ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যের কিছু

বাকি থাকে না। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে যান সমস্যা একটা বড় সমস্যা। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে এর ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু নারী শিক্ষার অবাধ প্রসার শুধু তখনই সম্ভব হইবে, যখন ভারতের পথে ঘাটে মেয়েরা নিরাপদে ও অনায়াসে চলিতে পারিবে। নারীর সম্মান সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ; অর্থাৎ শুধু উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রেই তাহার অস্তিত্ব। চলিত ভাষায়, চলিত চিন্তার ধারায় তাহার স্থান নাই। সাধারণ লোকে যে নারীদিগকে হেয় জ্ঞান করে তাহা নহে; কিন্তু নারীদের খুব সম্মানের চোখে দেখা, তাহাও দেখে না। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণ সতত প্রস্তুত নহে। এমন কি স্ত্রীলোক-দিগকে পরোক্ষভাবে ছোটখাট অপমান করাটা বহু ক্ষেত্রে নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়াও গ্রাহ্য হইয়া যায়। দুটা কথা, একটু টিটকারী কিম্বা অপর প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভদ্রতা প্রায়ই লক্ষিত হয়; কিন্তু কেহ কিছু বলে না।

বাসে করিয়া মেয়েরা যখন এপাড়া ওপাড়া ঘুরিতে থাকিত তখন বহুস্থলেই নিষ্কর্ম্মা লোকে তাহাদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করিয়া পরস্পরের চিত্তবিনোদন করিত। সকলে হাসিয়া উঠিল অথবা কেহ গান গাহিয়া উঠিল এ জাতীয় আপত্তিজনক ব্যবহার তরুণীদের এক প্রকার সহিয়া গিয়াছিল। জীব জগতে বিভিন্ন জন্তুর বিভিন্ন ব্যবহার যেমন মানুষ স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লয়; নিজের ভালমন্দ বিচারের মাপকাটিতে মাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন জানোয়ারের চালচলনের বিচার করিতে যায় না; ছাত্রীরাও নানান পাড়ার নানা প্রকার বর্ব্বরতা সেই ভাবেই দেখিয়াও দেখিত না। ইহাদের নিকট আর কি আশা করা যায়, এই ভাবে ব্যাপারটা উপেক্ষা করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় কি? মোড়ের মাথায়

যে সকল হিতাহিত জ্ঞান শূন্য নির্ব্বোধগুলি সতত জটলা করিয়া দিন কাটায় তাহারা না সংস্কৃত না প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, কিছুই পড়ে নাই। গান যদি গাহিয়া উঠে কিম্বা একটা ফুল ছুঁড়িয়া দিয়া বর্ব্বর আমোদে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, ত কি করা যাইবে? কেহ কেহ রাগিয়া উঠিত। বলিত, "পুলিশে দেওয়া উচিত!" কিন্তু অপরাপর ছাত্রীরা বলিত, "কোন 'নোটিস' নিওনা। করুক গিয়ে যা খুসী। বাঁদরে বাঁদরামী করবেই, কে আটকাবে?"

একদিন উত্তর কলিকাতার এক গলিতে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে বিষয়টা উপেক্ষা করা চলিল না। বাসখানা গলির মোড় ঘুরিয়া ঢুকিতেই একটা সাইকেলের সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। বাস চালক খুব তৎপরতার সহিত বাসখানা থামাইয়া ফেলিল ও সাইকেলের চালকের একটা আছাড় ব্যতীত অপর কোন ক্ষতি হইল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা দলের একজন চাঁই ছিল। তাহার পতনে বিভিন্ন রোয়াক হইতে উঠিয়া বহু নিষ্কর্ম্মা বাসখানা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাস চালক বলিল, "আপনাদের যদি কিছু নালিশ থাকে ত বাসের নম্বর নিন; আমি মেয়েদের নিয়ে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।"

একজন নেতৃস্থানীয় নিষ্কর্ম্মা বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "আল-বাৎ থাকবে, তোমার ঘাড় থাকবে দাঁড়িয়ে! আমরা বাসের নম্বর নেব, তোমার লাইসেন্স নম্বর নেব, তারপর ছাড়ব।"

অপর এক বকাটে বলিল, "সাক্ষী হিসেবে মেয়েদের নাম আর ঠিকানাও নিয়ে নাও।"

"হ্যাঁ ঠিক বলেছ, সকলের নাম আর ঠিকানা নিয়ে নাও। এই, একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আয় ত।"

দুই একজন ছাত্রী ভীষণ ভয় পাইয়া গেল। "ভাই, কি হবে ভাই? এরা যা দুষ্টু।" ইত্যাদি গুঞ্জনে বাসের ভিতর মুখর হইয়া উঠিল। মেয়েদের বাস ঘিরিয়া এত লোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া দুই একজন ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘটনার কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "সাইকেলের ত কিছু হয় নি ত শুধু শুধু হাঙ্গামা করছ কেন? মেয়েদের বাস; ছেড়ে দাও।" উত্তরে পুরু পুরু লাল ওষ্ঠাধর এক নিষ্কর্ম্মা পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "আপনাদের কি মশায়? মেয়েরা সব কলেজে পড়ে। পর্দানসীন নয়। তারা কাঠগড়ায় সাক্ষী দেবে না কেন? আপনার মেয়ে আছে কি ওতে?"

ভদ্রলোকেরা চটিয়া বলিলেন, "দেখ, বাঁদরামীর একটা সীমা আছে! বাস ছেড়ে দিয়ে চলে যাও নয়ত ভাল হবে না।"

"ও ভাল হবে না? কেন খারাপ কি হবে? মারবেন না কি?" বলিয়া অকাল কুষ্মাণ্ডের দল ভদ্রলোকদিগকে ঘিরিয়া আস্ফালন সুরু করিল। যে ব্যক্তি কাগজ পেন্সিল লইয়া আসিয়াছিল সে বাসের দরজায় আসিয়া বলিল, "আপনাদের নাম আর ঠিকানা দিতে হবে।"

মেয়েরা কেহ কোন জবাব না দেওয়ায় সে আরও জোর গলায় বলিল, "নাম আর ঠিকানা দিয়ে দিন শীগ্‌গির, বাস ছেড়ে দিচ্ছি।" ইহাতেও যখন কেহ কোন জবাব দিল না তখন সে বাকি বর্ব্বরদিগের সহিত পরামর্শ করিতে চলিল। ব্যাপারটা কতদূর কি গড়াইত বলা যায় না কিন্তু ঠিক এই সময় একটা বড় মোটর গাড়ী মোড় ঘুরিয়া গলিতে ঢুকিল। উহাতে পাড়ার বড় ডাক্তার এক

ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী ছিলেন। ভীড়ের জন্য গাড়ীটা দাঁড়াইয়া যাইতে ডাক্তার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার। ঘটনার কথা শুনিয়া তিনি দুই একজন পরিচিত নিষ্কর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন যে তাহাদিগের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইতেছে এবং তাহারা যেন অবিলম্বে ভীড় ছাড়িয়া বাস খানাকে যাইতে দেয়। এই অবস্থায় নিষ্কর্ম্মারা দেখিল ডাক্তারের কথামত চলাই ভাল। কারণ তিনি উহাদের অনেকেরই নাম ধাম জানেন ; কথা না শুনিলে বিপদ হইতে পারে।

সেদিন বাস ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া গেল। পরদিন কিন্তু আবার তাহারা বাস আসিবার সময় গলিতে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাসখানা আসিতেই হুঁ, হা, বেড়াল কুকুরের ডাক প্রভৃতিতে গলি চমকিয়া উঠিল। একটা কাগজ পাকাইয়া একজন গাড়ীর ভিতর ছুঁড়িয়া ফেলিল। বাসটা কিছুদূর যাইতে একজন মেয়ে কাগজখানা তুলিয়া খুলিয়া দেখিল তাহাতে ছাত্রীদের সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছে যে তাহারা যে পাড়ার ছেলেদের বুকের উপর দিয়া চাকা চালাইয়া যায় ইহাতে ছেলেরা নিজেদের জীবন সার্থক মনে করে ; কিন্তু বাস হইতে নামিয়া যদি তাহাদের পদদলিত করিয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে আরও ভাল হয়, ইত্যাদি। দুই তিন দিন প্রত্যহই এই প্রকার অসভ্যতা চলিতে লাগিল। মেয়েরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং কলেজে ও বাড়ীতে নালিশ উঠাইল। কিন্তু গলির মোড়ে একজন পাহারাওয়ালা মোতায়েন হইলে পর বকাটের দল কিছু দূরে অপর এক গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার অসভ্যতা করিয়া পালাইল।

সে দিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া অমিয়া দেখিল অমর, বিজয় ও

আরও দুই চার জন ছাত্র তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। অমর ও বিজয় তাহাকে নমস্কার করিলে পর অমিয়া তাহাদিগকে বলিল, "আপনাদের পুরুষ জাতের সৎসাহস ও ভদ্রতার ধাক্কায় আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি।"

অমর বলিল, "কেন কি হয়েছে? কারা সৎসাহস দেখাল?"

অমিয়ার নিকট পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী আদ্যোপান্ত শুনিয়া অমর ভীষণ রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেউ ওদের শিক্ষা দিলে না? ও পাড়ায় কি সবই ঐ রকম জানোয়ার?"

"তা কি করবে? ভদ্রলোকে কখনঅসভ্য বর্ব্বরদের সঙ্গে পেরে ওঠে কি?"

"কতগুলো বাঁদর আছে ও রকম?"

"তা প্রায় পনের কুড়ি জন হবে।"

অমর শুধু, "হুঁ" বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল ও অমিয়া চলিয়া যাইবার পর শীঘ্র শীঘ্র বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পরদিন কলেজের বাস যখন সেই গলির মোড়ে পৌছিল তখন পাড়ার বাঁদর ছেলেরা পূর্ণ উৎসাহে অভদ্রতা আরম্ভ করিল। বাসখানা ভীত লজ্জিত মেয়েদের লইয়া চলিয়া যাইলে পর যখন বিজয় গর্ব্বে বকাটের দল পরস্পরের পিঠ চাপড়াইতে সুরু করিয়াছে এমন সময় বাইসিক্‌ল্ চড়িয়া জন পঁচিশ ছেলে গলিতে প্রবেশ করিল। তাহারা কোন কথা না বলিয়া নিজ নিজ বাইসিক্‌ল্ হইতে নামিয়া সেগুলিকে দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া, সোজা ঐ অভদ্রদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পরে এক এক জন এক একটি নিষ্কর্ম্মার কান ধরিয়া প্রচণ্ড মোচড় দিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে অতর্কিতে

আক্রান্ত হইয়া তাহারা, "এই, কে? কি রে বাবা? আরে ছাড়, লাগে! এগুলো কে রে? মার বেটাদের," প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। আক্রমণকারীদের উল্টা মার দিতে গিয়া পাড়ার ছেলেরা একটা মহা ভুল করিয়া বসিল। কারণ এই সকল সাইক্‌ল্‌ আরোহী আগন্তুকেরা প্রচণ্ড কীল, চড় ও পদাঘাতে তাহাদের প্রায় সকলকেই নিমেষের মধ্যে ধরাশায়ী করিয়া দিল। তৎপরে একজন অতি নিবিষ্ট চিত্তে তাহাদের সকলের মুখে একটা টিন হইতে আল-কাতরা ভিজা একটা বস্ত্র খণ্ড বাহির করিরা ভাল করিয়া আলকাতরা মাখাইয়া দিল ও অপর একজন প্রত্যেকের জামা কাপড় চড় চড় করিয়া ছিঁড়িয়া দিল।

এক মিনিটের মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া এই সব ছেলেরা বাইসিক্‌ল্‌ চড়িয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আবার যদি মেয়েদের সঙ্গে ইতরামী করতে যাও ত প্রত্যেকের এক একটা কাণ কেটে নেব; মনে রেখ।"

পাড়ার ছেলেরা এরূপ বেদম প্রহার কখন খায় নাই। তাহারা না উল্টা মার দিতে পারিল, না সাহস করিল একটা গালি দিতে। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া পাড়ার ভদ্রলোকেরা মহা খুসী হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠিক হয়েছে! যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর!"

এই ঘটনার পরে সেই পাড়ায় মেয়েদের বাস আসিলে আর কেহ ভীড় করিয়া ছাত্রীদের উত্যক্ত করিবার চেষ্টা করিত না। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে তরুণীরা বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার; চিড়িয়াখানার বাসিন্দারা হঠাৎ সভ্য হয়ে গেল যে?"

"সম্ভবত অনুতাপ হয়েছে।",

"অনুতাপ না ছাই! বোধ হয় বাপ মারা টের পেয়ে রাস্তায় বেরন বন্ধ করে দিয়েছে।"

. "বাপ মার কোন সম্বন্ধ থাকলে কি আর ও রকম হয়? অনেক কাল বাপ মারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, নয়ত মরেছে। কি ব্যাপার খোঁজ করো ত লতা, তোমাদেরই ত বাড়ীর কাছে।"

লতা পরদিন সংবাদ দিল যে দিন দুই পূর্ব্বে একদল অজানা ছেলে আসিয়া ঐ সকল দুষ্টগুলাকে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিয়া সায়েস্তা করিয়া গিয়াছে। কয়েকজন এখন শয্যাশায়ী ও অনেকেই এখনও নাক মুখ চোখের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "এ সব 'নাইটস অফ দি রাউণ্ড টেবল' কারা? এদের মত যে আবার এ দেশে কেউ ছিল তা জানতাম না?"

একজন বলিল, "না, মাঝে মাঝে দুই একজন দেখা যায়। সেবার 'একজিবিশনের' সময় আমি মায়ের সঙ্গে 'স্টল' দেখে বেড়াচ্ছি এমন সময় একটা জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পর যেই আবার চলতে সুরু করব, দেখলাম একটা পশ্চিমা আমার শাড়ীর লুটান 'স্কার্টের' উপর ইচ্ছে করে পা দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মাকে বল্লাম, 'মা এই লোকটা কি করছে দেখ।' মা কিছু বলবার আগেই একটি ছেলে পশ্চিমার পাগড়ীটা এক চড়ে উড়িয়ে দিয়ে দিব্যি হেঁটে চলে গেল। লোকটা হতভম্ব হয়ে গিয়ে পাগড়ী কুড়তে চল্ল, আমরাও চলে গেলাম। ছেলেটিকে আর দেখলাম না!"

"হায় রে 'রোম্যান্স'টা কুঁড়িতেই এমন করে ঝরে গেল?"

'হ্যাঁ! 'রোম্যান্স' না আর কিছু! তবে ছেলেটার সাহস ছিল বলতে হবে। আর খুব চটপটে।"

"খুবই চটপটে বলতে হবে। এক মুহূর্ত্তে পশ্চিমার পাগড়ী উড়িয়ে তোমার হৃদয় হরণ করে মিলিয়ে গেল!"

অমিয়া এই সকল আলোচনা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। এ নিশ্চয় অমরের কাজ! সেদিন তাহার নিকট কথা শুনিয়া কি রকম হঠাৎ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে আরম্ভ করিল। নিশ্চয় দলের ছেলেদের লইয়া এই কার্য্য করিয়া গিয়াছে। কি রকম পাগল ছেলে! যদি মারামারি করিতে গিয়া লাগিয়া টাগিয়া যাইত! সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা লতা, খালি এদেরই মেরে গেল? এরা কাউকে জখম করে নি?"

"হ্যাঁ, জখম করবে! আমাদের একটা ছোকরা চাকর দেখেছিল। বল্লে সব সাইক্‌ল্ চড়ে এল আর দু মিনিটের মধ্যে পাড়ার বকাটে ছেলেগুলোকে মেরে, আলকাতরা মাখিয়ে, জামা কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। কারুর একটা আঁচড়ও লাগেনি তাদের। এগুলোর যত বাহাদুরী মেয়েদের বাস থামাবার সময়।"

অমিয়া আশ্বস্ত হইয়া আবার হেলান দিয়া বসিয়া রাস্তার দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অমরেরই কাজ, নিশ্চয়। ছেলেটা দেখতে শান্ত শিষ্ট কিন্তু মারামারিতে ওস্তাদ!

এই লাঠ্যৌষধির গল্পটা চতুর্দ্দিকে খুব ছড়াইয়া পড়িল। যে সকল অশিষ্ট যুবক ছাত্রীদের বাসের সম্মুখে গোলমাল করিত, তাহাদের শিক্ষালাভে সকলেই খুব খুসী। একটা কথা আছে যে শক্তিমান যে রাজত্ব তাহারই। এ ক্ষেত্রে দেখা গেল যে শক্তিমান শাসকদিগের

প্রতি সকলের শ্রদ্ধা হঠাৎ উপচিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা আজীবন স্ত্রী শিক্ষার যথা সামর্থ্য নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও অকস্মাৎ নিজেদের বিচার বুদ্ধি হঠাৎ ফিরিয়া পাইয়া জোর গলায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এই সব ইতর লোকগুলোর জন্যেই মেয়েদের লেখাপড়া করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যেখানে যে ভাবেই থাকুক না কেন, তোরই মা বোনের মত ওরাও ত ভদ্রলোকের মেয়ে; তাদের সঙ্গে কথা কইতে যাস কেন, তাদের গাড়ীই বা আটকাস কেন? ঠিক হয়েছে, মারের চোটে পিতৃনাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে!"

যাহারা মার খাইল তাহারা সাধারণের সহানুভূতি এ ভাবে অপর দিকে চলিয়া যাওয়ায় অগত্যা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। ইচ্ছা ছিল ভাল করিয়া আয়োজন করিয়া আর একবার জোর পরীক্ষা করার; কিন্তু জনমত বিপক্ষে যাওয়ায় এ চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হইল।

বিজয় একদিন কোন কাজে অধ্যাপক গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়াছিল। অমিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বলুন ত ঐ যে সেই ছেলেদের সাইকৃল্ চড়ে গিয়ে মেরে এল, ওরা সব কে?"

বিজয় বলিল, "তাত জানিনা। মেরেছিল বলে শুনেছি কিন্তু কারা তা বলতে পারিনা।"

বিজয় কোন মিথ্যা বলে নাই। তাহার শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে এই জাতীয় অভিযানে যে তাহাকে সঙ্গে লইবে না তাহা খুবই স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত ঐ প্রহারের ব্যবস্থা যাহারা করিয়াছিল, তাহারা নিজেদের কীর্ত্তি প্রসূত যশ উপভোগের আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ

করে নাই। ছাত্র মহলে অনেকে অনেককে সন্দেহ করিত কিন্তু কেহই বলিতে পারিত না যে সত্যি সত্য কাহারা এই কর্ম্ম করিয়াছে।

অমিয়া দমিয়া গিয়া বলিল, "জানেন না? খুব আশ্চর্য্য কিন্তু যে এতগুলি ছেলে সাইকল্ চড়ে এসে এত বড় একটা কাণ্ড করে গেল, অথচ কেউ জানেনা কে করল?"

বিজয় স্বীকার করিল যে ব্যাপারটা তাজ্জব রকমের, "সত্যি কিন্তু, অনেক খোঁজ খবর করেও কেউ ধরতে পারে নি যে কারা এই কাজটি করেছে। আমরা সকলে অমরকে ধরে বলেছিলাম, 'এ তোমার কর্ম্ম', সে কিন্তু বল্লে 'কে, আমি? আমি সে দিন কয়েক জন ছেলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম'। খুঁবই আশ্চর্য্য!"

অন্য একদিন অমিয়া তাহার পিতার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। গুহ মহাশয় বলিলেন, "এটা জাতীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধির জাগরণের লক্ষণ। বহুদিন অনেক রকম অন্যায় আর পাপের মধ্যে থেকে মানুষের মনুষ্যত্ব থেকে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তখন প্রথমে মুষ্টিমেয় লোকে নূতন প্রচেষ্টায় লেগে পড়ে; এবং ক্রমশঃ সংখ্যায় বেড়ে উঠে জাগরণটা দেশব্যাপী করে তোলে। এই সব ছেলেরা জাগরণের অগ্রগামী সেনাদল।"

অমিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু এরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে কেন?"

"উপযুক্ত রকম দলে ভারি হলে পরে আত্মপ্রকাশ করবে। ওটাত যুদ্ধের রীতি।"

(১০)

পরীক্ষার সময় আবার আগাইয়া আসিল। সকলে প্রাণপণে প্রস্তুত হইতে লাগিল। চিরন্তন প্রথা অনুসারে পুস্তকের বাজারে 'নোটে'র বিক্রয় হঠাৎ বাড়িয়া গেল। যাহারা নিয়মিত পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া আসিয়াছে তাহারাও বিদ্যাকে সূত্রবদ্ধ করিবার জন্য 'নোটে'র আশ্রয় গ্রহণ করিল, অন্যে পাঠ্য পুস্তক লইয়া কোনপ্রকার হৈ চৈ না করিয়া সোজা সুজি সহজ পন্থায় সংক্ষিপ্তসার 'নোট' কেতাবে আত্ম সমর্পণ করিল। অনেকে পুরাতন প্রশ্ন ও উত্তর অভ্যাসে মন দিল।

বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষার পুর্ব্বে যে একাগ্রতা দেখাইয়া থাকে তাহা যদি তাহাদের বারমেসে অভ্যাসে পরিণত করা যাইত তাহা হইলে ভারতের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রেরা অনায়াসেই অধিকাংশ উচ্চ স্থান দখল করিতে পারিত। কিন্তু সারা বৎসর গা ঢিলা দিয়া কোনমতে শেষরক্ষা করা তাহাদের এতই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে নিয়ম করিয়া পরিশ্রম করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এইরূপ ভাবে বাংলায় বহু কার্য্যই সাধিত হয়। সারা বৎসর মোটা ভাত খাইয়া থাকিয়া হঠাৎ পুজার সময়, অথবা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে, অপব্যয়ের চূড়ান্ত করিয়া অপরিমিত আহারে মাতিয়া ওঠা একটা উদাহরণ। নিয়মিত অপরিষ্কার ও অসম্পূর্ণ বেশে কাল কাটাইয়া হঠাৎ কোঁচান গিলে করা বসনের ছড়াছড়ি আর একটি। বাড়ীঘর যতদূর সম্ভব চুন বালি বর্জ্জিত অবস্থায় বৎসরের পর বৎসর রাখিয়া দিয়া অকস্মাৎ সমস্ত ওলট পালট করিয়া মেরামতের ধূম ধাড়াক্কা তৃতীয় উদাহরণ। জীবন ভোর পাপ করিয়া অল্প সময়ের

মধ্যে ঘনীভূত পুণ্য অর্জ্জনের জন্য তীর্থ করাও উল্লেখযোগ্য। বরাবর ঢিলা দিয়া চলিব ও কোন উপায়ে শেষ মুহূর্ত্তে সব ঠিক করিয়া লইব এই আশা জাতীয় জীবনে সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। ইংরেজ অথবা অপর অনেক জাতি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে নিয়ম মানিয়া বাঁধা পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিয়া যায়; ফলে তাহারা সকল সময়েই চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত থাকে। বাঙালীর ট্রেনে উঠিতে সপ্তাহকাল গুছাই-বার ধাক্কা সামলাইতে হয়। বাড়ীতে নিমন্ত্রিত বা অভ্যাগত আসিলে ছাদ মেরামত, চূণ বালি ফেরান হইতে আরম্ভ করিয়া শয়ন, উপবেশন ভোজন প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই বহু পরিশ্রমে আয়োজন করিয়া ঠিক করিতে হয়। এই যে চির অ-প্রস্তুত ভাব ইহা ইতিহাসে কবে আরম্ভ এবং ভবিষ্যতে ইহার শেষ কোথায় তাহা কে বলিবে?

'নোট' মুখস্থ করার জন্য ছাত্র ছাত্রীদিগকে বিভিন্ন উপায় ও শারীরিক ভঙ্গী অবলম্বন করিতে দেখা যায়। চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া, টেবিলের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া, বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া অথবা কাৎ ভাবে শয্যার উপরে পুস্তক ন্যস্ত করিয়া ইত্যাদি নানান ভঙ্গীতে পরীক্ষার পড়া করার রীতি আছে। অনেকে পুস্তক হস্তে পিঁড়ির উপর বসিয়া পাঠ করে, কেহ কেহ বারান্দায় পাইচারি করিয়া অথবা রেলিংয়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া পড়া করে, কেহবা মাদুর পাতিয়া উবুড় হইয়া শুইয়া বুকে বালিসের ঠেকো দিয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া বাগানে বসিয়া পাঠ চর্চ্চা করে। যাহাদের বাগান নাই তাহারা গড়ের মাঠে অথবা গঙ্গার ধারে আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনও শুনা গিয়াছে যে কোন কোন অভিজাত বংশীয় ছাত্র মোটরে চড়িয়া

মুক্ত বাতাসে পথে পথে পাক খাইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। একজন স্টীমারে চড়িয়া ক্রমাগত গঙ্গা বক্ষে বিচরণ করিতে করিতে তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বলিয়া জানা গিয়াছে; অপর একজনকে ডবল ডেকার বাসে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার দুই একটা দীঘিতে ভাসমান নৌকায় 'লজিকের' সংক্ষেপ সংস্করণ দেখা গিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত মামাবাড়ী, শ্বশুরালয়, সহপাঠীর বাড়ী, অথবা বাড়ীর ছাদ, স্নানাগার, চিলেকোঠা প্রভৃতি স্থানেও পরীক্ষার বন্যা অবাধগতিতে পৌছিয়াছে। এক কথায়, ঝড়ের সময় ধূলার মত, বসন্তের ঝরা পাতার মত, শীতের আকাশে ধোঁয়ার মত এই পরীক্ষার পাঠ স্থান কাল বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কেহ তাহাকে কোন নিয়মের অধীনে আনিতে পারে না। স্বাভাবিক জীবন যাত্রা পরীক্ষার উত্তাপে টেড়িয়া বেঁকিয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়া দাঁড়ায়। "পড়তে হবে" এই ওজুহাতে সকল কিছু মাফ হইয়া যায়। কেহ শুধু চা খাইয়া পড়িতে থাকে, কেহ গণ্ডা গণ্ডা ডিম অথবা কৈ মৎস্য উদরসাৎ করিয়া মস্তিষ্ক সজাগ রাখে, কেহ বোতল বোতল সুগন্ধী তৈল মাথায় মাখিয়া ফেলে। দাদা অথবা দিদি পড়িতেছে বলিয়া খোকা মার খাইয়া ছাদের ঘরে কারারুদ্ধ হয়; চাকরেরা অযথা বকুনি খায়, ফেরিওয়ালাদিগের ব্যবসা বন্ধ হয় এবং মাতা ঘন ঘন পিতাকে সন্তানদিগের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য লাঞ্ছনা করিয়া তাঁহার জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তোলেন।

ধন্য পরীক্ষা! বাংলার মাঠে মাঠে যেমন চাষীরা জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া, একহাঁটু কাদায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া হাজিয়া পচিয়া সাপের কামড় খাইয়া অবশেষে বহুকষ্ট লব্ধ ফসলে আধপেটা মাত্র খাইয়া কোন মতে প্রাণধারণ করিয়া টিঁকিয়া থাকে; এ হেন পরীক্ষার পড়া

পড়িয়া, নিজে কাঁদিয়া, চোখে সরিষার তৈল দিয়া রাত জাগিয়া, অপরকে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া, ঢুলিয়া ওলট পালট করিয়া অবশেষে পড়ুয়ারা পাঠশেষে ত্রিশমুদ্রা বেতনের চাকুরী অর্জ্জন করিয়া কঠোর অভাবে নিষ্পেষিত হইয়া জীবন যাপন করে। ইহা পূর্ব্বজন্মের পাপ অথবা ইহজন্মের আহাম্মকির ফল তাহা কে বিচার করিবে?

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির শাণিত বিশ্লেষণে যাহাই ধরা পড়ুক না কেন; অমর, বিজয়, সত্যেন ও তৎসঙ্গে সহস্র সহস্র ছাত্র এই বাৎসরিক মহাযজ্ঞের জন্য দেশবাসীকে সচকিত করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। অমিয়া প্রমুখ ছাত্রীরাও নিজেদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর যেমন বহুকাল পরে দেখা দিলেও চির পুরাতন কাঁপুনিটি ঠিক একই ভাবে আবির্ভূত হয়; পাঠের তাড়নায় বিজয়ের গ্রাম্য স্বরে ঢুলিয়া ঢুলিয়া মুখস্থ করাটা ঠিক সেই চিরপুরাতন রূপে হঠাৎ দুই বৎসর পরে পুনরাবির্ভূত হইল। ফ্যাসনেব্‌ল্ মেসের আবহাওয়া এইরূপ ভাবে সংক্রামিত হইতে দেখিয়া স্থূলোদর জমিদার তনয় বলিলেন, "বাবা, যাবে কোথায়? 'ম্যাগ্না কার্টা'ই হোক আর 'বারবারা সেলারেণ্ট'ই হোক, সেই 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'; কি বল? আমাদের বড় বউঠাকরুণের খাস দাসী রামের মা পনীর খেতে শিখেছিল। সহজে কি শেখে? কত উৎপাত, উপদ্রবের পর ত 'গরগনজোলা চীজ' খেয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ডিহি শ্রীরাম-পুরের সনাতন ধর্ম্মের সমন্বয় স্থাপন করলে। ওমা; তাও কি জিইয়ে রাখা যায়? দিন কত পরে দেখা গেল সেই 'চীজ' তেঁতুল, নুন আর লঙ্কা দিয়ে মেখে চটকিয়ে পান্তা ভাত সহযোগে দিব্যি চালিয়ে চলেছে!

কাণ্টও বুঝলাম হেগেলও হজম করলাম ; কিন্তু অন্ধকারে গেলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হয় দর্শনের চরম বুঝি ভূত দর্শন।"

মেসের আর এক বাসিন্দা, ল-কলেজের মৌরসি-মোকরারী ছাত্র, বলিল, "যা বলেছ ; ওর গোঙ্গানীতে রাত্তির তেরটা অবধি ঘুম হয় না। সেদিন বল্লাম, 'বিজয়বাবু, ও রকম করে কাতরাও কেন রাত্রে?' রেগেই গেল। বল্লে 'আপনার অসুবিধা হয় ত কানে তুলো গুঁজে শোবেন। আপনার জন্যে আমি পড়া বন্ধ করতে পারব না।' আমি বল্লাম, 'ভাই পড়, পড়বে বই কি, নিশ্চয় পড়বে, একশ বার পড়বে ; কিন্তু ঐ উড়ের নামতা পড়ার সুরটা ; ওটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? ভেবে দেখ, ভাল করে চিন্তা করে, গবেষণা করে দেখ ; জন সাধারণের মঙ্গল বলে একটা জিনিষ আছে ত? 'সিভিক স্পিরিট' আর কি, বুঝলে না? ঐ গলা সাধাটা স্থগিত রাখ।' ছোকরা চটেই অস্থির। সে দিন রাত তিনটে অবধি এক সুরে টেনে গেল। কি আর করি, শ্রীক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

জমিদার পুত্র বলিলেন, "দূর হগ্‌গে ছাই! চল একটা সিনেমা টিনেমা ঘুরে আসি গিয়ে।" অপর ব্যক্তি ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইলেন, কারণ জমিদার পুত্রের অভ্যাস নিজের খরচে সকলকে বিভিন্ন প্রকার আনন্দ দান। বিজয়ের পিতার আদেশে খুল্লতাত হরেন-বাবুকে লিখিলেন যেন বিজয়ের জন্য একজন টিউটর নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং একজন টিউটর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধ্যে মধ্যে অমর প্রভৃতি সহপাঠীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখনও ঐ এক চিন্তা। কি রকম প্রশ্ন হইতে পারে? কি জাতীয় উত্তরে মার্ক ভাল উঠিবে, ইত্যাদি।

পরীক্ষার দিন যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ছাত্র মহলে পাঠ ও প্রশ্ন আলোচনা ততই উত্তরোত্তর দ্রুত তালে বাড়িয়া চলিল। পরীক্ষার দুই তিন দিন বাকি। অমর বিজয়দের "মেসে" আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "বই পত্র রাখ দিথিনি। চল "হকি ম্যাচ" দেখে আসি।" এ জাতীয় অধর্ম্মের কথা শুনিয়া বলিল, "ক্ষেপে গেলে নাকি, পড়ে পড়ে? আজ বাদে কাল পরীক্ষা, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই; কত 'রিভিশন' বাকি, আর 'ম্যাচ' দেখতে যাব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল। বোঝার উপর বোঝা চাপিয়ে মনের ভেতরটা এমন ঠাসা জমাট হয়ে উঠেছে যে পরীক্ষার সময় দরকার মত মাল মশলা টেনে বার করা চলবে না। একটু জায়গা রেখে পড়া দরকার, যাতে মগজের ভেতর অবধি যাতায়াত চলে।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর বিজয় "হকি ম্যাচ" দেখিতে রাজি হইয়া অমরের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। কয়েক ঘণ্টা খেলা দেখিয়া ও ময়দানে ঘুরিয়া তাহাদের মনটা অনেক সহজ সরল গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। অমর বলিল, "চল, কালকে মিস গুহদের ওখানে বেড়িয়ে আসি।"

বিজয় বলিল, "হ্যাঁ; আমরা পাগল বলে কি সকলেই আমাদের মত লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে? গিয়ে কাজ নেই।"

অমর বলিল, "আমি জোর করে বলতে পারি যে গিয়ে দেখবে মিস গুহ মোটেই বই নিয়ে বসে নেই।"

বিজয় বলিল, "আচ্ছা, চল, দেখাই যাবে।"

*　　*　　*　　*

অমিয়া তখন বসিয়া একটা সেলাই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। অমর ও বিজয়কে দেখিয়া সেলাইটা রাখিয়া বলিল, "কি, 'প্রিপ্যারেশন' ভাল রকম হয়ে গেছে? বেশ খুসী মনে বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখছি?"

অমর বলিল, "যা হবার তা হয়েছে, এখন মনের ভেতর একটু হাওয়া খেলিয়ে নিচ্ছি। বোঝা বয়ে বয়ে গুদাম যতটা ভরা যায় করা গেছে। এখন একটু জিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে যাতে মাল বাইরে বের করবার সময় শক্তিতে কুলায়।"

বিজয় বলিল, "যা থাকে কপালে। যা পড়েছি, ঠিক মত প্রশ্ন এলে পরে তাতেই যথেষ্ট হবে।"

অমিয়া বলিল, "আমার ও সব বালাই নেই। এমনিতেও যা হবে অমনিতেও তাই। সুতরাং শুধু শুধু কষ্ট করে মরি কেন?" প্রফেসর গুহ ইতিমধ্যে আসিয়া বলিলেন, "এই যে অমর, এই যে বিজয়, কেমন আছ; খুব ব্যস্ত ছিলে না, লেখা পড়া নিয়ে? কেমন তৈরী হল?"

"আজ্ঞে ভালই হয়েছে, তবে যতটা ইচ্ছে তা কি আর হয়।"

অমিয়া বলিল, "আঃ রাখুন ত যত পরীক্ষার কথা। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আনি। বাবা, তুমি টেক্স্ট বুকের কথা ভুলে যাও। আমার মাথা ধরে ওঠে ঐ এক কথা শুনলে পরে।"

সকলে চা পানান্তে কিছু কাল গল্প করিয়া সময় কাটাইলে, বিজয় ও অমর বিদায় গ্রহণ করিল। পথে অমর বলিল, "দেখলে ত, মিস গুহ এখনও মাথা গুঁজে বই পড়ছেন কি না? পরীক্ষার আগে 'রীল্যাক্স্' করা দরকার।"

অমর মেস অবধি আসিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। বিজয় আবার

পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। তাহার পড়ার তাড়না এক্টা পেশার মত। সে না পড়িলে হাঁফাইয়া উঠিত। পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ করা অবধি একই চিন্তা। কিছু বাদ পড়িয়া গেল না ত?"

যে কয়দিন পরীক্ষা চলিল, কলিকাতার ছাত্র মহলে যেন. প্রশ্ন উত্তর, উত্তর আর প্রশ্ন এই একমাত্র আলোচনা উদয়াস্ত চলিতে লাগিল। শুষ্ক বদন, নিস্তেজ নয়ন ও সর্ব্বাঙ্গে কালি কলমের চিহ্ন বহিয়া ছেলেরা শুধু পরীক্ষা হলে যায় আর আসে। খাবার সরবত লইয়া বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ ঘুরিয়া মরে। যেন একটা বিরাট কিছু ঘটিতেছে। কাহারও মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, কেহবা নিদারুণ দুঃখে কাতর, দু এক জন্ বেপরোয়া। সকলেই যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়িতে নামিয়াছে। কে মরিবে, কে বাঁচিবে কিছু বলা যায় না।

জাতির জীবনে এই পরীক্ষাগুলি বৎসরের পর বৎসর একটা গভীর আলোড়নের সূচনা করে। জাতীয় প্রাণ শক্তির একটা প্রবল আবেগ প্রবাহ এই পথে বহিয়া যায়। কিন্তু ইহার ফল কি? অধিকাংশ স্থলেই কিছু. না। কার্য্য করিয়া পুরস্কার না পাওয়া, খাটিয়া মজুরী না মেলা, উৎসাহের চরমে পৌছাইয়া নিরাশার গভীরতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। বহুদূর পথ অতিক্রম করিবার পর যদি কেহ জানিতে পারে যে এতক্ষণ ভুল পথে চলিয়া আসিয়াছে তা হইলে তাহার মনোভাব যদৃশ হয় পরীক্ষা অরণ্য পার হইয়া আসিয়া বহু যুবকের অবস্থাই সেইরূপ হয়। অতএব গতানুগতিকের তাড়নায় সমাজ তাহার ভবিষ্যতের সেনাদলকে ক্রমাগতই এই "কুছ নহি"র দেশে তাড়াইয়া পাঠাইয়া চলিতেছে। এ একটা নির্ম্মম খেলা। ইহার শেষ কবে হইবে কে জানে?

পরীক্ষা অন্তে মনে সাফল্যের আনন্দ বহন করিয়া যুবক যখন দুনিয়ার চত্বরে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া থাকে যে সকলে তাহাকে অতঃপর সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আসরে জায়গা দিবে। কিন্তু দেখে যে কেউ তাকাইয়াও দেখে না। যাহার নিকট যায় সেই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে চায়। যে দরজার ঘা মারে সেখানেই ভিতর হইতে কঠোর কণ্ঠে আওয়াজ আসে—কেন গোলযোগ করছ? অন্যত্র পথ দেখ। সহর ছাড়িয়া গ্রামে গেলে দেখে যদিও দরজায় কুলুপ আঁটা নাই কিন্তু সেখানেও সর্ব্বত্র প্রবেশ নিষেধ। এক হিসাবে সব কিছুই তালা দেওয়া। জমিতে আইনের তালা আঁটা; "এটা অমুকের, ওটা তমুকের; তুমি কে বাবা উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাও?" কারখানায় তালা আঁটা; "কি কাজ জান, সার্টিফিকেট আছে, ভদ্রলোকেরা কি মজুরী করতে পারে?" "এ বাজারে দোকান দিতে যেওনা, এখানে সব ব্যবস্থা পুরা আছে। যদিও দেও ত মাল পাবে না, ধার পাবে না, পিষে মারা যাবে।" আফিস দপ্তরে, "তুমি কোথা থেকে এলে বাবা? বড় বাবুর ভাইপো, মেজ বাবুর ভাগনে, ছোট বাবুর শালা, সব উমেদার; তুমি এলে কাজ খুঁজতে! অপর পথ দেখ।" গভর্ণমেণ্টের আফিসে ক ধারায় কাজ হয়, ত গ ধারায় বাধা পড়ে। একজন বলিয়াছিল "উড়িয়া বেয়ারা চাই; কিন্তু শুধু যেমন তেমন উড়িয়া হলে চলবে না। পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, এক মণ তের সের ওজন, ৩৬ ইঞ্চি ছাতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ঈষৎ টেরা, তোতলা ও টাক মাথা ব্যক্তির প্রয়োজন, তাছাড়া আবেদনকারীর পিত্রালয় বালেশ্বর, ও মাতুলালয় কটকে হওয়া চাই। গভর্ণমেণ্টের দরজার ঘা মারিয়া চাকরী পাওয়া প্রায় উক্তরূপ গোলযোগে পূর্ণ। জাতি, ধর্ম্ম,

পরিবার, পলিটিকস, সুপারিশ ইত্যাদির ধাক্কায় শরীর ও মনের গুণা-গুণ কোন অতলে তলাইয়া যায় তাহাঁর ঠিকানা মিলে না।

প্রাচীন সভ্যতায় লোকে ছোঁট ছোট গ্রামে বাস করিত ও প্রত্যেকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। খুব অতিরিক্ত একটা কিছু অকস্মাৎ, জুটিয়াও যাইত না ; আবার দিক হারাইয়া ঘুরিয়া মরিবার আশঙ্কাও ছিল না। বর্ত্তমান সভ্যতার বিরাট কেন্দ্রীভূত জীবন যাত্রায় মানুষ তাহার স্বভাবের বাস ভূমি ছাড়িয়া একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া বেড়ায় যেখানে সে তাহার কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিয়া নিজ জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার প্রচেষ্টা বিফল হয় কারণ কেহ পথ দেখাইয়া দেয় না, কেহ বলিয়া দেয় না, "এই তোমার জায়গা।" বহু মনিবের মনিবীয়ানা ও অসংখ্য মালিকের অধিকার বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া মানুষ ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া দুর্দ্দশার নিম্নতম স্তরে গিয়া পড়ে। প্রকৃতির সন্তান মানুষ আদিম যুগে অরণ্যের বক্ষে নিজ বাহু বলে জায়গা করিয়া লইত। অক্ষম হইলে বাঁচিবার উপায় থাকিত না। কিন্তু সক্ষম হইলেও তাহাকে কেহ হাত পা বাঁধিয়া অক্ষম করিয়া রাখিত না। বর্ত্তমান জগতে কত শত সহস্র বুদ্ধিমান ও কর্ম্মক্ষম যুবক যে শুধু ঘুরিয়া মরিতেছে "কি করি, কোথায় যাই" এই বলিয়া, তাহার হিসাব নাই। মানুষের জীবন এখনও খুবই অসম্পূর্ণ। শত কোটি মানবের শ্রমশক্তি এখন সহস্র সহস্র বৎসর পুর্ণ আবেগে নিযুক্ত হইলে তবে সে অসম্পূর্ণতা দুর হইবে। কিন্তু সে শ্রমশক্তি যথা স্থানে পৌছাইতে পারে না। কেননা ঘাঁটিদারের সংখ্যা অগুন্তি এবং এক একটি ঘাঁটি পার হইতেই এক একটা মানুষের জীবন শেষ হইয়া যায়।

ভারতের মানুষ। তার সভ্যতা অতি পুরাতন। সে তাই ঐ নূতন আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে কিন্তু নিরাশ হইতেছে না। আশা, একটা হিল্লে হইবেই হইবে। আমাদের না হইলেও হয়ত পুত্র কিম্বা পৌত্রের হইবে। যদি সত্যকার নৈরাশ্য কখন আসে ত ভারতে প্রলয়ের সূচনা হইবে সন্দেহ নাই।

(১১)

"বিজয় দার্জ্জিলিং যাবে?"

"দার্জ্জিলিং যাব, মানে? ওদিকে বাড়ীর থেকে চিঠি এসেছে, পরীক্ষা হয়ে গেলেই চলে আসবে। দার্জ্জিলিং যাওয়া হবে না; তুমি যাবে নাকি?"

"প্রফেসর গুহ বলছিলেন একটা বাড়ী নিয়েছেন। আমরা যদি যেতে চাইত তাঁর ওখানেই থাকতে পারি। আমার অনেক কাল সখ একবার হিমালয় ভ্রমণ করে আসি। এমন সুবিধে আর হবে না।"

বিজয় মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমার ত যাবার ইচ্ছে, কিন্তু বাড়ীর তাগাদায় কি আর পারা যাবে? না ভাই, তুমি যাও আমার গিয়ে কাজ নেই। বাবা লিখেছেন যে এর পর যদি চাকুরীতে ঢুকি, হয়ত, কত দূর দেশে গিয়ে থাকতে হবে। এই ছুটিটা তাই দেশেই কাটাতে হবে।"

অমর বলিল, "তা আর কি হবে, তা হলে আমিই যাই।"

দার্জ্জিলিংয়ে শীত বেশী; তাই কয়দিন দুই বন্ধু বাজারে ঘুরিয়া অমরের ওভার কোট, গরম মোজা ইত্যাদি ক্রয় করিয়া বেড়াইল ও

বিজয়ও নিজের পরিবারবর্গের অর্ডার মত বিভিন্ন দ্রব্যাদি কিনিয়া জমা করিতে লাগিল।

যে দিন বিজয় গ্রামে চলিয়া গেল সেই দিন রাত্রেই অমর দার্জ্জিলিং যাত্রা করিল। প্রফেসর গুহ কয়েকদিন পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন।

ভোর বেলা শিলিগুড়ি পৌঁছাইয়া অমর প্রথম হিমালয় দেখিল। অনন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতমালা, দুর্ভেদ্য প্রাকারের মত দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। অমর ভাবিল যদি সানুদেশেই এই তাহা হইলে উপরে কি তাহা আন্দাজেই বোঝা যায়।

পাহাড়ে রেলগাড়ীর ছোট ছোট গাড়ী ও ইঞ্জিন দেখিতে খেলার জিনিসের মত কিন্তু যখন চলিতে আরম্ভ করিল তখন তাহার যে ভিতরে শক্তি আছে তাহা বেশ বুঝা গেল। হাঁফাইয়া, ফুঁকাইয়া, থামিয়া, ঝটকা দিয়া, আগু পিছু করিয়া ও পাকের উপর পাক খাইয়া সে গাড়ী পাহাড় অতিক্রম করিতে সুরু করিল। পার্ব্বত্য মানুষ যেমন তাহার ক্ষুদ্র দেহে অসীম শক্তি ধারণ করে ও ভারি ভারি মোট বহিয়া হাজার হাজার ফুট পাহাড় অতিক্রম করে; হিমালয়ের রেলগাড়ীও তেমনি ক্ষুদ্রকায় হইলেও পর্ব্বত শিখর অতিক্রম করিয়া নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কারসিয়ং পার হইতেই ঠাণ্ডা পড়িয়া গেল। অমর ওভার কোট বাহির করিয়া পরিয়া লইল। পাহাড়ী মেয়েরা ডোকো পৃষ্ঠে মাল বহন করিতেছে, কেহ বা পুঁথির মালা বিক্রয় করিতেছে। অবরোধ প্রথা নাই এবং পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা থাকে না। ক্রমশঃ সোনাদার ঝাউবনের ভিতর দিয়া গাড়ী মেঘের কোলে লুকান ঘুম স্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঘের সহিত এতটা ঘনিষ্ঠতা অমরের জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে

নাই। ভিজে কাপড়ের মত সে মেঘের আবরণ সকলের মুখ চোখ চুল ভিজাইয়া তুলিল। মেঘের একটা গন্ধও যেন আছে। অমর তন্ময় হইয়া এই নূতন উপলব্ধির মধ্যে আত্মহারা হইয়া বুঝিতেও পারিল না যে কখন গাড়ী ঘুম স্টেসন ছাড়িয়া দার্জ্জিলিংয়ের পথে গড়াইয়া নামিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ একটা মোড় ফিরিতেই গাড়ীটা নিবিড় মেঘের কোল হইতে অকস্মাৎ প্রখর রৌদ্রের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দূরে অল্প নীচে দার্জ্জিলিংয়ের রং বেরংয়ের ঘরবাড়ী সবুজ ঘাসের বনে রঙ্গীন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। একজন সহযাত্রী বলিলেন "আর দেরী নেই। এইবার সহরের মধ্যে এসে পড়লাম।"

সহরের মধ্য দিয়া বেশ কিছুকাল চলিবার পরে দার্জ্জিলিং স্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমিয়া আসিয়া বলিল, "এই যে, শেষ অবধি তাহলে এসে পৌছালেন। চলুন একটা কুলী ডেকে বেরিয়ে পড়া যাক।"

অমর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাবা এলেন না? বাড়ী বুঝি খুব কাছে?"

"না; এই আধ মাইল হবে। একটু উপরে! চলুন না এখনি পৌছে যাবেন। এখানে আমি অনেক সময় একলাই ঘুরে বেড়াই। পর্দ্দা টর্দ্দা এদেশে নেই। বাবাকে আর সেইজন্যে আনলাম না।"

একটি পাহাড়ী মেয়ে অমরের বাক্স ও বিছানা পিঠে ঝুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কোথায় যাইতে হইবে। অমিয়া বাড়ীর নাম বলিতেই সে হন হন করিয়া আগাইয়া চলিল। অমর ইহাতে ব্যস্ত হইতেছে দেখিয়া অমিয়া বলিল, "এদেশে মাল নিয়ে পালানর রীতি নেই।

আপনার জিনিস খুব নিরাপদে যথাস্থানে পৌঁছে যাবে; ভয় পাবেন না।”

“না না, ভয় পাচ্ছি না। তবে প্রথমে মেয়ে কুলী আর তার উপরে ও রকম করে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে গেল; তাই কোমলা বঙ্গ ললনার মুল্লুক থেকে এসে ‘রিঅ্যাকশন’টা চমৎকানি জাতীয় হয়েছে আর কি! আসল স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ দেখছি, দার্জ্জিলিং।”

অমিয়া বলিল, “মোট বওয়াটা খুব স্বাধীনতার পরিচায়ক নয়। তবে অবাধে ঘুরে বেড়ানটা বিশেষ প্রশংসনীয়, বলা বাহুল্য।”

“হ্যাঁ মোটটা ছেলেদেরই বওয়া উচিত, কি বলেন! আসল স্ত্রী স্বাধীনতা সেখানেই যেখানে পুরুষেরা সব মেহন্নতটুকু করে দেয় আর দাবী দাওয়া সব মেয়েদের, কেমন?”

“নিশ্চয়, এত সহজ কথাটা বুঝতে আপনার এতদূর রেলে চড়ে আসতে হ’ল! অধিকার বর্জ্জিত স্বাধীনতা নিছক আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ও রকম অবাস্তব পুরস্কার পেয়ে লাভটা কি? স্বাধীনতা মানবভোগ্য হ’তে হ’লে পরের উপর জুলুম করার অধিকার তার সঙ্গে সঙ্গে আসা দরকার।”

“আপনি দেখছি ‘ইম্পিরিয়ালিজম্’ প্রচার করতে চান। কেন, সমাধিকারের উপরে কি সমাজ গঠন হতে পারে না?”

“সমাধিকার অতি বড় পরাধীনতা। কারুর থেকে একটুকু বেশী পেলাম না, সে আবার কি রকম কাম্য? স্ত্রী স্বাধীনতা মানেই পুরুষের দাসত্ব। মানুষ মাত্রেই হয় মনিব নয় চাকর। মনিবও না চাকরও না সে আবার কেমনতর মানুষ। চিন্তার ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে কিন্তু রক্ত মাংসের মানব সমাজে তা কষ্ট কল্পিত বৈষম্য মাত্র।”

অমিয়া এই জাতীয় কূট তর্ক করিয়া খুব খুসী মনে হাসিতে আরম্ভ করিল। অমর ভাবিল 'খুব বুদ্ধি আছে এঁর, মানতেই হবে, কিন্তু তর্কে পরাজিত হ'লে চলবে না। পরে আর একবার দেখা যাবে এখন। হাঁফাইতে হাঁফাইতে গোটা দশ ব্যাঁক পার হইয়া দুজনে বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল। ছোট বাড়ী, ইঁট পাথরের সহিত সম্বন্ধ কম। শুধু কাচ আর কাঠ। ছাদও টিনের। অথচ বাগানের মধ্যে ছবির মত সাজান। অমর বলিল, "বড় সুন্দর বাড়ীখানা ত!"

প্রফেসর গুহ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এস বাবা এস। বিজয় বুঝি আসতে পারল না? তোমার জন্যে এই সামনের ঘরটা ঠিক করা হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে নেও, তারপর একটু খেয়ে ঘুরে আসবে এখন খানিকটা।"

অমর নিজের ঘরে গিয়া প্রসাধনান্তে পুনর্ব্বার বাহিরের ছোট বারান্দাটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন উত্তরে আবছা মেঘের অন্তরালে কাঞ্চনজঙ্ঘার নীলাভ রূপালী শিখরমালা অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। যেন শুভ্র মসলীনের ওড়নার আড়ালে রৌপ্যোজ্জ্বল কিংখাবের ঝিকি-মিকি। অমর এ দৃশ্যের প্রভাবে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। অমিয়া আসিয়া বলিল, "কাব্যের পথে চলতে হ'লে আগে কিছু খেয়ে নেওয়াই প্রশস্ত, কেননা একবার ভাবের বান ডাকলে কবিদের আহার নিদ্রা ভুলে-যাওয়াই রীতি। সুতরাং সময় থাকতে খেয়ে নি'ন।"

"এ দৃশ্যের সামনে আপনার খাওয়ার কথা মনে পড়ে! আমার ত মনে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তাকিয়ে বসে থাকতে পারি।"

"ওটা ব্যাধির মামুলি লক্ষণ মাত্র; নতুন কিছু নয়। ছোট, বড়, মাঝারি, সব রকম মগজেই ঐ রকম ভাব জাগে, সুতরাং খুব উতলা

হবার কিছু নেই। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঐখানেই থাকবে কিন্তু খাবারটা না আসতে পারে এখন না খেলে। চলুন!"

অমর অগত্যা খাবার ঘরে চলিল। গুহ মহাশয়ের এক বিধবা ভগিনী রন্ধনের ব্যবস্থা করেন। তিনি বহুকাল ভায়ের বাড়ী আসেন নাই, তাই তাঁহাকে গুহ মহাশয় দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিতে আনিয়াছেন। অমর হঠাৎ লক্ষ্য করিল যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সান্নিধ্যে তাহার ক্ষুধার কিছু মাত্র হানি হয় নাই, বরং মনে হইল ক্ষুধাটাও হিমালয়ের মত অনন্তব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিসীমা বলিলেন "আর একটু ভাত মাংস দি বাবা?" অমর বলিল, "না না, আর থাক!" অমিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার না টা তেমন আন্তরিক মনে হচ্চে না: দেও না পিসীমা বেশ খানিকটা।"

অমর উচ্চবাচ্য না করিয়া খাইয়া চলিল। অবশেষে খাওয়া সমাপ্ত হইল। সকলে আচমনান্তে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। অমর বলিল, আমি একটু ঘুরে আসি। অমিয়া বলিল, "পথ হারাবেন না আশা করি। এই নীচের রাস্তাটা ধরে বরাবর চলে যান, আবার সোজা পথে ফিরে আসবেন।"

অমর হাসিয়া ফেলিল, "আমার কি এতই বুদ্ধি কম যে এইটুকু জায়গায় পথ হারিয়ে বসব?"

"পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে হারাবেন না; কিন্তু চক্ষে চির-তুষারের ছায়া, মনে অনন্তের পিপাসা, বক্ষে অজানার আকর্ষণ সব কিছু এক সঙ্গে জুটে গেলে মানুষ আবার বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়েও পথ হারিয়ে ফেলে। আপনাকে ত জানতাম রবীন হুড, স্যর গ্যালাহাড আর জ্যাক ডেম্পসির খিচুড়ি বলেই, কিন্তু যেমন করে পাহাড়

দেখছিলেন ; ভয় হয় হঠাৎ আজন্ম সঞ্চিত বাস্তব মাংসপেশীগুলি ভাবের তাড়নায় নিছক কাব্য অনুভূতিতে না পরিণত হয়ে যায়।"

"আপনার জ্বালায় দেখি শেষ অবধি কোন দিকে তাকানও চলবে না।"

"তাকাবেন না কেন ? কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিকের মত সব কিছু দেখবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা অর্থাৎ এত কোটি ঘন ফুট পরিমাণ পাথর, মাটি আর বরফ। রং হাল্কা ধূসর ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝলেন ? অবাক হয়ে, তন্ময় হয়ে কিম্বা ঐ রকম কোন ভাবে দেখবেন না।"

"মানে চাঁদ দেখতে হলে, হাতে একটা নোট বই নিয়ে লিখতে হবে, পেতলের থালার মত ফাটা চটা কলঙ্ক ধরা, স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না, সম্ভবত টক ও গাঁদা ফুলের মত ; ওজনে হাল্কা নয়ত হাওয়ায় ভেসে আছে কেন, ইত্যাদি, কি বলেন ?"

"ঠিক বলেছেন ! দেখুন এর মধ্যেই আমার উপদেশের ফল ফলছে, আপনার বুদ্ধি বেশ খুলে আসছে।"

গুরু মহাশয় কন্যার ও ছাত্রের এই তর্কযুদ্ধের অভিনয় সহাস্য বদনে শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "এইবার ছেড়ে দেও মা ওকে একটু বেড়িয়ে আসতে দেও। তোমার বক্তৃতা সুরু হলে আর নিস্তার নেই।"

অমর একটা ছাতা হাতে বাহির হইয়া পড়িল। দার্জিলিংয়ের রাস্তায় সকল সময়েই লোকে বেড়াইতে বাহির হয় ; কেননা ভোজন, শয়ন ও ভ্রমণ ব্যতীত এখানে আর কিছু করিবার নাই। পথে চলিতে চলিতে অমর ভাবিতে লাগিল অমিয়ার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা। মেয়েটির বুদ্ধি তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত একাধারে দ্রুতগতি ও চঞ্চল এবং প্রশান্ত

ও গভীর। এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। বেশ মেয়ে! ডাণ্ডিতে চড়িয়া এক স্থূলকায় ব্যক্তি কোথায় যেন চলিয়াছেন। ডাণ্ডি, যান হিসাবে প্রকৃত আভিজাত্যের পরিচায়ক। একেবারে স্কন্ধে আরোহণের চূড়ান্ত! পতনাশঙ্কা থাকিলেও মানুষ ডাণ্ডিতে বসিয়া সত্য সত্যই নিজেকে উন্নত মনে করিতে পারে। জনা কয়েক ফিরিঙ্গী নরনারী উচ্চ কণ্ঠে গত কল্যকার নাচের বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়া গেল। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে শুনা যায় গঙ্গাজলের দৈবভাব দ্বিগুণ হইয়া দেখা দেয়। দুই জাতির সংমিশ্রণে তেমনি গুণবান কুলের গুণাবলি অধিকতর জাগ্রতরূপে দেখা দেয়। দুইজন সাবধানী ভদ্রলোক আপাদমস্তক পশমে মুড়িয়া চলিয়াছেন। মাথায় 'নাইট ক্যাপ' উত্তমাঙ্গে গরম 'সার্ট' ও 'ওভার কোট', গলায় 'কম্ফটার' পায়ে মোটা ও ভারি জুতা। স্বাদেশিকতা রক্ষার্থে হাঁটুর উপরে নীচে ১০ ইঞ্চি প্রমাণ উন্মুক্ত অঙ্গশোভা ও মিহি শান্তিপুরী ধুতির তরঙ্গায়িত ইতস্ততঃ উঁকিঝুঁকি। মানুষের সকল অঙ্গে যে শৈত্যানুভূতি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে না তাহার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাঙ্গালীর ধুতি। শীতের প্রকোপ যতই বাড়িতে থাকুক না কেন বাঙ্গালী সর্ব্বাঙ্গে সে কথা স্বীকার করিয়া শাল, কম্ফর্টার, ব্যালাক্লাভা ক্যাপ, সোয়েটার, মোজার বন্যা ডাকাইয়াও ঐ হাঁটুর কাছ বরাবর বিদ্রোহের পতাকারূপে শুধু ধুতি উড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এটা জাতীয়তা, সুন্দরের সাধনা, সংস্কার অথবা একটা জটিল 'কমপ্লেক্স' তাহা কে বলিবে?

একজন বলিলেন, "স্যানিটেরিয়ামে খেতে দেয় ভাল, কি বল?"

অপর এক ব্যক্তি একমত হইয়া রায় দিলেন, "হ্যাঁ, তা মন্দ কি;

আজ আটখানা 'কাটলেট' খেয়েছি, তা ছাড়া লুচি, তরকারী, ছোলার ডাল রুই মাছ আর 'চিকেন'।"

অমর শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। এ রকম রাঘব বোয়ালের রাজ্যে সে যদি একটু মাংস ভাত বেশী খাইয়াও থাকে ত তাহা মার্জ্জনীয়।

সহরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এখানে ঘর বাড়ী ঘন করিয়া গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ খালি জমি কিম্বা বাগান আর বড় একটা দেখা যায় না। শুধু দেয়ালের সঙ্গে দেয়াল ও দরজা জানালার মেলা। পাহাড়ী, নেপালি, ভুটিয়া ও তৎসঙ্গে চীনা, পার্শি, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর ভিড়। কোথাও এক আধ জন ইংরেজ সকল আভিজাত্যের প্রকট অভিব্যক্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ক্লাবের পথে চলিয়াছে।

অমর প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পথে পথে ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিল। তখন প্রায় চা খাবার সময় হইয়া আসিয়াছে। গুহ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "সহর প্রায় সব ঘুরে এলাম। নানান প্রকার জীবও দেখলাম। বেশ জায়গা, শুধু বাজারের দিকটা খুব ঘিঞ্জি। এদিকটা বেশ ভাল।"

অমিয়া আসিয়া বলিল, "এখন বেশ 'নর্মাল' দেখাচ্ছে। কবিত্বের ধাক্কাটা গা ঘেঁসে গেছে। খুব বেঁচে গিয়েছেন এ যাত্রা!"

"অত জোর করে বলবেন না। এখনি হয়ত হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে পাঁঠার ঝোল আর লুচির বর্ণনা লিখতে আরম্ভ করে দেব।"

"এখন চলুন চা খাবেন। পরে কাব্য চর্চ্চা করবেন এখন।"

*   *   *   *

"আমি আর হাঁটতে পারছি না। এইখানে বসে থাকি, তোমরা বরং ঘুরে এস।" এই বলিয়া প্রফেসর গুহ দার্জ্জিলিংয়ের ম্যাল বা চৌরাস্তার একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন। অমিয়া ও অমর ক্যালকাটা রোডের দিকে বেড়াইতে চলিল। এই রাস্তাটি দেয়ালের মত প্রায় খাড়া পাহাড়ের গায়ে কাটিয়া বসান। এখান হইতে মনে হয়, কেহ গড়াইয়া পড়িলে হাজার হাজার ফুট নিম্নে রঙ্গিত নদীর বক্ষে গিয়া পড়িবে। স্থানে স্থানে মাটি ধ্বসিয়া বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি এই ভাবে পাহাড়ের গায়ে, প্রশস্ত আঘাত চিহ্ন রাখিয়া সহস্র সহস্র ফুট নীচে গিয়া পড়িয়াছে। তাণ্ডবের খেলা, ক্ষুদ্র প্রাণ মানবের মনে ভয়ের সঞ্চার করে, ধরণীর বিশাল বক্ষে নিজের স্থান সম্বন্ধে সন্দেহের সূচনা করে। মনে হয়, ঝড়ের গর্জ্জন, ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশ হইতে প্রবল ধারে বারি বর্ষণ ও তন্মধ্যে গম্ভীর নির্ঘোষে লক্ষ লক্ষ মণ মাটি, প্রস্তর ও বৃক্ষ তরুলতা অপ্রতিহত গতিতে গড়াইয়া চলিয়াছে। কল্পনা করিলেও ভীতির সঞ্চার হয়।

অমর বলিল, "দেখলে ভয় করে, না?"

অমিয়া মনে মনে এই কথায় সায় দিলেও উত্তরে বলিল, "ভয় পাওয়াটা মানুষের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ভয় যদি পেতে হয় ত অল্পেতেই পাওয়া যায়, আবার ভয় না পাওয়া অভ্যাস করলে কোন রকমেই মানুষ ভয় না পেতে পারে।"

"আপনার ভয় পাচ্ছে কি না? এখান থেকে গড়ালেই কোথায় গিয়ে পড়তে হবে তার ঠিকানাই নেই।"

"হ্যাঁ, কিন্তু না গড়ালেই হ'ল। তা হলেই আর ভয়ের কিছু থাকে না।"

অমর হাসিয়া বলিল, "আপনি তর্কের খাতিরে অতি সোজা কথাও মেনে নেবেন না, কেমন?"

অমিয়া বলিল, "এই দেখুন না, আমি একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তা হলে ত বিশ্বাস হবে যে ভয় পাই নি।"

অমিয়া রাস্তার ধারে যাইতে আরম্ভ করা মাত্র অমর ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি করছেন; চলে আসুন এই দিকে!" অমিয়া তাহার কথা না শুনায় সে খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে রাস্তার ভিতর দিকে টানিয়া লইল। অমিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমার থেকে ত আপনারই ভয় বেশী দেখছি।"

অমর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমায় বলেন ত আমি ধারে ছেড়ে, একটু নেমেও দাঁড়াতে পারি; কিন্তু আপনি ঐ রকম করে ধারে চলে গেলেন বলেই ভয় হ'ল। এই দেখুন আমি যাচ্ছি।"

এবারে অমিয়ার মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। সে বলিল, "না, না, আপনার বাহাদুরী করতে হবে না। আমি মেনে নিলাম আপনার খুব সাহস; যাবেন না ও দিকে।"

অমর অমিয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল যে সে সত্যই উদ্বিগ্ন। একটু হাসিয়া বলিল, "চলুন হাঁটা যাক, এ সব বাজে তর্ক ছেড়ে।"

দুজনে পাশাপাশি প্রায় আধ মাইল হাঁটিয়া পুনরায় ঘুরিয়া ম্যালের দিকে চলিল। চারিদিকের নিস্তব্ধ প্রকৃতির অনুকরণে তাহারাও নির্ব্বাক। শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক আর দুইটি মানুষের পায়ের আওয়াজ। ম্যালের কাছাকাছি আসিয়া অমিয়া বলিল, "বেশ ভাল লাগল বেড়ানটা আজকের। আপনার নিশ্চয় খুব 'বোরিং' লাগল? বিজয়বাবু কিম্বা আর কেউ নেই যে দুট কথা বলেন!"

অমর মনে মনে বলিল, "না গো মেয়েটি, মোটেই 'বোরিং' লাগেনি। তোমার সান্নিধ্য খুবই ভাল লেগেছে। কিন্তু মোটেই তোমায় এ কথা জানতে দিচ্ছি না।" বলিল "বোরিং লাগবে কেন? সমস্তক্ষণই কি মানুষ কথা বলে?"

"বিশেষ করে উপযুক্ত লোক না পেলে; কি বলেন?" এই বলিয়া অমিয়া হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে অমরের দিকে তাকাইল। অমর চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, আপনি খুব অনুপযুক্ত লোক এ কথা কে বল্লে; আপনার সঙ্গে ত আমি কথায় পারি না।"

অমিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আপনি বিনয়ের অবতার। আমি অল্পবুদ্ধি নারী, আমার সঙ্গে কথায় পারে না এমন কথা বলবেন না; ভারতীয় পুরুষের বড়ই অযোগ্য কথা। আমরা ত আপনাদের তুলনায় কিছুই নয়। শাস্ত্রে তাই বলে না?"

"ভারতীয় পুরুষের প্রতিনিধি ত নই আমি, ত একথার জবাব আমি কি করে দেব?"

* * * * * *

দুপুরের ডাকে বিজয়ের একখানা পত্র আসিয়াছিল। কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা ও চিন্তাপূর্ণ পত্র। অমর মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বারান্দায় চিঠিখানি পড়িতে লাগিল......

"গ্রামে ফিরে এসে প্রথম কয়দিন মন্দ লাগেনি। তারপর থেকেই বাহির মহলে খালি চাকরী আর ব্যবসায়ের কথা ও অন্দর মহলে বিবাহের আলোচনা। উভয় সঙ্কটে শেষ অবধি শালবনে পালিয়ে বেড়ান ছাড়া আর উপায় দেখি না।

"একদল গুরুজনের মত যে সহুরে শিক্ষার পর গ্রামে থাকা কারও পক্ষে সম্ভব না ; সুতরাং আমার গ্রাম ছেড়ে সহরে চাকরী নিয়ে থাকাই স্থির নিশ্চয়। আমি অবশ্য তর্কের খাতিরে বললাম যে গ্রামে থেকেই নিজেদের কাজ কারবার দেখে তার আরও উন্নতি করা যায়। খুড়ো-মশায় হেসে উড়িয়ে দিলেন কথাটা। পাশ করা ছেলে নাকি আবার কাজ কারবার দেখতে পারে ? কেউ কখন শুনেছ এমন কথা ? যেন শিক্ষাটা সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষমতা লাভেরই একটা পন্থা !

"আর একদলের মত চাকরী না করলেও চলে কিন্তু সহরে কোন ব্যবসা ফাঁদলে ভাল হয়। কারণ গ্রামে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাহারও কাহারও মত সরকারী চাকরী চেষ্টা করা। হলে ভালই ; না হলে না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। গ্রামে থেকে কাজ কারবার দেখা সম্ভব নয় : কেননা গ্রামের বিধিব্যবস্থা চিরন্তন, তার উন্নতি অবনতি কিছু হতে পারে না। এইরকম কথা শুনলে বোঝা যায় ভারতবর্ষের এইরকম দৈন্য কেন ঘটেছে। সব শিক্ষিত লোকই যদি গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে যায় ত গ্রামের কোনও পরিবর্ত্তন হবে না। এ একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যারা লেখা পড়া করবে না তারাই গ্রামের কাজ চালিয়ে চলবে। লেখাপড়া করা ছেলেরা সব অপেক্ষা-কৃত "উঁচু দরের" কাজে চলে যাবে।

"আমি সকলকেই বলছি যে উপস্থিত আরও অনেকদূর লেখাপড়া চললে পরে এসব কথার আলোচনা করা যাবে। চাকুরীর 'নমিনেশনের' জন্যে অবশ্য এখন থেকেই চেষ্টা চলছে। তোমার আশা করি হিমাচল ভ্রমণ ভালই হচ্ছে। প্রফেসর গুহকে আমার প্রণাম জানিও ও মিস্ গুহকে সশ্রদ্ধ নমস্কার।"

অমর চিঠিখানা পড়া সম্পন্ন করিল। অমিয়া আসিয়া বলিল "প্রবন্ধ না পত্র? প্রায় আধঘণ্টা খালি পড়েই চলেছেন।"

অমর বলিল, "বিজয় লিখেছে। আপনাকে নমস্কার জানিয়েছে।"

"আমার প্রতিনমস্কার জানিয়ে দেবেন।"

অমর বিজয়ের পত্রের উত্তরে লিখিল।.........

"তুমি অবশ্য আমার মত জিজ্ঞাসা করে কিছু লেখ নি। আমি কিন্তু ধরে নিচ্ছি যে মত যদি কিছু প্রকাশ করি ত তুমি কিছু মনে করবে না। ভাল লাগলে মত গ্রহণ করতে পারো আর অপছন্দ হলে কোন চিন্তা না করে সে মত অবহেলা করো।

"বাংলার সকল গ্রামে ভাল স্কুল, ভাল রাস্তা, হাঁসপাতাল, কৃষি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হওয়া চাই। আর চাই সকল গ্রামবাসীর এই কথাটা কার্য্যতঃ শেখা যে স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয়, বুদ্ধির বিকাশ, কল কব্জা ব্যবহার, কৃষির উন্নতি, গ্রাম্য ব্যবসার উপযুক্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যতীত গ্রামের ও দেশের উন্নতি অসম্ভব। দুকথায় যা লিখে দেওয়া যায়, সারা জীবন খাটলেও তা হয়তো কাজে হয় না। তাই শত সহস্র লোকের সমবেত চেষ্টা ছাড়া আমাদের দেশের সে সুদিন আসবে না যখন সারা দেশের সুস্থ, সবল, সুশিক্ষিত লোকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে উচ্চ ধরণের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করবে। এটা খালি সম্ভব হবে যদি বহুলোকে গ্রামের অসুবিধা সহ্য করেও গ্রামে বাস করে ও ক্রমাগত চেষ্টা করে গ্রামের উন্নতি করতে।

"চাকরী করা আমাদের জাতিগত পেশা। এর ফলে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলী শুধু চাকরীর আশ্রয়েই পূর্ণতা লাভ করে। অন্য দেশে স্বাধীন মানুষ নিজের অন্তরের প্রেরণায় বিজ্ঞান চর্চ্চা

করে কিম্বা আদর্শের জন্যে আত্মদান করে। আমরা চাকরী জুটলে বড় বড় 'রিসার্চ্চ' করি কিম্বা অসীম সাহসের কাজ করে বসি। স্বাধীন ভাবে থাকা আমাদের চোখে দুর্দ্দশার চরম ও সে অবস্থায় আমরা কোন প্রচেষ্টায় মেতে উঠি না।

'গভর্ণমেণ্টের যদি দুটো চারটে ডিপার্টমেণ্ট বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর দুচার রকম কাজে ভারতবাসীরা যশলাভ করতে পারে। বর্ত্তমানে শুধু যে কয় রকম ডিপার্টমেণ্ট আছে, সেই কয় রকম কাজেই ভারতীয়েরা নাম কিনতে পেরেছে।

"তুমি ভবিষ্যতে কি করবে তুমিই জান। আমার মনে হয় তোমার গ্রামেই থেকে গ্রামের মানুষ, গ্রামের আর্থিক পরিস্থিতি ও গ্রামের জীবন এই সবের সংস্কৃতি ও উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। এতে হয়ত তোমার জীবন সাংসারিক ভাবে তেমন সফল হবে না, কিন্তু দেশের ভবিষ্যতের জন্যে এরকম স্বার্থত্যাগ দরকার। লোক চক্ষের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানও ত্যাগ কিন্তু তাতে কাগজে নাম উঠল, সকলে জানল আর দেখল এই বিজ্ঞাপনের একটা মাদকতা আছে। এর চেয়ে বড় ত্যাগ লোক চক্ষুর অন্তরালে, অজানা অবস্থায় কাজ করে যাওয়া।

"হিমালয়ের দৃশ্য খুবই সুন্দর। চটকদার নয়; গম্ভীর, বিরাট, অনন্ত ও অসীম সৌন্দর্য্যময়। মানেটা ঠিক বুঝলে কিনা জানিনা। পুরীর সমুদ্রের যে সৌন্দর্য্য এ তার নিশ্চল প্রতিকৃতি।"

অমিয়া আসিয়া বলিল, "কি, প্রবন্ধের উত্তরে প্রবন্ধ লিখে দিন কাটাচ্ছেন? চলুন ওটা ডাকে দিয়ে দুইজনে একটু বেড়িয়ে আসবেন।"

অমর চিঠিখানা খামে বন্ধ করিয়া অমিয়ার সঙ্গে বাহির হইল। চিঠিখানা ডাকে দিয়া দুইজনে চৌরাস্তার দিকে চলিল।

অমিয়া বলিল, "পরীক্ষায় ত ভাল পাশ করবেন। তারপর?"

"তারপর কি তা কে বলতে পারে? উপস্থিত আরও লেখাপড়া পরে আবার পরীক্ষা ও চাকরী, নয়ত ভেরেণ্ডা ভাজা। এ সব ত ধরাবাঁধা আছে। ভাববার কি দরকার?"

"আপনি কি খুব ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলার মানুষ? আমার ত মনে হয় আপনি সকলে যা করে ঠিক তার উল্টা কিছু না করলে খুসী হ'ন না।"

"তার মানে? আমায় কবে দেখলেন উল্টা পথে চলতে? আমি ত এমন কিছু করি না যা বাঙ্গালীর রীতি বিরুদ্ধ।"

"যথা, জল থেকে লোক টেনে তোলা, কলেজের স্ট্রাইক ভাঙ্গা, অভদ্র লোকেদের প্রহার দেওয়া, এই সব।"

"ও সব ত প্রয়োজন হলে সবাই করে থাকে। নতুন আর কি হল?"

"তা হলে স্বীকার করছেন যে ঐ ছেলেগুলোকে প্রহার দেওয়ার মধ্যে আপনি ছিলেন?"

অমর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "কিউরিয়সিটি, দাই নেম ইজ উয়োম্যান! এই কথাটা স্বীকার করানর জন্যে আপনি এতগুলো কথা তুল্লেন?"

"ঠিক করেছিলেন কি না?"

"আচ্ছা, মেনে নিলাম, করেছিলাম। খুসী হলেন ত এবারে?"

"খুব খুসী হলাম। এর পর কিন্তু আর ওরকম কাজে যাবেন না।

ও সব খারাপ লোকেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে না যাওয়াই ভাল। ওরা না পারে এমন কাজ নেই।"

"একদিকে চান অন্যায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ন্যায়ের জয় হোক। আর পরামর্শ দিচ্ছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে না লড়তে! এর কি অর্থ?"

"ও সব লড়াই যথাসময় কেউ না কেউ করবেই। আপনার ওতে যাবার কি দরকার?"

অমর বলিল, "যথা সময়ে সব কাজই কেউ না কেউ করবে বলে নিজের কর্তব্য অবহেলা করা ঠিক নয়। এতে নিজের প্রাণ বাঁচে; কিন্তু জাতির অশেষ দুর্গতি হয়। এটা আত্মরক্ষার মন্ত্র, আদর্শ রক্ষার নয়।"

অমিয়া বলিল, "আচ্ছা মশায়, দোষ হয়েছে, ক্ষমা চাইছি। যা বলছি তার মানে হচ্ছে শুধু শুধু গায়ে পড়ে ঝগড়া নিজের উপর টেনে আনবেন না।"

"ঝগড়া জিনিষটা খুবই ব্যক্তিগত। দুইজন মানুষ কিম্বা দুই পরিবার এর মধ্যেই ঝগড়া নিবদ্ধ থাকে। উভয় পক্ষের স্বার্থপরতার জন্যেই ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। সেরকম কিছু সামনে এলে আমি সরে দাঁড়ানরই পক্ষপাতী। কিন্তু ব্যক্তিগত কলহের উপরে যা, যেখানে আদর্শের সংঘাত উপস্থিত হয়, মানে আমি যা কিছু বড় বলে মনে করি তাকে যদি অন্যে আঘাত করে, সেখানে লড়াই করতেই হবে। না করলে শুধু আমার অপমান আর ক্ষতি হবে তা নয়; আমার যে জগত, আমার মনুষ্যত্ব তাও আহত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। এমন ক্ষেত্রেও কি চুপ করে থাকতে হবে?"

অমিয়া ব্যাপারটা এত গভীরে গিয়া দাঁড়াইবে আশা করে নাই।

অমরের মুখ চোখও একটা নূতন আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, "সে অবস্থায় কি অপরের পরামর্শ কেউ মেনে চলে? আমি বলছিলাম সাধারণ ছোটখাট ঝগড়ার কথা। যে রকম ঝগড়া ছেলেরা সর্ব্বদা করে।"

অমর বুঝিল সে আলোচনাটা অযথা গুরুগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। সে অল্প হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা চলুন। তর্ক করে লাভ কি? মানুষ ত মরেই। না হয় জ্বরে নয়ত অপঘাতে। তাতে কি আসে যায়? বড় জোর দু চার জন বলবে, 'আহা ছেলেটা বেঁচে থাকলে বড় চাকরী পেত!' চাকরী পাওয়ার আগে মরা খারাপ, আর পেয়ে মরা দুর্ভাগ্য। এই না?"

অমিয়া বলিল, "অত মরা বাঁচার কথায় কি দরকার? ওগুলোকে আমাদের দেশে 'অলুক্ষুণে' কথা বলে। বলতে নেই।"

অমর হাসিয়া উঠিল, "আপনি ওসব জানেন না কি? ও সব ত বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কথা। আধুনিকাতে শোভা পায় না।"

"আধুনিকা আর অনাধুনিকা বুঝি না। যে কথা কাম্য নয়, তাই খারাপ।"

তাহারা চৌরাস্তায় আসিয়া পড়িল। এক জায়গায় একজন ভুটিয়া একটা বাক্সে কতকগুলি রং বেরংএর মালা, চুড়ী ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছিল। অমর বলিল, "আপনাকে একটা উপহার দেব; কোন আপত্তি নেই ত?"

"নিশ্চয় আছে। আপনি কেন উপহার দেবেন? চলুন দিখিনি! যাতা কিনে পয়সা নষ্ট করতে হবে না।"

"নিন না! না হয় গুরু দক্ষিণা হিসাবেই নিন। ধরুন কত

সদুপদেশ আমায় দিলেন। নিন সত্যি! না নিলে বড় দুঃখ হবে।"

"তা হোক দুঃখ! গুরু দক্ষিণা বলে ঠাট্টা করবার জন্যে আরও নেব না। না হয় আপনার বুদ্ধি বেশী; তাই বলে ঠাট্টা করাটা কেউ পছন্দ করে না।"

"আচ্ছা আমি কথাটা প্রত্যাহার করলাম। উপহার, পুরস্কার, নজরানা, জরিমানা; যা বলে নিতে চান নিন আমি তাতেই রাজি।"

অমিয়া সহাস্য বদনে অমরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "দেখুন, সাবধানে কথা বলবেন। যদি নজরানা বলেই নি, তা'হলে আপনি রাজা প্রজার সম্বন্ধে এসে পড়বেন। শেষে এত দুঃসাহসী বীরপুরুষ হয়ে হুকুম তামিল করে, চলতে হবে।"

অমর বলিল, "বেশ ত, হুকুম করে দেখুন, তালিম করি কি না। কোনটা নেবেন, লাল আর সবুজটা না এই হলদে আর সাদাটা।"

অমিয়া একটা বড় বড় দানা পুঁথির মালা বাছিয়া লইল। বলিল, "আপনার বড় উৎপাত! দেখুন ত, শুধু শুধু, পয়সা নষ্ট!"

অমর বলিল, "পয়সা থাকলে ত নষ্ট হবে? আর যে কটা পয়স গেল তার তুলনায় আনন্দটা হল বেশী, সুতরাং নষ্ট হল কি করে? লাভ হল বলুন।"

অমিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি সত্যি আনন্দ হয়ে থাকলে মানতে হবে নষ্ট হয় নি। আর যদি শুধু অকারণে কিনে থাকেন ত নষ্টই হল।"

অমর ভাবিল বলে, 'না, না, তোমায় একটু সাজিয়ে আমার সত্যিই আনন্দ হয়েছে' কিন্তু এমন কথা তাহার মুখে আসিতেই পারে না।

সে একটু লজ্জিতই হইয়া পড়িল। অমিয়াও তাহার আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "কি এত শীগগিরই অনুতাপ হচ্ছে? আমি কিন্তু মালাটা ফেরত দিচ্ছি না। চলুন।"

অমর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল, "চলুন বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক। চা খাবার সময় হয়ে এল।"

* * * * *

অমিয়া সন্ধ্যাবেলা একাকী বসিয়া ভাবিতেছিল এই বিচিত্র গুণ-সম্পন্ন যুবকের কথা। বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি, ঔদার্য্য, আদর্শবাদ—এক কথায় এতগুলি বিভিন্ন গুণের একত্র আবির্ভাব কাহারও মধ্যে বড় দেখা যায় না। বন্ধু হিসাবে ইহার সঙ্গ আনন্দদায়ক; আবার সে বন্ধুত্বের মধ্যে কখন কখন এমন ভাব আসিয়া পড়ে যখন তাহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। কখনও বা ইহার কথা শুনিয়া মনে হয় যেন শিক্ষকের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ।

অমিয়ার মনোভাব, সোজাসুজি বলিতে গেলে, অমরের খুবই সপক্ষে।

অমর নিজকক্ষে বিছানার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া জানালার চৌকাঠের উপর পা তুলিয়া দিয়া একটা পুস্তকে মনোনিবেশ করিতেছে। অর্থাৎ পুস্তকের পাতা বড় একটা উল্টাইতেছে না। চক্ষের সম্মুখে বর্ণমালা ভাসিতেছে কিন্তু তাহার কোন প্রতিচ্ছায়া মানস ক্ষেত্রে পৌছিতেছে বলিয়া মনে না। সে ভাবে মেয়েরা হাল্কা কথার মধ্যেই থাকিতে চায়; তাহা হইলে অমিয়া কেন এত গভীর ভাবে সকল কিছু দেখে, উপলব্ধি করে? সহজ হাসিতে যাহার মুখ চোখ সতত উদ্ভাসিত, সে কেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সে দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ

করিয়া গভীরতম চিন্তায় বিভোর হইয়া যায়। সকল কথাই সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, সে কি করিয়া সামান্য কথার ভিতরে গভীরের স্বাদ জাগাইয়া তোলে। অপরূপ চরিত্র মেয়েটির! লেখা পড়া লইয়া যাহার কারবার সে মেয়ের ত রুক্ষ কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। পাঠ্য পুস্তকের আবহাওয়ায় গানের সুর, হাসির ঝঙ্কার ও তাহার সহিত একান্তভাবে মিলিত হইয়া শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের গাম্ভীর্য্য কেমন করিয়া মূর্ত্ত হইল?

অমর, দ্ব্যর্থবর্জ্জিত ভাবে বলিলে, অমিয়ার প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট।

কাঞ্চনজঙ্ঘার কঠিন শীতল অঙ্গে সূর্য্যোদয়ের বর্ণ সংঘাতে ফলফুল পত্র শোভিত অরণ্যানীর বর্ণ ফুটিয়া ওঠে। মনে হয় অত উচ্চে, অত দূরে যে গিরিরাজ, তাহারও হৃদয়ের প্রবেশ পথ আছে। দার্জ্জিলিংয়ের ধোঁয়াধূলা বর্জ্জিত হাওয়ায় রাত্রের আকাশে তারাগুলি যেন আরও আলোকময়, আরও মানুষের নিকটে আসিয়া দেখা দেয়। অসীম যেন কোন অকারণ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া ধরা দিতে চায়। প্রকৃতি ডাক দিয়া বলে, অসম্ভব কিছু নাই; অনতিক্রম্য, অলঙ্ঘনীয় কোন বাধা কোথায় নাই; দূরত্ব অজেয় নহে।

*   *   *   *   *

অমিয়ার পিসিমাতা ভ্রাতাকে বলিলেন "ঐ যে ছেলেটি, অমর, ও বেশ ভাল ঘরের ছেলে না?"

গুহ মহাশয় চিন্তার পথে হোঁচট খাইয়া থামিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, কে, ওঃ অমর? হ্যাঁ, বেশ ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র।"

"ওদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করছি। ওর বাবা কি করেন?"

"তাত জানিনা। ওঃ হ্যাঁ, ওর বাবা নেই। দাদা মহাশয়ের বাড়ীতে মানুষ। আর কোন খবর জানিনা।"

"খোঁজ খবর করলে পারত! ওদের দুজনের বেশ মনের মিল আছে মনে হয়।"

"কাদের? কিসের মিল?"

"বাহাত্তর ত এখন হয় নি। এর মধ্যেই কি মাথা গুলিয়ে গেল না কি? আমাদের অমিয়ার আর তোমার ঐ ছাত্রটির।"

"ওঃ হ্যাঁ, তা হবে বই কি। এক সঙ্গে পড়ে। প্রায় একই 'সাবজেক্ট'। 'কমন ইণ্টারেষ্ট' সব।"

"আমি বাপু অত ইংরেজী কথা বুঝি না! ক মন কি কয় সের তাও বুঝিনা, তবে ভাল ঘর যদি হয় ত মেলে ভাল।"

"কি মুস্কিল! তুমি আবার কি আবোল তাবোল বকতে স্বরু করলে? ছাত্রজীবন, সবল, সুন্দর, অকলুস, তার মধ্যে ও সব কি কথা টেনে আনছ? ওরা শুনলে বড লজ্জা পাবে। আশা করি ঐ সব ছাই ভস্ম অমিয়ার কাছে বল নি।"

ভগ্নীর অতঃপর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ ঝাঁঝিয়া বলিলেন "অমিয়ার কাছে বলতে যাব কেন? আমারও কি বাহাত্তরে ধরেছে? তোমার কাছে বলছি। ছাত্র জীবন ত কি হয়েছে। আজন্ম কি ছাত্রই থাকবে না কি ওরা? মেয়ে যখন তোমার হয়েছে, আর মা মরা মেয়ে, ত আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে? খোঁজ খবর নিতে দোষ কি?"

গুহ মহাশয় কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখব এখন।"

*   *   *   *   *   *   *

অমর ও অমিয়া অকল্যাণ্ড রোড দিয়া ঘুমের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছে। ঘন শাখা প্রশাখা সবুজ গাছের ছায়ায় প্রায় সারা পথ ঢাকা। ফাঁকে ফাঁকে রোদের ঝিকিমিকি। অমর বলিল, "এই আলোর খেলা; যেন দুঃখের আবহাওয়ায় ক্ষণিকের আনন্দ সঞ্চারের মত।"

অমিয়া হাসিয়া বলিল, "প্রায় কবিতার মত। আপনি কি কবিতা লেখেন নাকি ?"

"কখনও লিখিনি। তবে চেষ্টা করলে লিখতে পারি হয়ত।"

"চেষ্টা করুন না। বেশত, সকলে বলকে সুকবি অমর কিশোর··· কি বিষয়ে কবিতা লিখবেন ?"

"বলুন না? পান্তাভাত ও পুঁইশাক কিম্বা ম্যালেরিয়া? কাব্য পারিপার্শ্বিক বর্জ্জিত হওয়া উচিত নয়।"

"না; কাব্য আতরের মত। চারিদিকের বাস্তবতার বস্তু বহুল কদর্য্য অংশ বাদ দিয়ে তার সার সুগন্ধটুকু খালি প্রকাশ করবে। বাস্তবে তার শিকড় লেগে থাকবে; কিন্তু ফুল পাতা ফুটে উঠবে উপরের মুক্ত হাওয়ায়! অলঙ্কার বিভ্রাট হ'ল; কিন্তু বুঝলেন ত ?"

"হ্যাঁ বুঝলাম। অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডের বেড়ালটার মত। বেড়ালটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়; শুধু তার দন্ত বিকাশের বিকাশ টুকুমাত্র ভেসে থাকে।

"আপনি তাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে দিলে কি হবে? কাব্যের স্বরূপ যা তা জানতেই হবে। কবিতা লিখুন তা হলে বুঝতে পারবেন।"

"তা হলে যা কিছু কাব্যের বিষয় হবে, সর্ব্বাগ্রে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তার সার পদার্থ কি তা ঠিক করতে হবে। স্নেহের খোকন সম্বন্ধে কবিতা লিখলে খোকনের বাস্তবরূপ তাতে আসতে পারবে না, শুধু তার কান্না, কি হাসি কিম্বা উল্টে পড়া, এই রকম কিছু একটা প্রকাশ করতে হবে। কবিতা পড়ে কাউকে বুঝতে হবে না যে আসল উদ্দেশ্য কে বা কি।"

"কুতর্ক করে লাভ নেই। মা, বল্লে কেউ বোঝে স্নেহ মমতা ক্ষমা ধৈর্য্য দিয়ে গড়া নারী মূর্ত্তি; কেউ বোঝে ভাত রাঁধুনী। প্রেরণা অনুসারে একই ভাব নানা রূপে প্রকাশ হবে।"

"যথা দার্জ্জিলিং বলতে কেউ বোঝে শুঁটকি মাছের গন্ধ, অধৌত দেহবস্ত্র ভুটিয়া; কেউ দেখে অনন্তে ছড়ান বরফে ঢাকা পাহাড়ের সারি; আর আমি দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে তর্কের বন্যা ছুটে চলেছে।"

"না, আপনার সঙ্গে আর কথা বলা চলবে না। আপনি তর্কে হেরে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ আরম্ভ করছেন। আমি যদি বলি আমার চোখে দার্জ্জিলিং মানে তর্ক যুদ্ধের 'নেপোলিয়নের ওয়াটার্লু'; তা হলে কেমন হয়?"

"সত্যিই হয়। আপনার সঙ্গে ত তর্কে হেরেই যাচ্ছি। শুধু আপনার যুদ্ধে জিতেও মনে করুণার উদ্রেক হয় না। 'ওয়েলিংটন' আপনার চেয়ে ক্ষমাশীল ছিলেন।"

অমিয়া বলিল, "চলুন বাড়ী ফিরে চলুন। আপনার 'সেন্ট হেলেনার' ব্যবস্থা করি।"

দুইজনে অতঃপর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সূর্য্যালোক তখনও

আলো ছায়ার খেলায় গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছুটা ছুটি করিতেছে।

অমিয়ার মুখে একবার আলো পড়িয়া আবার তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইতেছে। অমর ভাবিতে লাগিল এই তরুণীর চরিত্রের সহিত এ চিত্রের কত সাদৃশ্য। কখন উচ্ছলিত আনন্দের কলহাস্য আবার পর মুহূর্ত্তেই যুগান্তের ভাবনার নীরব গভীর ছায়া। অমিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কি চিন্তা করছেন? কাব্য না দর্শন?" অমর, ঈষৎ থামিয়া উত্তর দিল, "কাব্য ঘটিত দর্শন বা দর্শন ঘটিত কাব্য; যা বলেন।"

"কথাটা, অতিরিক্ত গভীর বা মর্ত্ত্যলোকের অতি উর্দ্ধ স্তরের কথা। মাটির মানুষের বোধগম্য নয়।"

"মাটিকে যাত্রাস্থল ধরেই ত সব গভীর বা উর্দ্ধে, অভিযানের হিসাব। মাটির মানুষ যে সেই সকল ভাবের কেন্দ্র।"

"আমার কিন্তু অহঙ্কার হচ্ছে। আর বল্লে মাটিতে পা পড়বে না। আপনি খুব উঁচু দরের চাটুকার কিন্তু।"

অমর বলিল, "খুব নীচুদরের নিন্দুক হওয়ার চেয়ে তাই ভাল নয় কি?"

"আমি কি নীচুদরের নিন্দুক না কি?"

"না, না, আপনি তা হবেন কেন? আপনি নিন্দা বা চাটুকারী কোনটারই ভিতরেই থাকেন না।"

"প্রায় তা হলে নির্ব্বাণ লাভ করে ফেলেছি বলতে হবে।"

"নিজগুণে যে ভরপুর তার মধ্যে অপরের নিন্দা বা প্রশংসার স্থান কোথায়।"

"আবার চাটুকারদের মত হচ্ছে কিন্তু!"

দুজনে বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল। বারন্দায় গুহ মহাশয় পায়চারী করিতেছিলেন। দুই জনকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি, কত মাইল হাঁটা হল?"

অমিয়া বলিল, "প্রায় ঘুম অবধি গিয়েছিলাম।"

গুহ মহাশয় বলিলেন, "অমর, তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

(১২)

টেলিগ্রামে অমরের দাদা মহাশয়ের অসুখের খবর পাইয়া অমর কলিকাতায় চলিয়া আসিল। আসিবার সময় গুহ মহাশয়কে বহু ধন্যবাদ জানাইল ও অমিয়াকে বলিল, "আপনাকে আর ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করব না। আপনাদের এখানে থেকে আমার শরীর ও মনের উন্নতি হয়েছে, এ আপনার জন্যেই অনেকটা।" অমিয়া বলিয়াছিল, "আপনার দাদামহাশয় কেমন থাকেন জানাইবেন।"

কলিকাতায় আসিয়া অমর দেখিল বৃদ্ধের অসুখ অনেকটা ভাল। ইহাতে সে নিশ্চিন্ত হইল এবং মনের কোনে একটু দুঃখও যে হইল না তা নয়—শুধু শুধুই দার্জিলিং ছাড়িয়া আসিতে হইল।

মা বলিলেন, "দার্জ্জিলিং কেমন লাগল?" অমর উত্তরে দার্জ্জিলিংয়ের যে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিল তাহা প্রাণহীন পর্ব্বতের উপর প্রায় অপব্যয় হইল বলিলেও হয়। ইষ্ট দেবতা অথবা প্রেয়সী নারী ব্যতীত কাহারও এতটা প্রশংসা করা ভাবের অপচয় মাত্র। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরু আর গুরু কন্যা খুব আদর যত্ন করলেন না কি?" পুত্র গুরুর কথা অনেকটা বলিয়া গুরু কন্যাকে উহ্য রাখিয়া

আলোচনা সমাপ্ত করিল। মা বলিলেন, "একদিন আমি যাব ওঁদের ওখানে। তোর এত আদর যত্ন করলেন ওঁরা, যাওয়াটা উচিত।" পুত্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, যাওয়াটা উচিত। ওঁরা ফিরে আসুন ; একদিন তোমায় নিয়ে যাব।"

* * * *

রাত্রে কলিকাতার গ্যাসের আলো দেখিতে দেখিতে অমর দার্জ্জিলিংএর তারকা খচিত ঘন কৃষ্ণ আকাশের কথা ভাবিতে লাগিল। ছাদে গিয়া তারা দেখিবার চেষ্টা করিল। কি রকম আবছা ভাব; আকাশও ঘোলাটে। যেন পর্ব্বত হইতে নামিয়া আকাশটাও মাটি মাখিয়া ঘোলা হইয়া উঠিয়াছে। অমর ভাবিল "দূর ছাই! এমন জায়গায় আবার মানুষ থাকে! নদীর জল ঘোলা, আকাশ ঘোলা, বাতাস ঘোলা—মনটাও ঘোলা হয়ে ওঠে।" ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া এ বই সে বই টানিয়া মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিল অমিয়াকে ; কিন্তু যা লিখিতে চায় তাহা লেখা হইল না, শুধু কতকগুলি অবান্তর কথায় গাঁথা, তাই সে খানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। রাত তখন একটা বাজিয়াছে। চারি দিক নীরব নিস্তব্ধ। অল্প দুটা একটা গাড়ী চলিতেছে। তাহারই আওয়াজ দিনের শব্দ মুখরতাকে হার মানাইয়া জানান দিতেছে। অমর শুইয়া একথা সে কথা ভাবিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া বিজয়দের মেসের দিকে যাত্রা করিল। চেনাশুনা যদি কেহ আগে আসিয়া থাকে দেখিবার জন্য মস্ত বড় মেসবাড়ী একেবারে নিঝুম। কোন সাড়া শব্দ নাই। ডাকাডাকি করিয়া একজন চাকরের ঘুম ভাঙ্গিল। সে ভীষণ বিরক্ত হইয়া নামিয়া

আসিয়া দরজা খুলিয়া অমরকে দেখিয়া মুহুর্ত্তের মধ্যে বিরক্তি চাপা দিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। বলিল এখনও বাবুরা কেহ আইসেন নাই। বোধ হয় চার পাঁচ দিন পরে আগমন আরম্ভ হইবে। অমর পুনরায় পথ ধরিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিতে লাগিল।

ক্রমশঃ লালদীঘির নিকটে আসিয়া পড়িল। তখন সবে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জন স্রোত কার্য্য স্থলের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলের মুখেই ব্যস্তভাব; অথচ সে ব্যস্ততায় কোন প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। যন্ত্র চালিতের মত সকলে ছুটিয়াছে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে সে গতির মধ্যে কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা অথবা আবেগ নাই। গত্যন্তর বিহীনের গতি। কয়েকজন মাড়োয়ারী ভাটিয়া ও বোরা মুসলমান, আজ হয় দুনিয়াটাকে বেচিবে নয় কিনিবে এই ভাবে চলিয়া গেল। এক আধজন ইংরেজ দরজা বর্জ্জিত গাড়ীতে চঞ্চল আগ্রহে চলিয়াছে। ইহারা কিছু করিবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীরা বড জোর এ সায়েব ভাল অথবা ও সায়েব মন্দ ইহার অধিক কোন আলোচনা না করিয়া "রুটিন" দেবতার পূজায় অগ্রগামী। অমর লাল দীঘির ভিতরে গিয়া একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। কিছু-ক্ষণ পরে একজন লোক আসিয়া অপরাপর দু চারটা বেঞ্চি খালি থাকা সত্ত্বেও অমরের পাশে বসিল। অমর কোন কথা না বলিয়া বসিয়া রহিল।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কোন উপায় হলো!"

অমর অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল

"কিসের উপায়?"

"এই যার জন্য সবাই ঘোরে ; তা ছাড়া আরকি ? চাকরী, চাকরী।"

অমর বলিল সে চাকরীর সন্ধান করিতেছে না। লোকটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "চাকরী খুঁজছ না, দাদা পায়ের ধূল দেও! যাক, এতদিনে একজন লোক দেখলাম যে লাল দীঘিতে বসে থেকে বলতে পারলে চাকরী চাই না! দাদার কি করা হয় ?"

"কিছু না ; আমি কলেজে পড়ি।"

"ওঃ পড় ; তাহলে চাকরী খুঁজবার খুব দেরী নেই। তবে জুটবে বলে সন্দেহ। আমার এই 'ফোর্থ ইয়ার' চলছে। এই বারে বেকার ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েট হব। সব আফিস দশ বার করে ঘুরে এসেছি। কোথাও কিছু খালি নেই। কথা হচ্ছে ; কোথাও কিছু কোন সময় খালি থাকে না ত এত ব্যাটা কাজ পায় কোথা থেকে ? সব ফন্দিবাজি আর জুয়াচুরী। চাকরী আছে, তবে ভাইপো, ভাগনে ও শালাদের জন্যে। তোমার জন্যে নয়।"

অমর বলিল "ব্যবসা করেন না কেন ?"

"ব্যবসা ? তা আর করিনি কি ? সব ফাঁকি আর জুয়াচুরী। ধনে প্রাণে মারা যাবে ওতে গেলে।"

হঠাৎ ঘড়ী দেখিয়া লোকটি উঠিয়া পড়িল। বলিল, "নমস্কার ভাই। পরে দেখা হবে' খন। এখন চল্লাম। "ফার্স্ট আওয়ারে" সায়েবদের মেজাজ ভাল থাকে। এক 'রাউণ্ড' দিয়ে আসি।"

অমর অনেকক্ষণ একাকী লালদীঘির বেঞ্চের উপর বসিয়া বসিয়া অবশেষে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। চলিতে চলিতে ক্রমাগত ঐ উমেদারীর কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। চাকরীর জন্য উন্মাদের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত মানুষের এইভাবে জীবন কাটিতেছে তাহা কে

জানে। এটা একরকম মহামারীর মতই জাতীয় জীবনের উপর জাঁকিয়া বসিয়াছে। চাকরী নাই; এই শোকে বিহ্বল হইয়া চাকরী ব্যতীত অপর কোন জীবিকা উপায়ের পথ আছে তাহা চিন্তা করিবার ক্ষমতা অবধি বাঙ্গালীর লোপ পাইয়াছে। দৈনিক দশ, দরজায় ঘা মারিয়া যে বলিতে পারে তাহার চাকরী চাই, সে কেমন না অপর দশটা দরজায় ঘা মারিয়া বলিতে পারে যে তাহার নিকট বিক্রয়ের উপযুক্ত জিনিস আছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাল বিক্রয় কি চাকরীর জন্ম ঘোরা অপেক্ষা কঠিন বা অপমানজনক কাজ? অথচ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া দরজায় দরজায় শত শত লোক ঘুরিতেছে। ইহারা অনায়াসে একই পরিশ্রমে পণ্য বিক্রয় করিয়া ঘুরিতে পারিত। আত্মসম্মানের দিক দিয়া বলিতে গেলে এই প্রকার ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা মাটি কাটা অথবা মোট বওয়া কোন অংশে ছোট কাজ নহে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই সম্ভব ও অসম্ভব বলিয়া দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাগে নিজের কার্য্য, আকাঙ্খা ও চিন্তার জগৎকে বিভক্ত করিয়া লয়। এই বিভাগ খুব সূক্ষ্ম বিচার করিয়া করে না; গতানুগতিক ভাবে অপর পাঁচজনের চালচলন দেখিয়া করিয়া লয়। যাহা একবার অসম্ভবের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে, তাহা প্রাণ গেলেও সম্ভবের এলাকায় আসিতে পারে না। বাঙ্গালীর বাল্যকাল হইতে হিসাব করা থাকে যে সে কি কি করিতে পারে না। এই কারণে ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা ও ৩০ ইঞ্চি ছাতি বেহারী যতটা শক্তিসাপেক্ষ কাজে হাত লাগায়; ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি ও ৩৬ ইঞ্চি ছাতি দ্বিগুণ শক্তি সম্পন্ন বাঙ্গালী সে কার্য্যে হাত লাগাইতে সাহস করে না। রোদে জলে গরমে কাজ করিতে পারে না। ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া মাল বেচিতে পারে না,

আরও কত কিছু পারে না। কারণ পারিবার কথা তাহার মনে কখনও জাগেনা। মনে মনে সে এই জাতীয় কাজের নিকট পূর্ব্ব হইতেই হার মানিয়া বসিয়া থাকে।

একটি বালক হঠাৎ অমরের নিকটে আসিয়া একঘেয়ে স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবু, আমার মা স্থপুরী কেটে সংসার চালান। আজ স্থপুরী কাটা হয় নি। ঘরে রান্না চড়েনি...ইত্যাদি। হাতে ছেলেটির স্কুলের ছেলেদের অনুকরণে খানকত বই ও খাতা। অমরের হঠাৎ কি মনে হইল, সে বলিল, "দেখি তুমি কি পড ?" ছেলেটির মুখ শুখাইয়া গেল। অমর পাতভাড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল কোন পাঠ্য পুস্তক তাহার মধ্যে নাই। বাহ্যিক আবরণ পাঠ্য পুস্তকের মত। ভিতরে সংবাদপত্র কাটিয়া মোটা করিয়া শেলাই করা। উপরে সংবাদপত্রের মলাট দেওয়া ও তাহাতে কালি লাগাইয়া বহু ব্যবহৃত পুস্তকের নেকি খাড়া করা হইয়াছে। অমর তাহাকে ধমকাইয়া বলিল, "তোমার লজ্জা করে না এ রকম ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতে ?" ছেলেটি কাঁদিয়া বলিল, "আর কখন করব না। খেতে পাই না ত কি করব ?" অমর তাহাকে এক আনা পয়সা দিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বালক একটা বিড়ির দোকানে উপস্থিত হইয়াছে। ছেলেটির ব্যবহারে আন্তরিক ভাবে বিরক্ত হইয়া অমর নিজ পথে চলিতে লাগিল। গৃহে পৌছিয়া মাতার সহিত তর্ক জুড়িয়া দিল যে কলিকাতার ছোট বড় সকল লোকই জুয়াচোর। মাতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে অভাবে পড়িলে মানুষের বহু অবনতি হয় এবং আমাদের জাতের বহু লোকের অবনতির কারণ অভাব। অমর বলিল অভাব হউক আর যাহাই হউক প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকিলে

মানুষের এতটা অধোগতি কখন হয় না। মা বলিলেন, "না বাবা, বহুযুগ ধরে যে অভাব পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মানুষকে পিষে ফেলে, তার ধাক্কায় লোকের মনুষ্যত্ব থাকে না। অন্য জাতের লোকেরা সকলের একটা মনুষ্যত্বের দাবী স্বীকার করে নিয়ে কাউকে অনাহারে মরতে দেয় না। আমাদের দেশের লোক কোন দিকে কোন রকম সাহায্য না পেয়ে, হতাশ হয়ে শেষ অবধি সমাজ, সভ্যতা, আদর্শ, সব ভুলে অমানুষ হয়ে ওঠে।"

অমর বলিল, "তা হলে জাতের সব লোকের এই অন্যায়ের জন্যে শাস্তি হওয়া উচিত।"

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কি হচ্ছে না।"

"কি শাস্তি হচ্ছে? যারা ক্রমাগত অন্যায় আর অত্যাচারের আড়ালে নিজেদের স্বার্থটুকু বজায় রেখে অধর্ম্মের ঘাঁটি আগলে বসে থাকে, তাদের উচিত আজীবন ঘানি টানান। কোথায় তা হচ্ছে? টাকার জোরে তারা সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়ে নিজেদের অন্তরের বিষ সমাজে দেশে আরও বেশী করে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এর নাম কি শাস্তি?"

মা বললেন, তারা খুবই সাজা পাচ্ছে। দুনিয়ার কাছে বড় হলেও তারা নিজের কাছে ছোট হয়ে থাকছে। আর উন্নতির চরমে পৌছেও তারা এ পরাধীন দেশে এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে জানছে যে তারা সত্য সত্যই বড় হয় নি; তাদের আভিজাত্য আর উন্নতি হীনতায় ভরা। যার যত উন্নতির আকাঙ্খা প্রবল, হেয় প্রতিপন্ন হলে তার তত বেশী লজ্জা আর কষ্ট। এদেশের নকল অভিজাতরা সবচেয়ে ভারি অপমানের বোঝা বয়ে দিন কাটান। দীন দরিদ্রের সে অপমান গায়ে লাগে না।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সমাজের উচিত তাদের গায়ের থেকে সে সাজ সজ্জা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া, যার জোরে তারা সকলের চোখে ধুলা দিয়ে মিথ্যা মাহাত্ম্যের অভিনয় করে বেড়ায়।"

"হয়ত একদিন ছিঁড়ে দেবে; কিন্তু একটা পাপ যদি হাজার বছর ধরে বেড়ে ওঠে ত সে পাপ দূর হতেও সময় লাগে। হঠাৎ একটা ঝটকা মেরে জাতির সংস্কার সাধন করা সম্ভব নয়। তাতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে তোড়ের মাথায় ভাল যা তাও ভেঙ্গে উড়ে যায়।

অমর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা হতে পারে। অপারেশন করতে গেলে বিষাক্ত অংশ বাদ দেবার জন্যে সুস্থ জায়গাও অনেক সময় কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু দেহের থেকে বিষ একবার বেরিয়ে গেলে সে আঘাত সহজেই জুড়ে গিয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসে। আমাদের জাতের মধ্যে বিষ ঢুকেছে এবং সে বিষ বের করবার জন্যে যদি তুমি যাকে ভাল বলছ তারও কিছু কিছু উড়ে যায়, তাতে শেষ অবধি জাতির লাভই হবে। সব দিক বাঁচিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি সম্ভব নয়। এখানে ওখানে বড় বড় ছুরির দাগ পড়ে ভাল মন্দ এক সঙ্গে ছেঁটে যাবে। তাতে ভয় পেলে কোন দিন কিছুই হবে না।"

মা বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, অত বড় কথার কোন দরকার নেই। নিজের কর্ত্তব্যটুকু ঠিক মত করে যাও, জাতি আর সমাজ নিজে থেকে ঠিক হয়ে যাবে।"

অমর অতঃপর তর্ক থামাইয়া অপর কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। তাহার বিদ্রোহী মন অন্যায়, অধর্ম্ম ও অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গর্জ্জাইতে লাগিল; কিন্তু যুদ্ধ কাহার সহিত

করিবে ? শতমুখী অন্যায়, অধর্ম্ম লক্ষধারায় ধাবিত এবং অবিচার জাতীয় অঙ্গের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সত্য ও ও ন্যায়ের সংগ্রামে যে নামিবে তাহার চতুর্দ্দিকে দূর দূরান্তর অবধি শুধু শত্রুতে পরিপূর্ণ। সে যুদ্ধের কল্পনাই অন্তরে ক্লান্তি আনয়ন করে। বিদ্রোহের পূর্ব্বেই হতাশ হইয়া মন পরাজয় মানিয়া লয়।

এই যে জীবনের ধারা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে ; ইহা যে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে ভারতীয় মানবকে নিত্য নূতন রসের আস্বাদ দিয়াছে তাহা বর্ত্তমানের মানুষ স্মৃতির ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিফলিত করিয়া দেখিবারও সময় পায় না। সে রস কখন অভিযানের, কখন বীরত্বের, কখনও বা অনন্ত সাধনা, চিন্তা, জ্ঞান ও ত্যাগের আদর্শে মহীয়ান। কোন যুগে ভারতীয় ঋষিগণ মানব চিন্তাকে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর স্তরে লইয়া গিয়া চরম জ্ঞানের অতি নিকটে পৌছিয়াছেন। কোথাও ভারতীয় কাব্য, নাট্য, শিল্পকলা ও রূপ চর্চ্চার প্লাবনে এই মহাদেশ নব বসন্তের আবির্ভাবে ফুল পল্লব শোভিত বনানীর মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারে সব কিছু শত শত বৎসর ডুবিয়া থাকিয়া পুনরায় বাহিরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে মাথা তুলিয়া নূতন আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই দেশের সভ্যতা চলিয়াছে তাহার হিসাব নাই। বর্ত্তমানের চর্চ্চা করিলে মনে হয় আমরা ক্রমশঃ চির অন্ধকারে ডুবিতে চলিয়াছি ; কিন্তু কে জানে দীর্ঘ পথের শেষে কি আছে ? রুশিয়ায় কবি ল্যরমন্তভ গাহিয়াছিলেন :

I gaze with grief upon our generation,
Its future black or vacant — and to-day,
Bent with a load of doubts and understanding,
In sloth and cold stagnation it grows old.

* * * *

Toward good and evil shamefully impassive,
In mid career we fade without a fight,
Before a danger pusillanimous,
Before a power that scorns us we are slave.

* * * *

The lines of poetry, the shapes of art,
Wake in our minds no lonely ecstasy.
We hoard the dregs of feelings that are dead ;
Misers, we dig and hide a debased coin,
We hate by chance we love by accident ;
We make no sacrifice to hate or love,
Within our minds presides a secret chill
Even while the flame is burning in our blood.

* * * *

We hasten tomb-wards without joy or glory,
With but a glance of ridiclue thrown back,
A surly hearted crowd and soon forgotten,
We pass in silence, trackless from the world.

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তৎকালীন রুশ আভিজাত্যের পতনোন্মুখ জীবনাদর্শের চিত্র। বাংলার জাত্যাভিমান ও অপরাপর নকল অভিমানমালার রূপ চিন্তা করিলে বেশ মিল পাওয়া যায়। নিষ্কর্ম্মা কূপমণ্ডুক ভাব—ভাল মন্দ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ঔদাসীন্য—জীবন

যুদ্ধে অর্দ্ধপথে অন্তর্দ্ধান—বিপদে কাতর ও শক্তিশালীর ঘৃণাকটাক্ষের সম্মুখে দাসের ন্যায় ব্যবহার—কাব্য ও শিল্পের আনন্দ পুলকের অভাব—পুরাতন মৃত ও ঝুঠো লইয়া কারবার—প্রতিহিংসায় অক্ষম; প্রেমে নির্জ্জীব, রক্তে আগুন কিন্তু হৃদয় তুষার শীতল, ব্যর্থ বিরক্ত জীবনে নিরুদ্দেশ পথের পথিক।

কিন্তু জ্যারমস্তভের রুশিয়া ভাঙ্গিয়া ধূলায় মিলাইয়া গিয়া তাহাব উপরে যে নব জাগ্রত রুশিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এ সকল কথা খাটে না। সেখানে দেখি আশা, আনন্দ, বীরত্ব, আদর্শবাদ, সৌন্দর্য্য পিপাসা ও কর্ম্ম বিহ্বলতা। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পৃথিবীর বক্ষে যেমন নূতনের আবির্ভাব হয়, যুগ পরিবর্ত্তনের ফলে জাতি ও দেশও তেমনি নব কলেবর ও নব উদ্দীপনা লাভ করিয়া নূতনরূপে বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বাংলাও হয়ত এইরূপ একটা যুগ পরিবর্ত্তনের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে জানে?

* * * *

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। বিজয়, অমর, অমিয়া সকলেই ভাল পাশ করিয়া পুনরায় নূতন নূতন বিষয়, পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতির আলোচনায় মাতিয়া উঠিল। শিক্ষা শেষে কে কি করিবে একথা এখন বড় করিয়া বিচার হইতে লাগিল। কেহ ডেপুটি হইবে আকাঙ্খা, কেহ ডাক্তারী পড়িবে, কেহ বা শিক্ষকতা করিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছে! বিজয়ের পিতা তাহার জন্য ডেপুটিগিরির চেষ্টা করিবেন এবং সফল না হইলে সে কলিকাতায় কোন ব্যবসায়ীহাউসে ঢুকিবার ব্যবস্থা করিবে। অমর বলিল শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষা। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর জীবিকার কথা ভাবিবার সুযোগ হইবে। অমিয়ার পিসিমাতা

তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে, একথা বলিয়া বলিয়া কোন সাড়া না পাইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। অমিয়া পুনরায় পাঠের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অধ্যাপক গুহ মহাশয়ের মনের গণ্ডীর মধ্যে অবান্তর সাংসারিক কথা সহজে স্থান পাইত না। তাঁহার চক্ষে পরীক্ষান্তে উচ্চতর শিক্ষাই একমাত্র আদর্শ। কন্যার পাঠের আয়োজন তাই তাঁহার স্বাভাবিক ও সহজ বলিয়াই মনে হইল। পাঠ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতা প্রয়োজন এমন কথা মনে উদিতই হইল না।

দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া অমরের সহিত অমিয়ার দেখা হয় নাই। তাই কলেজ খুলিবার পরে অমর ও বিজয় একদিন গুহ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে পর অমিয়া অনুযোগের সুরে অমরকে বলিল, "কি মশায়, দার্জ্জিলিংয়ে এতই কষ্ট পেয়েছিলেন যে আর এ পথে দেখা যায় না?"

অমর লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি যে বলেন! বই কেনা আর নানান উৎপাতে কোথাও বেরতে পারি নি।"

দার্জ্জিলিংএ যা গুরুভোজন হয়েছে; চলা ফেরা করতে ডবল সময় লাগে। জান হে বিজয়? সকালে মাংস ভাত, রাত্রে লুচি মাংস আর তা ছাড়া জলযোগ হিসেবে দুবেলা ডিম, টোষ্ট, কেক, গরম সিঙ্গাড়া, ছানার মুড়কি আর কত কি! যো খায়া ও ভি পস্তায়া যো না খায়া সো ভি পস্তায়া।"

অমিয়া বলিল, "অপর কথায় দিল্লীর লাড্ডু খেয়েছেন মানে কিছুই খান নি, কেমন? বেশ নেমকহারাম যা হোক।"

অমর বিপদে পড়িয়া বলিল, আহা, কি মুস্কিল! বলছিলাম যে

এত খাওয়া যে খেয়ে খেয়ে অনুতাপের সৃষ্টি হয়। আর যার কপালে জোটেনি তার তো দুঃখ হবারই কথা।" বিজয় শান্তি স্থাপনার্থে বলিল, "খুব যে খাইয়েছেন তা অমরকে দেখলেই বোঝা যায়, অন্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই। দেড়া চেহারা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। তা আমরা না হয় কলকাতায় বসেই কিছু পেলাম!"

অমিয়া বলিল, "বেশ ত এখনই ব্যবস্থা করি। আপনারা বসুন।" দুই জনে "না", "না", করিতে করিতে অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া ভোজের ব্যবস্থায় বাধা দেওয়া হইল না।

কিছুক্ষণ পরে বিবিধ জলযোগের মাল মশলা আসিতে আরম্ভ করিল ও সর্ব্বশেষে অমিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল। বিজয় খুবই লজ্জিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাদের কোনও ওজর টিকিল না। দানবীয় রীতিতে জলযোগ করিয়া তাহারা ঘণ্টা দেড়েক পরে গৃহে ফিরিয়া গেল।

কলিকাতার ছাত্র জীবন খুবই এক ঘেয়ে। পাঠ, গল্প, পায়চারী, দুটা একটা সভা সমিতি, খেলা কিম্বা সিনেমা দেখিতে যাওয়া; এই ভাবেই সময় কাটিয়া যায়। কখন সখন হোটেলে খাওয়া অথবা নিমন্ত্রণ কসরতে, ব্যায়াম, খেলা, শিল্প-কলা অথবা গভীর কোন বিষয়ের আলোচনা এসব অল্প সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে নিবদ্ধ। তাহারা ছাত্র মহলের বাছাই করা কয়েকজন। ছাত্র জগতে তাহাদের নামডাক খুব এবং আভিজাত্যের অহঙ্কারে তাহারা শুধু নিজেদের মধ্যেই মেলামেশা করিয়া দিন কাটায়। দুই চারজন আছে যাহারা কলিকাতার গুণীমহলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। তাহারা বাংলার সভ্যতার পূর্ণস্বাদ পাইয়া

ধন্য হইয়াছে এবং অতিবড় ফুটবল খেলোয়াড়ও তাহাদের নিকট পরাস্ত। প্রতিভার আলো তাহাদের নিজেদের না হইলেও তাহারা ছাত্রাকাশের চন্দ্রের মতই দীপ্তিময়।

অমর, বিজয় ও তাহাদের ঘনিষ্ঠ দুই চার জন ছাত্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নাম কিনিবার প্রয়াস করে নাই। তাহারা অল্প বিস্তর সর্ব্বত্রই ঘুরা ফেরা করিয়া মনের মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতা পুরা বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিত। বিজয় মধ্যে মধ্যে হরেন বাবুর পাল্লায় পড়িয়া থিয়েটার অথবা কেরাণী জগতের দুই একটি অতিমানবের সঙ্গ লাভ করিয়া আসিত; কিন্তু অমরের গালাগালির ভয়ে সে ইহা খুবই গোপনে রাখিত। একদিন কোন এক অভিনেতার প্রশংসা করিয়া সে ভারতের পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বিষয়ে এমন একটা তীব্র সমালোচনা শুনিল; যাহাতে তাহার মনের মধ্যে বহু দেবতাই বেদীচ্যুত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন। চাকুরে লোকের খ্যাতির কথাও অমরের নিকট পাড়া চলিত না। "দাসবৃত্তি, তার আবার উচ্চ আর নীচ! মেথরের নিকট বেয়ারা বড়, বেয়ারার চোখে দরোয়ান রাজশক্তি সম্পন্ন; দরোয়ানের জগতে সরকার বাবু, ম্যানেজার অবধি। মানুষ যে এগিয়ে চলছে তার জন্যে এরা কি করে? এর অনুকরণ, নয়ত ওর চাটুকারী। এ ছাড়া চাকরী করে কি হয়? সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, স্থাপত্য, যন্ত্রবিজ্ঞান, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি যে সব কর্ম্মের মধ্য দিয়ে মানুষ তার পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে তার কোন কিছুর সঙ্গে যোগ নেই; শুধু ঘাঁটি আগলে বসে গতিমান যারা তাদের উপর মাশুল আদায়। অস্ত্র খাতা আর কলম; উদ্দেশ্য কোন কর্ম্ম না করে শুধু কাজের অভিনয়ে সংসারের স্কন্ধে আরোহণ করে স্বার্থসিদ্ধি! যত

গুলো আফিস দপ্তর আছে তার বার আনা উপড়ে গঙ্গায় ফেলে দিলে কোথাও কোন জিনিসের কমতি হবে না।"

এ রকম আক্রমণে বিজয় থতমত খাইয়া চুপ হইয়া যাইত। সংসার যন্ত্রের কোন্ চাকাটা কার্য্যকরী আর কোন্টা শুধু.শোভার জন্য তাহা বুঝিবার ক্ষমতা বিজয়ের ছিল না। অমরেরই যে এ বিষয় মাথাটা খুব পরিষ্কার ছিল তাহা নহে; কিন্তু সে বুঝিয়াছিল যে বহু লোকে শুধু বিলিব্যবস্থার দৌলতে মোটা আমদানী করিয়া দিন কাটায় এবং বহু কঠিন পরিশ্রমী নিজের পাওনা পায় না; এমন কি বুঝেও না যে পাওনাটা কত। পাছে কোন অপরাধী বাঁচিয়া যায় এই জন্য সে সন্দেহের উপর বহু লোকের সাজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিত। মাঝে মাঝে অমিয়ার সহিত এই জাতীয় কথা আলোচনা হইত। নারী বুদ্ধি পুরুষের উদ্দাম প্রেরণার তীব্র গতিশীলতাকে সংযত করে। অমিয়া বলিত, "এইভাবেই ত সংসার চলে আসছে। যদি এত গলদ থাকত তা হলে মানুষের অবনতি এতদিন পূর্ণ হয়ে যেত। এগিয়েই ত চলেছি। কর্ম্ম বা চিন্তা কোনখানেই ত মানুষ পেছিয়ে যাচ্ছে না। তা হলে এত জোরের সঙ্গে সব কিছু ভাঙ্গবার চেষ্টা কেন?"

"এগিয়ে চলেছি কথাটা একভাবে যেমন সত্যি, আর একভাবে তেমনি মিথ্যা। মানে, এ কথা ঠিক যে আমাদের জ্ঞান আর কর্ম্ম দুই শ বৎসর আগের তুলনায় নিকৃষ্ট হয়ে যায় নি। কিন্তু যে যুগে পৃথিবীর অন্য সব জাত নিজেদের বাইরের ভেতরের গড়ন পালটিয়ে নিয়ে শতকরা পাঁচ শর কোঠায় এনে ফেলেছে, সেই যুগে আমরা কি করেছি? ১৭৬০ খৃঃ অঃব্দের এবং ১৯১০ খৃঃ অব্দের ইংলণ্ড, জার্ম্মানী কিম্বা আমেরিকার তুলনা করে দেখুন; আর সেই দেড়শ

বৎসর আমাদের কি হয়েছে দেখুন। অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য আর অনাহার থেকে উঠে এসে তারা রাজার আসনে বসে জীবন উপভোগ করছে; আর আমরা একে একে নিজেদের সব বাস্তব সম্পদ খুইয়ে বসে শুধু নবযুগের খাতিরে দুটো একটা আধুনিক জিনিস চাখবার অধিকার পেয়েছি। ভারতের বয়নশিল্প, নৌ নির্ম্মাণ, লোহা ইস্পাতের কারবার, গয়না, আসবাব, স্থাপত্য ইত্যাদি সব জলাঞ্জলি দিয়ে, তার বদলে গরু চালানের মত রেলের থার্ডক্লাশে ন মাইল ছ মাইল চলবার অধিকারটা কি খুব লাভ হয়েছে? টিনের বাক্স, জাপানী এনামেলের সানকি, কেরোসিনের বাতি, কুইনাইনের বড়ির কি কোন মূল্য আছে কৃষ্টি কিম্বা জীবনের দিক দিয়ে?"

অমিয়া তর্কে হারিতে রাজী নহে। সে বলিল, "হ্যাঁ, মানলাম কিছুটা; কিন্তু বিচারটা সম্পূর্ণ এক তরফা হ'ল। ইয়োরোপ আর আমেরিকার অনাবিল আনন্দের ছবিটা একটু অতিরঞ্জিত মনে হয়। ওর মধ্যে দুটো দশটা মহাযুদ্ধের বর্ণনা, তাতে বিষাক্ত বাষ্প দিয়ে ফুসফুস জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষ মারা; এক আধটা রুশীয় বিপ্লবের চিত্র, আর কিছু কিছু নৈতিক আলোচনা থাকলে বোঝা যেত যে তাঁদের উন্নতিটা খুব ভেজাল বিহীন নয়। হয়ত আমাদের প্রগতির অভাবটাই আমাদের বাঁচবার কারণ হয়ে দেখা দেবে ভবিষ্যতের অন্য কোন সমালোচকের দৃষ্টিতে।"

বিজয় বেচারা চুপ করিয়া শুনিতেছিল। দুই অতিকায় যেখানে যুদ্ধে নিরত সেখানে ক্ষীণপ্রাণ জীবেরা যেমন ভয় বিস্ময় ভক্তি মিশ্রিত নয়নে নীরব ও নিশ্চল হইয়া থাকে; এই দুই মহাতার্কিকের নিকটে বিজয়ের মনোভাব প্রায় তদ্রূপই হইয়া দাঁড়াইল। সে পাঠ্য পুস্তকের

জগতে ইহাদের অপেক্ষা কম যাইত না। কিন্তু বাহিরের দ্বন্দ্ব সমস্যার হাওয়া যেখানে বিক্ষুব্ধ হইয়া ঝঞ্ঝারূপে গর্জ্জিয়া উঠিত; বিদ্যালয়ের শিক্ষার সীমানার অন্তরালে বর্দ্ধিত তাহার মন সে আলোড়নে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "যা হবার তা ত হয়ে গেছে। তা নিয়ে তর্ক করে লাভ কি? ইতিহাস কি মানুষের হাতে যে ইচ্ছামত গড়ে নেবে? তা ছাড়া আমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায়ও ত অনেকে বেঁচে থাকে।"

অমর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তা হইলে অদৃষ্ট মেনে চুপ করে বসে থাক! লক্ষ মানুষের মনের অতুষ্ট ক্ষুধা দিয়ে ইতিহাস গড়ে ওঠে। সকলে যদি সন্তুষ্টির আকর হয়ে দাঁড়ায় তা হলে জাতির মৃত্যুর আর বাকি কি থাকে?"

অমিয়া হাসিয়া বলিল, "হায়, গৌতম বুদ্ধ! আকাঙ্খার নিবৃত্তি, কর্ম্মের তাড়না এ সব কথা আমাদের মনে আর স্থানও পাবে না।"

অমর বলিল, "বুদ্ধ যদি জানতেন যে এদেশে অর্দ্ধেকের বেশী শিশুরা না খেয়ে ধুঁকে মরবে, রুগীবা ওষুধ পাবে না, মানুষের গ্রীষ্মে জল, শীতে কাপড় আর বর্ষায় চালের খড় জুটবে না, তা হলে নির্ব্বাণ প্রচার না করে অনল যজ্ঞের ব্যবস্থা করতেন।"

এ জাতীয় তর্ক অবশ্য বর্ত্তমান বাংলায় বিরল নহে। বিগত শতাব্দীতেও এইরূপ জাতীয় সমস্যামূলক তর্ক ও বিচারের অভাব ছিল না। জাতি ভেদ, অস্পৃশ্যতা, অবরোধ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি বহু বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর তর্কের খোরাক জোগাইয়াছিল। অনেক কুসংস্কার তর্কের তাড়ায় মনের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছে কিন্তু কার্য্যত দৈনন্দিন

জীবনে বাংলার মানুষ বহুক্ষেত্রে বিশ্বাস না করিলেও গতানুগতিকভাবে অনেক কিছু করিয়া যায়। কেহ কেহ আবার নিজেদের এই দুর্ব্বলতার সাফাই হিসাবে কুসংস্কারগুলির সপক্ষে কুতর্কের অবতারণা করিয়া প্রাচীন সভ্যতার রক্ষকরূপে বাজারে উপস্থিত হয়েন। মনের বিশ্বাস ও কর্ম্মক্ষেত্র ব্যবহার মধ্যে একটা আকাশ পাতাল বৈষম্য বাংলার বুদ্ধিমান মহলে চিরবিরাজিত।

বিংশ শতাব্দীতে যখন অর্থ নৈতিক সমস্যা লইয়াই বিশ্ববাসী অরণ্যের পশুদের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন—দুর্ব্বল ও দরিদ্রের অভাবের উপর পরিস্থিত মহাভার বিবাদ যখন নিজের ওজন নিজে সামলাইতে না পারিয়া পতনোম্মুখ হইল; বাংলার তার্কিক তখন তাহার চিরানুসৃত পন্থা অনুযায়ী ধনিক, বণিক, চাষী, মজুর, প্রভৃতি লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিলেন। ন্যায়ের আলোচনা এদেশে মগজেই আরম্ভ ও শেষও হয়; বাহিরে তাহার কোন প্রক্ষিপ্তরূপ দেখা যায় না। অর্থাৎ তর্কে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তাঁহারা চির অনুপস্থিত। তর্কে যাহারা অপারগ অগত্যা তাহারাই নিজেদের সসীম চিন্তা শক্তিকে অবলম্বন করিয়া কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে অসীম আগ্রহে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এখানে ওখানে এক আধ জন চলিত প্রথা অবহেলা করিয়া মস্তিষ্ক ও কর্ম্মশক্তির সমন্বয় সৃজন করেন। তাঁহারাই যুগ প্রবর্ত্তক মহামানব।

তর্কে, সুখালাপে, আমোদে, পাঠের পরিশ্রমে দিন কাটিয়া যায়। ছেলেদের মধ্যে কেহ পারিবারিক বিপদে অকালে চাকরীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কেহ বা দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে জীবনের প্রথম অধ্যায়েই সমাপ্তির দাঁড়ি টানিয়া অজানার সমুদ্রে পাড়ি দেয়। দুই একজন নব আদর্শের টানে ছটকাইয়া গিয়া হয় জেলে নয় নজরবন্দি

হালে পূর্ব্ব পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। বাকি যাহারা তাহারা সাবেকি মতে পড়াশুনা করে, হৈ চৈ করিয়া অবসর কাটায় এবং নিত্য নূতন হুজুগের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ও শুনিয়া জগতের সহিত বন্ধন অটুট রাখিয়া ক্রমশঃ কর্ম্মজীবনের সিংহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে দেশে গিয়া অতীতের সহিত ঘনিষ্ঠতা জাগ্রত করিয়া লওয়া হয়। সে সকল বন্ধন দর্শন ও আলোচনার অভাবে শিথিল হইয়া আসে; পূজার ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশে দেশে গিয়া সেইগুলি আবার শক্ত করিয়া মনের উপর বাঁধিয়া লওয়া হয়।

শিক্ষা যে একটা সাংসারিক উন্নতির কৌশল মাত্র একথা অধিকাংশ লোকেই মানেন। শিক্ষার মোহে যাঁহারা সংসারকে ভুলিয়া কায়মনোবাক্যে জ্ঞান দেবতার পূজা করিতে আরম্ভ করেন, সংসার তাঁহাদের সুনজরে দেখে না। রূপকথার রাজপুত্রের মত সংসারের সীমানা ছাড়িয়া জ্ঞানের অজানা এলাকায় প্রবেশ করিবার সময় সংসারের কোন বৃক্ষকাণ্ডে একটা সূতা বাঁধিয়া সূতা ছাড়িতে ছাড়িতে অগ্রসর হওয়া উচিত। যেন প্রয়োজন মত ফিরিয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট না হয়। পরিবার, আর্থিক আকাঙ্খা, সরকারী খেতাব, যশোলিপ্সা প্রভৃতি বিভিন্ন বৃক্ষকাণ্ডে সূতা বাঁধিয়া মানুষে চিন্তা ও জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে। মাঝে মাঝে সূতাটা টান দিয়া দেখিয়া লয় যে উদ্দেশ্যের সহিত সংযোগ রক্ষা হইতেছে কিনা। আরব্ধ জ্ঞান ভাঙ্গাইয়া সাংসারিক লাভে পরিণত করিবার জন্য প্রায়ই বাজারে ফিরিয়া আসিয়া দর ভাও, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তৈলমর্দ্দন ইত্যাদি করিতে হয়। সংযোগ রক্ষাটা একান্ত আবশ্যক নিঃসন্দেহ।

খুড়া মহাশয়কে সাম্যবাদ বুঝাইতে গিয়া সেবার পূজার সময় বিজয় গ্রামের মাটি ছাড়িয়া যেটুকু উর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহার সবটাই উপরে রাখিয়া সবেগে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া পড়িল। পৃথিবীর সকল মানুষই মনুষ্যত্বের পূর্ণ ভাগীদার। একথা শুনিয়া খুড়া বলিলেন, "তুমি বইলছ কি হে? উচ্চ নীচ, অধিকার অনধিকার, লঘু গুরু, রাজা প্রজা, এ সবই মিথ্যা? তা হলে সব শাস্ত্রই ভুল খালি ঐ ইস্কুল মাষ্টারদের লেখা টাকা পাঁচসিকের বই গুলোই ঠিক! হুঁ হে খুব লেখাপড়া শিখছ বটে! যত মুনি ঋষি সবাই ভুল বকে গেছেন, কেমন না? রাম রাবণ সমান, শ্রীকৃষ্ণ আর পিরু কোচয়ান সমান, মনু পরাশর আর তোমার ত্রিশ টাকার মাষ্টরগুলোও সমান! তুমি ঐ সব ছাই ভস্ম শুনই না, বুঝলে? লক্ষ বৎসর ধরে যা অভ্রান্ত বলে সবাই মেনে আসছে তা কি দুটো ইস্কুলের পড়া দিয়ে উল্টে দেওয়া যায়?"

বিজয় বলিতে গেল পৃথিবীতে অনেক পাপ আর অত্যাচার আছে; কিন্তু খুড়া সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। যাহারা উৎপীড়িত তাহারা শুধু কর্ম্মফল পাইতেছে মাত্র। পাপ যদি বাড়িয়া থাকে তাহা ভগবানের বিধান অনুযায়ী বাড়িয়াছে। কলি যুগে এ সকল ঘটিবে সকলেই জানে; শুধু আহাম্মক স্কুল মাষ্টারগণ ভগবানের লীলাকে নিজের দায়িত্ব বলিয়া ঢাক পিটাইয়া ঘুরিয়া মরে। বিজয় নির্ব্বাক হইল এবং ছুটির বাকি কয়েকটা দিন মেয়ে মহলে নিজ উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও সুন্দরী বধূর আলোচনা শুনিয়া কাটাইয়া দিল। ইহাদের বিশ্ব অনন্ত প্রসারিত নয় বলিয়াই ইহারা জীবনে পূর্ণতা সহজেই লাভ করে। যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা করিবার তাহা করিয়াছি এ চিন্তায় যে শান্তি আনয়ন করে তাহা সীমাহীন বিশ্বের বাসিন্দা

যাহারা তাহাদের ভাগ্যে জোটে না। দৃষ্টি যতদূরে যায় জীবনের অপূর্ণতা তত বাড়িয়া চলে। জন্মান্ধের মনের ভাণ্ডার ক্ষুদ্র হইলেও সেখানে অভাবের হাঁকডাক নাই।

* * * *

গুহ মহাশয়ের এক নূতন বাতিক হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা রাজগঞ্জে ষ্টিমারে বেড়াইতে যান। কয়েক ঘণ্টা নদীর খোলা হাওয়ায় বাহিরে ঘুরিয়া আসার যে আনন্দ তাহা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। অমিয়াও পিতার সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে যায়। একদিন অমর তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিলে অমিয়া তাহাকে বলিল, "আমরা আজকাল রোজ ষ্টীমারে বেড়াতে যাই। রাজগঞ্জ অবধি গিয়ে সেই ষ্টিমারে ফিরে আসি। বেশ ভাল লাগে। একদিন যাবেন?"

অমর ভাবিল "যাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" বলিল, "তা বেশ ত কোন সময় কোন ঘাট থেকে ছাড়ে বলবেন; ঠিক গিয়ে হাজির হব এখন।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "গঙ্গার সঙ্গে একটা ভেতরের যোগ সকল ভারতবাসীরই আছে। অন্য সব নদী যেন জল সরবরাহের উপায় মাত্র। কিন্তু গঙ্গা বলিলেই তার সঙ্গে কত কথা কত স্মৃতি এক সঙ্গে মনের সামনে এসে হাজির হয়। মিশরের নীল নদী ছাড়া আর কোন নদীর সঙ্গে মানুষের এতটা ঘনিষ্টতা হয়েছে বলে মনে হয় না।"

অমিয়া বলিল, "আমার ষ্টীমারে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে একদিন নদীর হাওয়া না পেলে হাঁফিয়ে উঠি। যারা রোজ গঙ্গাস্নান করে তাদের বোধ হয় ঐ রকম একটা বন্ধন এসে

পড়ে; একদিন স্নান না হলে মনে হয় দিনটা অসম্পূর্ণ থেকে গেল।”

অমর মন্তব্য করল “যেমন অনেক পশুপক্ষীর মধ্যে দেখা যায় যে তারা তাদের পূর্ব্বপুরুষের ব্যবহার মত কার্য্য স্বভাবতই করে চলে। অবস্থার পরিবর্ত্তন হলে পরেও; মানুষের মনের ধারার মধ্যেও সম্ভব সেই রকম তার জাতির ইতিহাস তাকে অজান্তে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। জাতিগত স্মৃতি না কি বলে যেন?”

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, “যে কারণেই হোক; গঙ্গার সঙ্গে আমাদের সংযোগটা ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, এক কথায় সকল দিক দিয়ে; তাই তার আকর্ষণ এত প্রবল আমাদের মনের উপর। তুমি কালকেই এস না অমর? বেলা ৪৷৷০ টার সময় চাঁদপাল ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়ে।”

অমর আসিবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন বেলা ৪টা বাজিবার পূর্ব্বেই অমর গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। অমিয়া ও তাহার পিতা জাহাজ ছাড়িবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমর তাড়াতাড়ি করিয়া তিনখানা প্রথম শ্রেণীর টিকেট ক্রয় করিয়া আনিল। অতঃপর সকলে দুতালা জাহাজে উঠিয়া উপরের ডেকে গমন করিলেন।

রাজগঞ্জের জাহাজ খুবই পাঁচমিশালী বোঝা বহিয়া যাতায়াত করে। শিবপুর কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক, কলের কুলী, মেটিয়াবুরুজের খলিফা, ডাবের ব্যাপারী, স্বাস্থ্যান্বেষী লক্ষপতি ও গরীব গ্রামবাসী, সকল প্রকার যাত্রীই এই জাহাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংরেজ, ফিরিঙ্গী চীনা, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোক একত্র এই জাহাজে

গমনাগমন করেন। প্রথম শ্রেণীর বসিবার বেঞ্চিগুলি পরিষ্কার ও চওড়া এবং লোকের তুলনায় স্থান যথেষ্ট। তৃতীয় শ্রেণী ভারতের অন্যান্য সাধারণ ব্যবহার্য্য যানের আদর্শ অনুসারে সঙ্কীর্ণ ও লোকাকীর্ণ। এই জাহাজটি ক্রমাগত গঙ্গা এপার ওপার করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছায়। বহুযাত্রী মধ্যবর্ত্তী ঘাট গুলিতে ওঠা নামা করে এবং যাহারা ভ্রমণ করিতে যান তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যাত্রীদের ওঠা নামা দেখিয়া সময় অতিবাহিত করেন! কেহ কেহ বসিয়া পুস্তক পাঠ করেন, কেহবা রাজনীতি আলোচনা অথবা খোস গল্প করিয়া থাকেন। কখন কখন তাসও দেখা যায়।

অধ্যাপক গুহ, অমিয়া ও অমর প্রথমত একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। অমিয়ার মতে কলিকাতার গঙ্গাবক্ষে সান্ধ্য ভ্রমণ ও আনন্দের জন্য বড় বড় ভাসমান বাগান তৈয়ার করা উচিত। সেখানে লোকে বেড়াইবে, অল্প পয়সায় চা, সরবত প্রভৃতি পাইবে এবং সঙ্গীত বাদ্য শ্রবণ করিবে। সাধারণের খরচে সাধারণের আনন্দের জন্য এই ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা ব্যতীত গঙ্গার তীরে পায়চারী করিবার সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করা উচিত।

অমর একমত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আর ঐ সব বাগানে ব্যায়ামের জন্যে ব্যবস্থা রাখা উচিত। পরিষ্কার হাওয়ায় ব্যায়াম করতে পারলে তার ফল দ্বিগুণ পাওয়া যায়।"

গুহ মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু সাধারণের দিক থেকে সে আগ্রহ আছে কি? যে খেতে চায় না তার জন্যে খাবার আয়োজন করে লাভ কি?"

অমিয়া মত প্রকাশ করিল, "সাধারণের চাওয়ার উপরে জাতীয়

জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়! পথ দেখালে তবে না সাধারণ লোকে সে পথে চলবে?"

অমর বলিল, "দেশটা কি সাধারণের ভালর জন্যে চলছে? না শুধু উপরওয়ালাদের সুখের জন্যে? গরীব লোকের কি আনন্দের অধিকার আছে? না শুধু কাজের ধাক্কা আর পরিশ্রমের বোঝা? The greatest good to the greatest number শুধু বইয়ের পাতায় আছে। আসলে The greatest profit to the smallest number হ'ল আধুনিক জীবনের মূলমন্ত্র!"

"আপনি যে একেবারে সোশ্যালিষ্ট হয়ে উঠলেন," বলিয়া অমিয়া হাসিয়া উঠিল।

অমর উত্তর দিল, "সোশ্যালিষ্ট কি না জানিনা; তবে অন্যায় বিলিব্যবস্থা সহ্য করা উচিত নয়। প্রাচীন কালেও হয়ত রাজা মহারাজা শ্রেষ্ঠী প্রভৃতিরা এই রকম মোটা টাকা উপায় করতেন; কিন্তু তাঁরা কি এইভাবে ঘোড়দৌড়, কুকুর দৌড়, দার্জ্জিলিং, সিমলা, লণ্ডন, একে খাওয়ান, তাকে পার্টি দেওয়া শুধু এই করেই সে অর্থ নষ্ট করতেন? বোধ হয় না। কেননা এত হাজার হাজার মন্দির, অন্নছত্র, জলছত্র, ধর্ম্মশালা, রাজপথ নির্ম্মাণ, জলসরবরাহের জন্যে পুকুর কাটা আরও কত কি; এসব তাঁরাই সাধারণের জন্যে করে গিয়েছেন। আর আজকাল রায় বাহাদুর হবার জন্যে লোকে কিছু কিছু দান করে বটে; কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতাই ধনবানের জীবনাদর্শ।"

জাহাজটা গঙ্গার পশ্চিমকূলে বোটানিকেল গার্ডেন ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথম শ্রেণীর কয়েক জন মেটে ফিরিঙ্গী যাত্রী নামিয়া গেলেন। হঠাৎ নীচে একটা দারুণ সোরগোলের সৃষ্টি হইল। অমর

ও অমিয়া বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া রেলিংয়ের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল, সায়েবদের অবাধ অবতরণে বাধা দিয়া কয়েকজন অশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ ভীড় করিয়া পণ্টুনের পথে গিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে একজন ফিরিঙ্গী বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া হস্ত ধৃত বেত্র দিয়া এক ব্যক্তিকে একঘা লাগাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করায় ঐ সকল বর্ব্বর লোকগুলি অকারণে "বাবারে মারে" করিয়া চীৎকার সুরু করিয়াছে। ইহাতে 'সায়েব' শান্তি স্থাপনের জন্য আরও দুচার ঘা বেত্র ইহার পৃষ্ঠে উহার পৃষ্ঠে লাগাইয়া দিলেন। ফলে লোকগুলি দৌড়িয়া পালাইতে লাগিল।

একজন বৃদ্ধা মাথায় ঝুড়ি পিঠে পুঁটুলী লইয়া যাইতেছিল। সে বেচারা পিছনের লোকদের উদ্দাম পলায়ন উৎসাহে ধাক্কা খাইয়া পণ্টুনের রেলিংয়ের উপর পড়িয়া টাল সামলাইতে না পারিয়া জলে পড়িয়া গেল। ইহাতে এক মহা কলরোলের সৃষ্টি হইল। অমর এক দৌড়ে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। সম্মুখে যে কয়জন ফিরিঙ্গী ছিল তাহারা অমরের প্রচণ্ড গতির সংঘাতে এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হইল এবং অমর রেলিং টপকাইয়া জলে লাফ দিয়া পড়িয়া বৃদ্ধাকে টানিয়া ঘাটের উপর তুলিয়া আনিল। সকলে ভীড় করিয়া দৃশ্য দেখিতে জুটিয়া গেল। ফিরিঙ্গী দিগের মধ্যে একজন অমরকে প্রশংসা সূচক কণ্ঠে, "I say Baboo" বলিয়া কি বলিতে যাওয়ায় সে তাহাকে প্রত্যুত্তরে, "you go to hell" বলিয়া আলাপটা প্রারম্ভেই সমাপ্ত করিয়া দিল। বৃদ্ধার অস্থাবর সম্পত্তি গঙ্গাজলেই রহিয়া গেল এবং কেহ কেহ তাহাকে দুই চার আনা পয়সা ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার সহায়তা করিলেন। অমর ভিজা কাপড়ে পুনরায় জাহাজে উঠিয়া

আসিল। একজন সারেঙ্গ জাতীয় লোক তাহাকে বলিল "আসেন আপনারে একটা শুখা কাপড় দিই। এ গুলান শুকাইয়া লন।"

অমর তাহার সহিত এঞ্জিন ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অমিয়া তাহার পিতাকে ঘটনার বর্ণনা করিয়া শুনাইতে অমর ফিরিয়া আসিল। কাপড় চোপড় শুকাইয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু কর্দ্দমের ছোপ লাগিয়া আছে। সে হাসিয়া বলিল, "শুধু গঙ্গার হাওয়া নয়, গঙ্গা স্নান অবধি হয়ে গেল।"

অমিয়া অনুযোগ ও প্রশংসা মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি আচ্ছা লোক যাহোক বলছি! এর পর কবে কোথায় কি করে বসবেন তার ঠিকানা নেই।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "ঠিকই করেছ। বিপন্নের সাহায্য করতে যদি প্রাণও যায় ত কি ক্ষতি?"

জাহাজ ক্রমশঃ রাজগঞ্জ পৌছিল এবং সেখানে অসংখ্য ডাবের বোঝা তুলিয়া লইয়া পুনরায় কলিকাতার পথে ফিরিয়া চলিল। সন্ধ্যার আকাশে তখন মেঘ ধোঁয়া ও অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আলোর অপূর্ব্ব খেলা চলিতেছে। তাল ও নারিকেলের সারি অর্দ্ধ অন্ধকারে মায়া পুরীর প্রহরীর ন্যায় ইতস্ততঃ প্রতিষ্ঠিত। পরপারে দীর্ঘ ধূমাচ্ছন্ন চিমনির যেন গা বাহিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা বাসায় ফিরিতেছে। গঙ্গার বক্ষে ডিঙ্গি নৌকাগুলি ঢেউয়ের সহিত তাল রাখিয়া দুলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোকমালা গলায় ঝুলাইয়া ষ্টীমারগুলি দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে। অমর বলিল, "কলিকাতায় যে এরূপ দৃশ্য দেখা যায় তা জানতাম না।"

অমিয়া বলিল, "খুব সুন্দর না?"

(১৩)

অনেক মাস কাটিয়া গিয়াছে। দ্রুত গতির কেন্দ্র কলিকাতা ঘূর্ণীর মত খালি পাক খাইয়া মরে, তাহার গতি তাহাকে নূতনের আস্বাদ আনিয়া দেয় না। জন্ম, মৃত্যু, যাওয়া, আসা ব্যক্তিগত উত্থান পতন; কিন্তু তাহার মধ্যে মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। যেন একই নাট্যের অবিরাম অভিনয়, শুধু নট নটীরা বিভিন্ন।

কাল যাহারা বালক ছিল, আশায় উদ্দীপ্ত অন্তরে কর্ম্মের আসরে নামিয়াছিল; আজ তাহারাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, ব্যর্থতার বেদনায় হতাশ ও বিদায়ের পথের পথিক। যাহাদের আনন্দ কলকণ্ঠে কাল আসর গমগম করিত; আজ তাহারাই নীরব হইয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সংসারের তাড়নায় ঘুরপাক খাইতেছে।

বি, এ; বি, এসসি, পাস করিয়া অথবা না করিতে পারিয়া সকলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিজয় ভাল পাশ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে ডেপুটিগিরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে এবং আজন্ম নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী বধূ আনিবার জন্য। যাইবার পূর্ব্বে সে সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিল। গুহ মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণান্তে বলিল, "আপনার উপদেশ আর শিক্ষা কখন ভুলিতে পারিব না।" অমিয়াকে বলিল, "মিস গুহ, একটা বছর বড় আনন্দে কেটেছে। আবার পুরাণ জীবন ফিরে আসবে। আপনারা হয়ত আর আমাদের মত গ্রাম্য লোকদের চিনতেই পারবেন না।"

অমিয়া বলিল, "আপনি চিনলেই আমরাও চিনব নিশ্চয়। বিয়ের নিমন্ত্রণটা যেন আসে, খাওয়াটা না জুটলেও।"

বিজয় সলজ্জভাবে বলিল, "আমাদের বিয়ে আর তার নিমন্ত্রণ।

বছরের পর বছর বর্ষা আসে যায়, ধান হয়, লোকে জ্বরে কাঁপে, কেউ মরে, কারও ঘরে বিয়ে হয়, অন্নপ্রাশন হয়—উদ্ভিদ জগতের মত গাঁয়ের মানুষও রং বদলায়, বাড়ে, শুখায়, ঝরে পড়ে ; তার জন্যে আর কার মাথা ব্যথা ?”

বিজয় চলিয়া গেল।

অমরের দাদামহাশয় বৎসরাধিক কাল হইল মারা গিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তির অনেকাংশ তিনি অমরকেই দিয়া গিয়াছেন। অমরের মাতা তাহার বিবাহ চেষ্টা করিয়া সফল হ'ন নাই। সে বলিয়াছে বিবাহ করিবার তাহার ইচ্ছা নাই। মাতা কখন সখন অমিয়াদের গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা পুত্র অমিয়ার প্রতি আকৃষ্ট কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে প্রশ্ন করিলে বলে, “কি আবোল তাবোল বকে যাও ; কোন অর্থ হয় না। তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে, বন্ধুত্বও আছে। তার মানে কি তিনি তোমার পুত্রবধূর পদের উমেদার। ও সব কথা নিয়ে তুমি নাড়াচাড়া করো না।”

“বিয়েও করবি না, চাকরীও করবি না ; তা হলে কি মতলব।”

“উপস্থিত ইউনিভারসিটির পড়াই মতলব। এতদিন ত ক্যাটলগ মুখস্ত করেই কাটল। এখন আসল জিনিষ গুলোর স্বাদ পেতে হবে না ?”

মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তোর কথার মানে তুইই বুঝিস।”

অমর ইউনিভারসিটিতে ভর্ত্তি হইল। প্রথম দিন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিবার সময় দেখিল অমিয়া। বলিল, “এই যে আপনিও এসেছেন ? বেশ, বেশ, ভালই হয়েছে। আমিত ভাবলাম বুঝি কোন রাজপুত্র টুত্র কেউ এসে নিয়েই চলে গেল।”

অমিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার এমন বিপদের সম্ভাবনা জেনেও আমায় বাঁচাতে গেলেন না ? যত দয়া বুঝি অচেনা অজানা লোকদের উপর ?"

"রাজপুত্র এলে আর বিপদটা কোথায় ?"

"বিপদ নয় ! রাজপুত্র হল বুরজোয়াপুরের বড় পুরোহিত। তার হাতে পড়লে কি আর রক্ষা আছে। হৃদয় হয়ে যেত fire proof, burglar proof লোহার সিন্দুক, মনে হয়ে যেত balance sheet এর মত নিয়েট নিশ্চল আর আমার ত depreciation কষে কষে কিছুই বাকি থাকত না।"

অমর হাসিয়া বলিল, "আপনি কি ইকনমিকস্ পড়ছেন না কি ?"

"না, না, সর্ব্বনাশ ! ইকনমিকস হল স্বয়ং শয়তান লিখিত দুঃসমাচার। এই প্রগতির যুগে কি আর ইকনমিকসের স্থান আছে ? আমি পড়ছি ইতিহাস।"

"ভাল করেছেন। জ্যান্ত মানুষগুলোর মধ্যে কোন বস্তু নেই দেখাই যাচ্ছে। মরাগুলোর কি ছিল না ছিল দেখা দরকার। অনন্ত ভুল বুঝেও যদি তাদের মধ্যে কিছু ভাল দেখা যায় ত, জ্ঞানের কপালে যাই থাক, মনে শান্তি পাওয়া যাবে ত ?"

অমিয়া বলিল, "ঠিক বলেছেন !"

অমর দেখিল এতটা মতের মিল হইলে গল্পটা আরম্ভেই শেষ হইয়া যাইবে। তাই সে বলিল, "শুধু গোলযোগ এই যে ইতিহাসে ভাল লোক, অর্থাৎ উপযুক্ত পথপ্রদর্শক খুব কম।"

অমিয়া টোপ গিলিয়া প্রত্যুত্তর দিল, "কেন এত বড় বড় লোক সব রয়েছে, তাদের কাছে মানুষ কি কিছুই শেখেনি ? বুদ্ধ, খৃষ্ট, অশোক,

আলেকজান্দার, সিজার, নোপালিয়ন, লেনীন; এঁরা কেউই কি মানুষের সামনে কোন আদর্শ তুলে ধরেননি; এঁদের জীবন ও কথা থেকে মানুষ কি কিছুই শেখেনি?" অমর কুতর্কের সাহায্যে আলোচনা দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিল। "কোথায় আর তা হ'ল? বুদ্ধ যে কিভাবে চলেছেন তা লোকের মনেই নেই। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সজ্ঘের স্থান ব্যক্তির উপরে প্রভৃতি কথার কেউ মানেই বোঝেনি। অহিংসার দৌলতে মানুষ ও তার মনুষ্যত্ব না বেঁচে, বেঁচে গেল কতগুলো কৈ, মাগুর, ছাগল, ভেড়া আর মুরগী। হিংসা একশ এক রকমের; তার মধ্যে শুধু রক্তপাতটা বাদ রেখে বাকি একশ রকম হিংসা সংসারে বেশ আট পৌরে হয়ে দাঁড়িয়েছে। না খাইয়ে মারা; নির্ব্বোধ নিরক্ষর করে রাখা, নিন্দাবাদ করে কলঙ্কে ডুবিয়ে দেওয়া, কত বর্ণণা করব এই বহুরূপী হিংসার? সজ্যকে ত মানুষ দুগ্ধবতী গাভী বলে মনে করে। যে যেমন পারে দোহন করে। খৃষ্টের শিক্ষাতে যে কোন ফল হয় নি তার প্রমাণ ইয়োরোপের খৃষ্টান জাতিরা। যে কটা Thou shalt not আছে, তার সব কটাই তারা ভাল করে মক্স করে দিন কাটায়। অশোকের চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষের দু একটা যাদুঘরের শোভা বৃদ্ধি হয়েছে আর আরকিয়লজিক্যাল সারভেতে কয়েকজনের চাকরী হয়েছে। অবশ্য উড়িষ্যার লোকেদের শুনেছি একটা বরাবরের মত উন্নতি হয়ে গেছে অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের ফলে। আলেকজান্দার সিজার, নেপোলিয়ন, এরা ত ইতিহাসের থ্রি মাসকেটিয়ার্স। শাণিত তরোয়ালের দুটা একটা ঝকমকানি, কতগুলো লোকের প্রাণ নষ্ট আর কিছু লুঠ পাট। এর আর মূল্য কি? লেনীনকে নিয়ে মুস্কিল আছে। হয়ত লোকটা সত্যিই কিছু শিখিয়েছে; কিন্তু এত শীঘ্র তার বিচার

কে করবে? তা ছাড়া দুনিয়ার সর্ব্বত্র লেনীনের বিজ্ঞাপনের বহরে কারুর কথা বলবার অবসরই মিলে না। লেনীনের নিজের মত যে কি ছিল তা পরিষ্কার জানিনা; তবে বহু লোকের মতে লেনীনের মত আর তাদের মত এক, সুতরাং মতটা ঠিক হোক আর ভুল হোক, সকলের পছন্দসই সন্দেহ নাই।"

অমিয়া তাহার অনর্গল বক্তৃতাতে বাধা দিয়া বলিল, "আরে বাবা, থামুন থামুন, আমার ক্লাস আছে। আপনি কি ঠিক করেছেন মিশর ব্যাবিলন থেকে সুরু করে আইরিশ রিপাবলিক অবধি সব দেশের সব লোকের মূল্য যাচাই করে তবে থামবেন? আমি চল্লাম। অন্য সময় ইতিহাসের who's who বিচার করব এখন।"

অমিয়া চলিয়া গেল। অমর এত ভাল প্ল্যানটা ঠিক মত কার্য্যকরী হইল না দেখিয়া হতাশ মনে বাহির হইয়া রাস্তা ধরিল।

উচ্চ শিক্ষার আবহাওয়ায় দিন বেশ কাটিতে লাগিল। অধ্যাপকগণের মধ্যে নানান প্রকার নূতন ধরণের মানুষ দেখা যায়। কলেজে ছাত্রদের বয়স কিছু কম থাকে; সেখানে বৃদ্ধ অধ্যাপকের সংখ্যাই অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বয়স কিছু বাড়িয়া আসে; সেখানে অধ্যাপকের বয়স বিশেষ কাঁচা। তবে, বয়সে কম হইলেও তাঁহারা অভিজ্ঞতায় কম নহেন। লণ্ডন, প্যারী, বার্লীন, রোম, মিউনিখ, হাইডেলবার্গ, অসলো, অ্যাবার্ডিন, লাইডেন, মঁ পেলিয়ে—ভূগোলের সকল শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ত্তাবাহী নবীন আচার্য্য সঙ্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের ভাগটা একটু বেশী বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান

যুগের আবহাওয়ায় অজানার স্থান পরিচিতের অপেক্ষা উচ্চে। তাই যত দুর্গম দূর দেশে গিয়া মানুষ শিক্ষা লাভ করিয়া আইসে তাহার আদর পণ্ডিত মহলে তত অধিক হয়। এই কারণে কিছু কাল হইল অজানা অচেনা বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম ডাক হইয়াছে। দূর হইতে দূরান্তরে ডক্টরেট সন্ধানে ভারতীয় ছাত্রেরা ধাবমান। হয়ত একদিন উত্তরমেরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়া মানব শিক্ষা তাহার চরমে পৌছাইবে।

নবীন অধ্যাপকেরা ছাত্রদের প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে তাহাদের বিদেশে যাওয়া প্রয়োজন। কারণ শিক্ষা জিনিষটা স্থান মাহাত্ম্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। অর্থাৎ এক একটা বিষয় এক একটা জায়গায় যেন আবহাওয়ার গুণে ছাত্রের মস্তিষ্কে সহজে প্রবেশ করে। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি ঠিক মত বুঝিতে হইলে যেমন প্যারী ও মিউনিখের আবহাওয়া সর্ব্বোত্তম। এইরূপে কোন স্থানে বিজ্ঞান কোথাও দর্শন, কোথাও বা সাহিত্য অথবা ইতিহাস। মোট কথা এই যে ভারতের কোন শিক্ষা কেন্দ্রেই এই স্থানীয়তা গুণ নাই এবং ভারতলব্ধ শিক্ষা সর্ব্বদাই টিনজাত খাদ্যের মত প্রতিভার ভাইটামিন বর্জ্জিত। মন ইহাতে ভারাক্রান্ত হয়; সুপুষ্ট সবল হয় না।

যাহারা মফঃস্বলের বাজার দেখিয়া অভ্যস্ত তাহারা যদি হঠাৎ হগ বাজারের সিন্ধির দোকানে গিয়া হাজির হয়, তাহা হইলে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হতভম্ব হইয়া খালি ইহাই দেখে যে দ্রব্য সম্ভার কি বৈচিত্র্যময়। এতকাল ক্রয় সামগ্রী বলিতে যাহা বুঝিয়াছিল তাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে, নিতান্ত আটপৌরে নিরেশ মাল। আসল জিনিষ এই প্রথম চক্ষের সম্মুখে পড়িল। নানা দেশ হইতে চয়ন করা জ্ঞান

সম্ভার, বিদঘুটে অশ্রুতপূর্ব্ব নামধারী পণ্ডিত পরিচয়, ইত্যাদি দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও এইরূপ হতভম্ব হইয়া যায়। এতদিন যাহা শিখিয়াছি তাহা একান্তই অসার ও সঙ্কীর্ণ জানিয়া তাহাদের মন ইয়োরোপের অসংখ্য জ্ঞানের কেন্দ্রগুলির প্রতি এক গভীর ভক্তি মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ভারতের নিকৃষ্ট আবহাওয়ায় প্রাচীনকালে যে কেমন করিয়া এত বড় বড় জ্ঞানীর জন্ম হইয়াছিল ইহা বোঝা শক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা যে বিষয়েই হোক না কেন আধুনিক সময়ে ছাত্রদের সর্ব্বাগ্রে ভূগোল পাঠ করিয়া তবে আসরে নামিতে হয়। বেশ অবাধে অন্ততঃ পনের কুড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আওড়াইতে না পারিলে আসরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাওয়া যায় না। শুধু ঋকৃবেদে কি আছে জানিলে হইবে না। সে সম্বন্ধে বাভেরীয়, চেক, নরওয়েজীয়ান ও রুশিয়ান পণ্ডিতেরা কে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাগ অথবা লেনীনগ্রাডে মুদ্রিত কোন গ্রন্থমালায় সে কথার বর্ণনা আছে তাহা না জানিলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না।

অমর অমিয়াকে বলিল, "এ এক রকমের দাসের মনোভাব। ফেরীওয়ালারা যেমন নিকৃষ্ট মাল বেচবার জন্যে বলে 'জজ সাহেব নিয়েছেন, সিভিল সার্জ্জেন নিয়েছেন ; আর এই একটা বাকী আছে, তা আপনার জন্যে এনেছি' এও ঐ উপায়ে নির্ব্বোধ লোকের কাছে জ্ঞানের ইজ্জত বাড়ানো। যা সার কথা, তা সার কথা ; তার জন্যে এ কেন বলতে হবে যে প্যারীতেও এর আদর আছে, বার্লীনেও আছে। যদি কোন আধুনিক কবি লেখে—

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে চাহিলেন জল
এনে দিল বাটি ভরে দুধ
এবং থালায় করে মাথনের তাল

তা হলে কাহারও শিহরণের কারণ হবে না সম্ভব! কিন্তু যদি বলি **Old Testament** এ আছে

He asked water, and she gave him milk,

She brought forth butter in a lordly dish'

তা হলেই তৎক্ষণাৎ অনেকের প্রাণে ঢেউ খেলতে স্বরু করবে।"

অমিয়া উত্তর দিল; "'এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে, রাগ করবার ত কোনই কারণ নেই। বংশ পরিচয়ের উপর সব কিছুর মূল্য নির্ভর করে, আর করে সঙ্গ গৌরবের উপর। উলুবেড়ের একটা কাক আর লণ্ডন কিম্বা অকস্‌ফোর্ডের কাক কি সমান হ'ল? যদি বলি. 'দেখুন, নিউইয়র্ক থেকে খাস আমদানী করা ছারপোকা' তা হলে দেখবার জন্যে ভীড় জমে যাবে। নামজাদা লোকের ছেলে বোকা আর কুৎসিত হলেও লোকে তাকে দেখতে চায়, আর বুদ্ধিমান স্বদর্শন রজক পুত্রের কোথাও স্থান হয় না। মানুষের থেকে তার গাড়ী বাড়ী আর পোষাকের খাতির বেশী এ কথা সবাই জানে। আপনি একটা চির প্রচলিত সংস্কার নিয়ে রাগারাগি করছেন কেন? হারু গয়লার দুধ আর মোজেজের গোয়ালের দুধ কি এক হ'ল? না মেধো চাকরের তোলা মাখন আর মা যশোদার স্বহস্তে তোলা নবনীর সাহিত্যিক মূল্য সমান?"

অমর বলিল, "আপনি ত কূটতর্কের রাণী চিরকালই আছেন। যাই বলুন না কেন তার উল্টা জবাব আপনার কাছে পাওয়া যাবেই। এ

ক্ষেত্রে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে জ্ঞানের, সংস্কারের। সংস্কার ত নয় অবিদ্যা। তার দোহাই দিয়ে জ্ঞানের রাজ্যের একটা অতি দুষ্ট ব্যাধির সমর্থন করা চলে কি? এই যে ইয়োরোপমুখী দৃষ্টি; এর ফল কি জ্ঞানের দিক দিয়ে ভাল? প্রথমত মানসিক শক্তির এ একটা মহা অপব্যয়ের পথ। যে কথা সহজে সরল হয়ে অন্তরে প্রবেশ করে তাকে নাসিকা বেষ্টন করিয়ে সাত ঘাটের জল খাইয়ে তবে আসতে দেওয়া হয়। সত্যের চেয়ে তার নজীরের মূল্য বেশী; কিন্তু এটাও একটা মহা দোষ।"

অমিয়া উত্তর দিল, "জ্ঞান আর সংস্কারের জাতিভেদটা ত আপনি বিনা প্রমাণে অকাট্য সত্য বলে চালিয়ে দিলেন। জ্ঞান কোথায় আরম্ভ হয় আর সংস্কার শেষ হয় তা কে দাগ টেনে দেখিয়ে দিতে পারে? প্রাচীন পারস্যে কবি বলেছেন 'যা পাথরে সুপ্ত নিশ্চল, তরু-লতায় যার ঈষৎ সাড়া পাওয়া যায়, জীবজন্তুতে যা অর্দ্ধ জাগ্রত এবং মানুষে পূর্ণ শক্তিতে বর্ত্তমান—তাহাই প্রাণ'। জ্ঞানও তেমনি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে। সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন কোন সংস্কার নেই, আবার সংস্কারের স্বাদগন্ধ বর্জ্জিত কোন জ্ঞানও নেই।"

"তা হলেও যেখানে জ্ঞান অন্ধ সংস্কারের হাত ছাড়িয়ে উপরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস দেখিয়ে তাকে নূতন নূতন বাঁধনে বেঁধে তার মধ্যে সংস্কারগত চিন্তার ভেজাল এনে ফেলার কি প্রয়োজন?"

"এই প্রয়োজন যে মাটির মানুষ আমরা মাটি ছেড়ে বেশী উপরে আমাদের বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ থাকে না। যে প্রেরণার জন্যে আধুনিক জগতে মেঠোসুর, ঘেটোকাব্য, গ্রাম্যশিল্প আর জঙ্গলী নৃত্য-

গীতের আদর ; সেই প্রেরণাই বেদ আর কাণ্টের দর্শনকে আটপৌরে ছাঁচে ঢেলে নূতন আকৃতি দিয়ে বাজারে নিয়ে আসছে। এতে দোষ কি ? দেব ভাষা, মন্ত্রতন্ত্র, নিছক মগজীয় জ্ঞান এ সবের যুগ চলে গেছে। মানুষ যেমন আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে বহুযুগ ধরে নিজেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ অমানুষ হয়ে উঠেছে, জ্ঞানও তেমনি চলিত কথা আর চিন্তার ধারার বাইরে চলে গিয়ে মানুষের ভোগের আযোগ্য হয়ে উঠেছে। এখন দরকার মানুষকে আভিজাত্য ছাড়িয়ে তার মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দেওয়া আর জ্ঞানকে অতি বুদ্ধির ষড়যন্ত্রের বাইরে টেনে এনে সাধারণ সত্যে পরিণত করা। কমরেড অমর কিশোর, এতে আপনার আপত্তি কি ?”

অমর বলিল, “তর্কটা হচ্ছিল এক বিষয় নিয়ে আর আপনি এক চক্কর দিয়ে দুনিয়া ঘুরে এসে আমি যা বলতে চাই আমার কথা অপ্রমাণ করতে গিয়ে সেই কথাটাই প্রমাণ করে দিলেন। ধন্য আপনার কুতর্কের ধারা! আমি কি বলছিলাম জ্ঞানকে উর্দ্ধলোকে দুনিয়ার নাগালের বাইরে রাখতে ? আমি চাই যে জ্ঞানকে বিদেশী সিন্দুক থেকে বের করে এনে স্বদেশের হাটে ঘাটে বিলিয়ে দেওয়া হয়। তাই বলছিলাম বিদেশের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে অতি একান্ত যা নিজেদের জিনিষ তাকেও আমদানীর মাল করে তোলাটা বড় রকম মূর্খতা। কালিদাসকে বুঝতে যদি আমাদের ফিনল্যাণ্ডীয় টীকাকার প্রয়োজন হয় ; রবীন্দ্র সাহিত্যের জন্য যদি ইতালীয় ব্যাখ্যা পড়তে হয়, তা হলে আমাদের আর কোন বস্তু থাকে না।”

অমিয়া হাসিয়া বলিল, “আমাদের যখন মতদ্বৈধ নেই তখন আর তর্কের কি প্রয়োজন ? তার থেকে একটু একান্ত স্বদেশী সিঙ্গাড়া

কচুরী খেয়ে চা খান। না, চা খেতে আপত্তি আছে? ও আবার বিদেশী কলে তৈরী হয়; আর চাদান, পেয়ালা, চামচ ওগুলোও বিদেশী।"

অমর বলিল "আপনি এবার গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন দেখছি। কোথায় আনুন দেখি চা!"

চা খাইতে খাইতে অমর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ত খুব কষে পড়ছেন। এম, এ, পাশ করে কি ফ্রান্স কিম্বা জার্ম্মানী যাবার ইচ্ছে আছে নাকি?"

অমিয়া হাসিয়া বলিল, "দূর থেকে দেশগুলোর খুঁটি নাটি দোষের তালিকা সামনে এসে দেখা দেয় না; শুধু বাইরের মোটা আকৃতি দেখে মনে হয় যাহোক অন্তত দুট একটা দেশে মানুষ মানুষের মত ছিল আর আছে। কাছে গিয়ে খুঁতিয়ে দেখে শেষে সে মোহটুকু ভেঙ্গে যাবে; মনুষ্যত্বের বিষয় ধারণা হয়ে যাবে যে সেটা একেবারেই কবি কল্পনা। কি হবে গিয়ে?"

"মোহকে অবলম্বন করে কি জীবন কাটান যায়? সত্যি যা তা যতই ভীষণ আর কদর্য্য হোক না কেন, তাকে সামনা সামনি দেখা দরকার। সব ভীষণতা আর কৌৎসিত্বের ভিতরেই সুন্দর আর আনন্দের বীজ নিহিত আছে। তাকে খুঁজে বের করে জল সেচন করে বাড়িয়ে তুলতে হবে—তা নইলে প্রস্তর যুগ থেকে এখন অবধি মানুষের যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা হ'ত না আর এখন থেকে সুদূর ভবিষ্যৎ অবধি যা উন্নতির আশা আছে তাও অপূর্ণ থেকে যাবে।"

অমিয়া বলিল, "কথাগুলো অনেকটা ধর্ম্মোপদেশের মতন শুনালেও অর্থ পূর্ণ বটে। তবে যদি পাঁকের মধ্যে মুক্তা বা কয়লার মধ্যে

হীরক অন্বেষণই করতে হয় ত দেশে পাঁক আর কয়লার অভাব নেই, জাহাজ ভাড়া দিয়ে ভিন দেশের আবর্জ্জনা ঘাঁটতে যাবার প্রয়োজন কি ? তা ছাড়া একটু আগেই আপনি ইয়োরোপের ছায়া মাড়ান পাপে এই ধরণের কথা বলছিলেন। হঠাৎ কি মতটা বদলে গেল না কি ?"

"সেটা হ'ল ইয়োরোপের চক্ষে নিজের দেশকে বা দেশের সভ্যতাকে দেখবার চেষ্টার অসারতার কথা। পাঁক বা আবর্জ্জনা ঘেঁটে বাহিরের বা মনের সম্পদ গড়ে তোলাটা ইয়োরোপ ভালই বোঝে ; অর্থাৎ আবর্জ্জনা ঘেঁটে রত্ন আহরণ করারও একটা কার্য্যবিধি বা Technique আছে। অপর দেশে সে জিনিসটার আলোচনা আর ব্যবহার প্রচুর হয়েছে। তার চর্চ্চা করলে হয়ত স্বদেশের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে রত্ন উদ্ধার করা সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে।"

অমিয়া বলিল, "আবর্জ্জনারও ত রকমারি হয়। এক প্রকার আবর্জ্জনা বিশ্লেষণ শিখে এসে অপর প্রকার আবর্জ্জনার কাছে হার মানতে হতে পারে। হাতে কলমে যেখানকার কাজ সেখানেই আরম্ভ করা ভাল নয় কি ; ইয়োরোপের আস্তাকুড় বিশেষজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা কি জাপানে কিম্বা পেরুতে গিয়ে প্রেরণা আর শিক্ষা লাভ করেছিলেন? কথায় বলে যে যার মাথা সেই বোঝে মাথা ব্যথাটা কোনখানে।"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অমর একটা সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়া বলিল, "বেশ ভাল হয়েছে। আপনি নিজে তৈরী করেছেন নাকি ?"

"আমি কি ময়রার কাজ জানি ? ও সব কোথা থেকে ভাজিয়ে এনেছে। আমার রান্না খেলে আর এ পথ মাড়াবেন না।"

অমর আপত্তি করিল, "না না, আপনি রেঁধে দেখুন না। যে রকম সর্ব্বগুণসম্পন্না তাতে সামান্য রান্না কি আর হারাতে পারবে?"

"আপনার মুখের প্রশংসা খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই।"

"কেন আমি কি এত বড় নিন্দুক?"

"না, তা নয়, হয়ত খুব বড় সমঝদার।"

"খাবার জিনিসের সমঝদার খুবই, এ কথা ঠিক। তবে আপনার গুণ আছে সে কথা আপনাকে নিশ্চয় অনেকেই বলেছে, ঠিক কি না?"

"কোথায়, কে কবে বল্লে? গুণ নেই ত বলবে কি করে? আপনার মনে দুনিয়া সম্বন্ধে এত খারাপ ধারণা যে আপনি নিজের অজান্তে সেই ভীষণ সত্যের হাত থেকে পালাবার পথ খোঁজেন। তাই থেকে কোথাও কোথাও মোহমার্কা গুণ দেখতে পান। সেটা আপনার মনের ক্ষণিক আনন্দরূপ আরামের উপায় মাত্র।"

"ও বাবা, একটু প্রশংসা করতে আমায় একেবারে Psychologyর Exhibit বানিয়ে দিলেন! এমন জানলে প্রশংসা করতাম না। তবে এ কথা মানতেই হবে যে আপনার বুদ্ধি খুবই প্রখর আর অন্তরের সম্পদ অশেষ।"

"আর বলবেন না! শেষে আমার সত্যিই বিশ্বাস হয়ে যাবে যে আমি একটি ক্ষণজন্মা নারী। নিন্দায় আপনি যে রকম নির্দ্দয়, প্রশংসাতে আপনি তার চেয়ে অনেক গুণ উদার আর সদয়। না হয় আপনাকে একদিন রেঁধেই খাওয়াব। অন্ততঃ ভুল ভেঙ্গে দেবার জন্যে।"

(১৪)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার আর অল্প দিন বাকি আছে। অমিয়ার সহিত অমরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া থাকিলেও তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে মনে হয়। মধ্যে মধ্যে দেখা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় অকারণ তর্কের সৃষ্টি করিয়া তাহারা আর বাক যুদ্ধের অভিনয় করে না। তর্ক হয় না এবং পাঠ্য বিষয়ের পার্থক্য হেতু অমর অমিয়াদের বাড়ী যাইলে অধিকাংশ সময় অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া কাটাইয়া দেয়। অমিয়ার সহিত কথা গুলা নিতান্ত সাধারণ রকমের ও বিতর্কভাববর্জ্জিত। কোন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠযোগ্য কি না, কলিকাতার আবহাওয়া ক্রমশঃ আরও খারাপ হইতেছে; সিনেমায় দেখিবার উপযুক্ত ছবি আসে না; অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রসঙ্গ।

কিছুদিন হইল অমরের প্রায় দেখা পাওয়া যায় না। বৈকালের দিকে ও ছুটির দিনে সে যে কোথায় যায় তাহার কোন খবর কেউ জানে না। দুই একজন সহধ্যায়ী অমিয়াদের বাড়ীতে আসিলে জিজ্ঞাসাও করিল যে অমরের খবর কি। তাহার সাক্ষাৎ কেহই পায় না। সে কি কোন গুপ্ত রাজনৈতিক দলেই জুটিয়া গেল, না সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করিতেছে। জিমন্যাষ্টিক ক্লাবে, বন্ধু বান্ধবের আড্ডায়, খেলার জায়গায় কোথাওই অমরকে দেখা যায় না।

সে দিন যখন অমর অমিয়াদের গৃহে বৈকালে দেখা দিল অমিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, আজ কাল আর আপনাকে দেখা যায় না যে, কি ব্যাপার? নূতন বন্ধু জুটলেই কি পুরাতন বন্ধুদের একেবারে

ভুলে যেতে হয়? একটা শোভন অশোভন বলেও ত কথা আছে? আস্তে আস্তে পুরানদের ছাড়তে হয়।"

অমর বলিল, "নূতন বন্ধু আবার কে জুটল? আর জুটলেই আপনাদের মত কি আর জুটতে পারে?"

"কি করে বেড়ান আজকাল? সবাই বলে আপনার কোন খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না। লুকিয়ে লুকিয়ে বেশী করে পড়ছেন না কি?"

"না, না, এই একটি নূতন রকমের সখ হয়েছে তাই ছুটি থাকলে সহরের বাইরে যাই একটু।"

অমিয়া বলিল, "কি, 'মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে' না কি? আমার এক মামা আছেন, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ হাতে পুকুরের ধারে বসে থাকতে পারেন। যোগের আসনেও কেউ অত একাগ্রভাবে বসতে পারে না, তিনি যেমন করে ফৎনার দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে থাকেন। আপনার কি সেই ব্যায়রামে ধরল না কি? বড়ই দুঃখের কথা হবে, সত্যি হলে। দেশের একটা আশার স্থল আপনি। মানুষকে ভুলে যদি রুই কাৎলা, মৃগেল নিয়ে মেতে ওঠেন ত দেশের কি হবে?"

অমর হাসিয়া বলিল, "না, না, ছিপ কাঁধে ঘুরতে আরম্ভ করিনি এখনও। আসলে হয়েছে কি, হঠাৎ সখ হল এরোপ্লেন চালাতে শিখব। মা ত গোড়ায় মহা গোলযোগ সুরু করলেন। বহুকষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে যেতে সুরু করলাম। ১০০ ঘণ্টা হাওয়ায় থাকলে তবে হাতেখড়ি সম্পূর্ণ হবে। এখনও অনেক ঘণ্টা বাকি; তাই যতটা পারি এরোপ্লেনেই ঘুরে ঘুরে শিক্ষানবিশী শেষ করবার চেষ্টা করছি।"

অমিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "কাজটা কি খুব প্রয়োজনীয় মনে

হ'ল ? হাওয়ায় উড়ে কি লাভ হবে ? তা ছাড়া ওটা বেশ বিপ
নয় কি ? ওতে যাবার কি প্রয়োজন ছিল ?”

“বিপদজনক বলেই ত ওতে যাওয়াটা দরকার। বিপদ এড়ি
বেড়াবার চেষ্টা করে আমাদের দেশের মৃত্যুর হার অন্য দেশের চে
অনেক গুণ-বেশী। যারা বিপদকে অবহেলা করে বিপদ যেন তা
কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আর যারা বিপদের ভয়ে ব্যাকুল বিপ
তাদের ছায়ার মত অনুসরণ করে ঘোরে।”

“ওটাত হল ভাষার মার প্যাঁচ মাত্র। মৃত্যুর হারটা এরোপ্লে
না চড়ার জন্যে বেশী এ কথা আমি মানি না।”

“এরোপ্লেন চালানটার এক্ষেত্রে অর্থ শুধু নিদর্শনাত্মক। বিপদকে
বরণ করে নেবার ওটা একটা ভঙ্গী মাত্র। সব কাজে, সব কল্পনায় এম
করে ভয়ের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে মুক্তির আকাশে অবাধ আনন্দে এগিয়ে
চলতে হবে। তবেই না মৃত্যু দূরে সরে যাবে, আর জীবন সব কিছুতে
আত্ম বিস্তার করবে। বহুরূপী মার যেমন করে গৌতম বুদ্ধকে ভয়ে
অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁর সর্ব্বজয়ী জ্ঞানকে দাবিয়ে রাখবার চে
করেছিল, আমাদের এই পোড়া দেশে দিনের পর দিন কেটে যায়,
নূতন প্রভাতের সূর্য্য উদিত হয়ে প্রখর তেজে দুনিয়ার চোখ ঝ
দিয়ে অস্তাচলে যায় ; কিন্তু ভয়ে কেউ চোখ চেয়ে দেখেও না যে অ
কোন পথে, মুক্তি আকাশের কোন প্রান্তে দেখা দিয়েছে, তাই আ
যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাই। ‘ভয় হতে অভয় মন্ত্রে নূত
জনম' পাবার মানে হচ্ছে এই যে সে মন্ত্র আমাদের চোখ খুলে দেবে,
দরজা খুলে দেবে, পথ খুলে দেবে। আমি একলা হাওয়ায় উড়লে
হবে ? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়েকে তাই করতে হবে

শত লক্ষকে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে হবে; পাহাড়ের দুর্গম চূড়ায় অভয় মন্ত্রের জয় পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে; সমুদ্রের ঝড় ঝাকে তাচ্ছিল্য করে জলের উপরে নীচে ঘুরে ঘুরে ভয়ের পরাজয় পূর্ণ করতে হবে। তা ছাড়া সেই অভিযান, রোগের উপর, প্রকৃতির ভীষণতার উপর, অভাবের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করে সজোরে চালিয়ে দিতে হবে।"

অমিয়া অমরের কথাগুলি শুনিতেছিল কিম্বা তাহার মুখের চঞ্চল আবেগময় ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে তাহার তারিফ করিতেছিল তাহা বলা যায় না। তাহার কথা শেষ হইলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আবার সেই পুরান পাগলামতে আপনাকে পেয়ে বসেছে। সব অভিযানের সামনে সামনে আপনাকে সকলের আগে এগিয়ে চলতে হবে। চলবেন তা ভাল। কিন্তু জীবনের ছোট কথা যেগুলি, যে সব কথার উপর দুনিয়ার মানচিত্রের সীমানা আর বর্ণ নির্ভর করে না, একান্ত ঘরের আর অন্তরের কথা যেগুলি, সে সব কথার কি জীবনে কোন দাম নেই?"

"যথা।"

"যথা, ছেলের বিপদে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে। অনেক দিনের পুরান ভিটের উপর বড় কথার ধাক্কায় সর্ব্বনাশের আগুন বয়ে গেলে অন্নের ব্যাপারী গরীবের ক্ষুদ্র প্রাণের সব আনন্দও সেই সঙ্গে পুড়ে খাক হয়ে যায়...এ সব কথা আর কি? সমষ্টির আকাঙ্ক্ষা আর জাতির প্রাণের অস্তিত্ব ত শুধু ব্যক্তির কল্পনায়। সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা আর প্রাণ ত ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের অন্তরেই। তাদের আনন্দ আর আশার

ধ্বংসস্তুপের উপর যদি জাতির তথাকথিত প্রগতির ইমারত গড়া হয় তা হলে সেটা কি একটা বিরাট মিথ্যার অভিনয় হবে না? অনেক লোকের ছোট ছোট আনন্দ আর ঘরোয়া সুখ শান্তির উপরে যে জাতীয়.উন্নতি গড়ে ওঠে তাই সত্য ; আর সকল মানবের ব্যক্তিগত নৈরাশ্য আর বেদনার উপর যে কাল্পনিক উন্নতি কালো ছায়ার মত দেখা যায় তা অতি বড় মিথ্যা।"

অমর কথাগুলির তাৎপর্য্য কতটা বুঝিল বলা যায় না। সে বলিল, "অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েই মানুষ আবার তার আনন্দ বড় করে ফিরে পায়।"

অমিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমর তর্কটা আরও বাড়িলে খুসী হইত। এই নীরবতার মধ্যে সে যেন নিজের কথাগুলির অসারতার একটা আবছারূপ দেখিতে আরম্ভ করিল। এ মোহ বাড়িতে দিলে আদর্শে বিশ্বাস টলিয়া যায়, সেই জন্য কথা বদলাইয়া বলিল, "আপনার পরীক্ষার পড়াত নিশ্চয় শেষ করে এনেছেন।"

অমিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "পরীক্ষা ত আসে যায়, তার জন্যে ভেবে লাভ কি? আপনার মা আপনার এই নূতন খেলায় রাজি হলেন?"

অমর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "মনে মনে রাজি নয়, তবে বাইরে পরাজয় মানেন নি।"

"আপনি তবুও গেলেন?"

অমর বলিল, "ও সব ঠিক হয়ে যাবে দু দিনে। পাইলটের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেই আর কি। আর পৃথিবীতে হাজার হাজার লোক দৈনিক হাওয়ায় উড়ছে। তার মধ্যে কয়জন মরছে রোজ? ম্যালেরিয়ায় অনেক বেশী মরে তার থেকে।"

"থাক, থাক, অত মরার আলোচনায় দরকার নেই। আপনি যা করলে খুসী হ'ন তাই করুন। চাঁদের আলোয় যা প্রাণ পায় সূর্য্যের প্রখর তাপে তা অনেক সময় শুকিয়ে যায়, তার জন্যে ত সূর্য্য উঠবে না এমন নয়?"

অমর অতঃপর নানান কথা পাড়িয়া আলোচনাটার ধারা বদলাইবার চেষ্টা করিল। একটা বাধার ভাব কিন্তু সকল কথার মধ্যে রহিয়া গেল।

অমর চলিয়া গেলে পর অমিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিল অনন্ত সৃষ্টির কোলে ক্ষুদ্র মানব কেন অযথা হাত পা ছুঁড়িয়া অশান্তি ও কষ্টের সৃজন করে। কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। শুধু এই কথাটাই বারে বাঁরে মনে হইতে লাগিল সে মানুষ অন্ধকারের পথের যাত্রী। তাহার ক্ষণিকের প্রেরণায় সে যা বিচার করে তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে দেন নাই। নয় ত সে দেখিতে পাইত যে একটি অশ্রুবিন্দুর মূল্য তাহার সকল দিগ্বিজয় অপেক্ষা অধিক।

অমিয়া উঠিয়া ছাদে পায়চারী করিতে গেল। আকাশের তারাগুলি যুগান্তের অভ্যাস মত একভাবে জ্বলিতে লাগিল। পরিবর্ত্তনের তাড়না তাহাদের অন্তরে স্থান পায় না।

*　　*　　*　　*　　*

অল ইণ্ডিয়া অ্যামেচার ফ্লাইং টুরনামেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষরা শুধু সদ্য সার্টিফিকেট পাওয়া পাইলটদিগের জন্য একটা বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা দমদমার এরোড্রোম হইতে পাইলটগণ একের পর এক আকাশে উঠিবেন ও তৎপরে পাটনা, এলাহাবাদ,

জব্বলপুর, নাগপুর ও কটক হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই প্রায় দেড় হাজার মাইল ব্যাপী দৌড়ের সময়ের হিসাব রাখা ও স্থানে স্থানে এরোড্রোমের সকল ব্যবস্থা ঠিক করিবার জন্য বিপুল আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ নিজ মেকানিককে সঙ্গে লইয়া ইহার মধ্যে দৌড়ের আকাশ প্রাঙ্গণ উত্তমরূপে দেখিয়া আসিয়াছেন। পথে পাঁচবার নামিয়া, মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় আকাশে উঠিতে হইবে। নামা ওঠার কৌশলের উপর ও হাওয়ার বেগ বুঝিয়া উচ্চতা বিচার করিয়া চলার ক্ষমতাতেই দৌড়ের হারজিত নির্ভর করিবে। হাওয়াই জাহাজের যন্ত্রপাতি কি অবস্থায় থাকে তাহার উপরেও জয়পরাজয়ের হিসাব নিকাশ হইবে। অমর নূতন পাইলটের মধ্যে একজন। তাহার শিক্ষাকালের কর্ম্মকৌশলে সকলে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাহার এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাম লিখাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ইহার মধ্যে সে একবার সব রাস্তা ঘুরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ধারণা সে অনায়াসে প্রথম কয়টির একটি স্থান নিশ্চয় অধিকার করিবে। তাহার এই খেলায় কথা শুনিয়া অবধি তাহার মাতা তাহাকে বিধিমতে এ প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সে বলিল যে এই প্রতি-যোগিতায় সে-ই একমাত্র বাঙ্গালী; সুতরাং তাহার পক্ষে নাম কাটাইয়া রণে ভঙ্গ দেওয়াটা জাতীয় আত্মসম্মানের দিক দিয়া বিশেষ গর্হিত হইবে। মা নিরস্ত হইলেন।

অমিয়া কথাটা শুনিয়া বলিল, "মা মত দিয়েছেন?"

অমর বলিল, "হ্যাঁ, তবে সহজে নয়।"

অমিয়া বলিল, "আশা করি আপনার জয় হবে। সকলকে

উৎকণ্ঠার মধ্যে ডুবিয়ে রেখে যদি কোন পুরস্কারই না পান ত বড়ই দুঃখের কথা হবে। অবশ্য জিতবার জন্যে কোন রকম অতিরিক্ত দুঃসাহসের কাজ করবার পরামর্শ দিচ্ছি না। তার থেকে বরং হার মেনে নেবেন।"

অমর বলিল, "সকলের কাছে হেরে গেলে আর এরোপ্লেন চালাবই না কোন দিন।"

অমিয়া বলিল, "প্রায় আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছা হচ্ছে আপনি যেন হারেন।"

"কেন, কেন, তার মানে!"

"মানে এই যে তা হলে আপনি এ বিপদজনক খেলা ছেড়ে দেবেন।"

"আপনারা তার চেয়ে আশীর্ব্বাদ করুন যেন বিপদকে জয় করতে গিয়ে আমার মরণ হয়।"

অমিয়া রাগ করিয়া বলিল, "থামুন ত! আপনার কথা শুনলে মনে হয় যেন আপনার মনটা ভীষণ স্বার্থপর। নিজের ইচ্ছা পুর্ণ করার জন্যে আপনি সকলের সকল ইচ্ছাকে উপড়ে ফেলে দিয়ে উদ্দাম ভাবে এগিয়ে চলেন।"

অমর অমিয়ার রাগ দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। সে বলিল, "হয় ত বা তাই হবে, কিন্তু আমার স্বার্থপরতাটা কোন নীচ মতলব নিয়ে চলে না।"

অমিয়াও নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া বলিল, "আহা কে বলেছে আপনার মতলব খারাপ? আসল কথা এই সব সর্ব্বনেশে খেলার মধ্যে যাবার সময় মনে রাখবেন যে আপনার জীবনটার উপর আর পাঁচজনের একটা দাবী থাকতে পারে।"

"পাঁচজনের দাবীর চেয়ে পাঁচ কোটি লোকের দাবীর মূল্যটা বেশী নয় কি? প্রত্যেক মানুষ যদি ঘরোয়াভাবে নিজের জীবনের ধারা নির্দ্দিষ্ট করে নেয়, তা হলে জাতির যে বৃহত্তর জীবন, যার হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ কান দিয়ে শোনা যায় না কিন্তু অন্তরে অন্তরে বোঝা যায়, সে জীবনের স্বাস্থ্য ও আনন্দের খোরাক কে জোগাবে?"

অমিয়া বলিল, "দাবীদারের সংখ্যা দিয়ে দাবীর গুরুত্ব বিচার করা যায় না। মায়ের কাছে তার সন্তানের দাবী ত্রিভুবনের সকল দাবীর উপরে। জড় জগতে, প্রাণী-জগতে সর্ব্বত্রই এই রকম বিশেষ বিশেষ দাবীর পরিচয় পাবেন। চুম্বক যেমন শত মণ সোনা, রূপা, তামাকে অবহেলা করে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডকে বেছে নেয়; নিজ নীড়ের পথের যাত্রী পাখী যেমন দিগন্তের সকল দিককে অগ্রাহ্য করে সোজা সেই ছোট বাসাটির দিকে চলে যায়; মানুষের প্রাণও তেমনি দেশ, ধর্ম্ম, কিম্বা কর্ম্মকে একদিকে ফেলে দিয়ে নিজের প্রিয়জনের আহ্বানকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তর্ক বাড়িয়ে কি হবে? আপনার প্রাণ মানতে চায় না আর কিছুকে; চায় শুধু আদর্শ বজায় রাখবার গৌরবটুকু। তাই নিয়েই আপনি থাকুন।"

অমর বলিল, "অভিশাপ দিলেন কি না বুঝলাম না।"

"না, আশীর্ব্বাদ করছি যেন সকলের দুঃখ আপনার অন্তরে সফলতার আনন্দ রূপে ফুটে ওঠে।"

গৃহের পথে অমর চিন্তা করিতে করিতে প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

হাওয়াই প্রতিযোগিতার দিন ক্রমশঃ আগাইয়া আসিল। দুই তিন দিন যাবৎ অমর ও তাহার যন্ত্রবিদ আকাশযানটির ঘষা মাজাতে দিন

কাটাইতেছে। প্রত্যেকটি জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইতেছে। কারণ একটা ঢিলা নাট কিম্বা স্ক্রুর উপর হারজিত এমন কি প্রাণ অবধি নির্ভর করিবে।

প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব দিন অমর ও তাহার যন্ত্রবিশারদ সারাদিন ঘুমাইল। দৌড়ের সময় নিদ্রা সম্ভব হইবে না সেই জন্য অতিরিক্ত ঘুমটা পাথেয় হিসাবে জমা করা হইল। ভোর বেলা ছয়টার সময় দৌড় সুরু হইবে। তৎপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু থাকিবে অদম্য অক্লান্ত গতির আবেগ।

অমরের হাওয়াই জাহাজটির নম্বর সাত। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় দমদমার হাওয়াই ময়দানে আসিয়া সে দেখিল বহু লোকের আগমন হইয়াছে। চেনা শুনাদের মধ্যে অনেকে আসিয়াছে, অচেনাই বেশী। প্রথম সতর্ক সঙ্কেত ধ্বনিত হইলে পর সে নিজ এরোপ্লেনের দিকে চলিল। হঠাৎ অদূরে একটা ফিকে নীল শাড়ীর দিকে নজর পড়িল। দেখিল অমিয়া তাহার পিতার সহিত আসিতেছে। কথা বলিবার সময় ছিল না। সে হাত নাড়িয়া তাঁহাদের অভিবাদন জানাইয়া নিজ এরোপ্লেনের দিকে চলিয়া গেল। অমিয়াও হাত তুলিয়া তাহাকে জানাইল যে তাহাকে দেখিয়াছে।

শেষ সঙ্কেত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া এক নম্বর যান আকাশে উঠিল। তারপর দুই নম্বর। ক্রমশঃ একে একে তিন, চার, পাঁচ ও ছয় নম্বরের এরোপ্লেন সকলের কর্ণ বধির করিয়া আকাশ পথে যাত্রা করিল। অমিয়া গুণিল সাত। তীব্র হুঙ্কারে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া সাত নম্বর যাত্রা আরম্ভ করিল। কয়েক শত গজ দ্রুতবেগে চক্রের উপর দৌড়িয়া হঠাৎ এরোপ্লেনটি হাওয়ায়

ভাসিয়া উঠিল। তারপর ঊর্দ্ধ হইতে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঈষৎ দক্ষিণে বাঁকিয়া যেন চারিদিক দেখিয়া লইল।

আবার বামে হেলিয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিল ও তৎপরে নিজ দৃষ্টি অদৃশ্য কোন্ গন্তব্যের উপর স্থির নিবদ্ধ করিয়া দ্রুত মেঘের কোলে মিলাইয়া গেল। একজন ফিরিঙ্গি বলিল, "Very good, Take off!" তারপর আট, নয়, দশ; আর কত, একের পর এক আকাশের পথে মিলাইয়া গেল। লাউড স্পিকার বলিয়া উঠিল যে দৌড় আরম্ভ হইয়াছে এবং সারাদিন যেমন যেমন জানা যাইবে তেমন তেমন খবর দেওয়া হইবে যে খেলা কেমন চলিতেছে ও কে কেমন যাইতেছে।

অমিয়া ও তাহার পিতা দমদমার অধিবাসী এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া চা পান করিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন। গয়া হইতে খবর আসিয়াছে যে সকল প্রতিযোগীরাই ঠিক চলিয়াছে। সময় হিসাবে তিন নম্বর এখন অবধি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাটনা বলিল, তিন নম্বর পাটনার আকাশে দেখা দিয়াছে। এইবার নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

কিছুক্ষণ ধরিয়া একের পরে একটি এরোপ্লেনের নামার খবর চলিল। এগার নম্বর পাটনায় নামিতে গিয়া কাৎ হইয়া একপাশের ডানায় মোচড় লাগাইয়া ফেলিল। তাহার মেরামতে দুই তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া যাইবে। সাত নম্বর এরোপ্লেন ছয় নম্বরের আগেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছে এবং এই মাত্র তাহার তেল প্রভৃতি লইয়া যাবার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল পাইলটেরই উৎসাহ অদম্য। এইবার তিন নম্বর সর্ব্বপ্রথমে পাটনা ত্যাগ করিল। একে একে সকলেই পাটনা ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদের পথে পাড়ি দিল। দমদমার দর্শক

বা শ্রোতারা পুনরায় এদিক ওদিক ঘুরিতে চলিলেন। কেহ কেহ এরোড্রোমের রেস্তরাঁগুলিতে প্রবেশ করিলেন।

দেড় ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে পর লাউড স্পিকার আবার বাজিয়া উঠিল। দুই নম্বর প্লেন এলাহাবাদের আকাশে আসিয়া নামিবার স্থান প্রদক্ষিণ করিতেছে। তিন নম্বর ও এক নম্বর পরে পরে আসিতেছে। তৎপরে সাত নম্বর। সুতরাং এখন দৌড়ের ফলাফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। প্রথম ধাপে তিন নম্বর দুই জনকে ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছে এবং সাত নম্বর এক জনকে। বর্ত্তমানে দুই নম্বর এক নম্বর ও তিন নম্বরকে ডিঙ্গাইয়া নিজ স্থান সর্ব্বাগ্রে করিয়া লইয়াছে। সাত নম্বর এখন পাঁচ ও চারকে ডিঙ্গাইয়া চতুর্থ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর এই বর্ণনা চলিতে লাগিল। এগার নম্বর পাটনা হইতে আর আকাশে উঠিতে পারে নাই। তাহার পার্শি চালক ও মেকানিক ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

এলাহাবাদ হইতে সকল প্লেন যথাযথ জব্বলপুরের পথে যাত্রা করিল। জব্বলপুরে তিন নম্বর সর্ব্বাগ্রে আসিয়া হাজির হইল ও তৎপরে দুই নম্বর। তৃতীয় স্থানে আসিল সাত নম্বর। লাউড স্পিকারের বক্তা বলিলেন সাত নম্বর, তিন ও দুই নম্বর অপর সকল এরোপ্লেন অপেক্ষা প্রায় কুড়ি মিনিট সময় ইহার মধ্যেই সংক্ষেপ করিয়াছে। অতঃপর মনে হয় এই তিন প্লেনের মধ্যেই রেষারেষি খুব সতেজ চলিবে। তিনের চালক পাঞ্জাবী ও দুইয়ের মারাঠা। সাতের সারথি অমর কিশোর।

অমিয়া শুনিয়া খুসীও হইল এবং অল্প ভয়ও পাইল। জয়ের আকাঙ্খায় অমর কি যে করিবে তাহা কে বলিবে? দমদমার দর্শক

মহলে খুব দলাদলি আরম্ভ হইয়া গেল। কেহ ইহার সপক্ষে কেহ উহার। এরোপ্লেনের বিষয়ে যাহার যত কম জ্ঞান সে তত জোরের সহিত মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

জব্বলপুর হইতে নাগপুরের বার্ত্তা পৌছাইবার পুর্ব্বেই লাউড স্পিকারের বক্তা বলিলেন, "একটা দুঃসংবাদ আছে।" শুনিয়া অমিয়ার মুখখানা শুখাইয়া গেল। সে দারুণ উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া দুঃসংবাদ কি তাহা শুনিতে লাগিল। বক্তা বলিলেন, "জব্বলপুর ও নাগপুরের অর্দ্ধপথে নয় নম্বর প্লেনের প্রপেলার খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ায় চালক ও মেকানিক বাধ্য হইয়া অসমতল জমিতে জঙ্গলের মধ্যে নামিয়াছেন। তাঁহারা কোথায় কি ভাবে নামিয়াছেন, বা অক্ষত দেহে আছেন কিনা তাহা বলা যায় না। স্থান অনুমান করিয়া কয়েকটি ফাঁড়িতে তার করা হইয়াছে। তাহারা অনুসন্ধানের জন্য লোক, ডাক্তার প্রভৃতি পাঠাইয়াছেন।"

অমিয়ার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। তাহার পিতা বলিলেন, "ভয়ানক ব্যাপার! কোথায় গিয়া পড়িল কে জানে?" অমিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, মহাবিপদের কথা।" তাহার মন বলিতে লাগিল, "কি বাঁচোয়া যে ওটা নয় নম্বর!"

নাগপুরে প্রথমে পৌছাইল সাত নম্বর। খবরটা পাওয়া মাত্র দর্শকদের মধ্যে বাঙ্গালীরা বিকট চীৎকারে নিজেদের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিল। তিন নম্বর সাতের অনতি বিলম্বে আসিয়া হাজির হইল কিন্তু সময়ের হিসাবে সাত নম্বর তাহাকে প্রায় দশ মিনিটে হারাইয়া আসিয়াছে। এঞ্জিনের গোলমালে নাগপুরে দুইটা এরোপ্লেন প্রতিযোগিতা ত্যাগ করিল। সাত নম্বর নাগপুর ত্যাগ

করিবার সংবাদ রাষ্ট্র হইতে "চিয়ারের" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। তিন নম্বর তাহার প্রায়/সঙ্গে সঙ্গেই নাগপুর ছাড়িয়া কটকের পথে যাত্রা করিল।

সকলে চা, কেক, আইসক্রীম প্রভৃতির সদ্ব্যবহারে সময় কাটাইতে লাগিল। অমিয়ার মনটা সেইখানে অনন্তশূন্যে ভাসিয়া চলিল যেখানে মেঘলোকে পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে, অমর তাহার গভীর গর্জ্জন নিরত যন্ত্রযানে বসিয়া বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের দুই এক ছত্র লিখিবার জন্য উন্মাদের ন্যায় কটকের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। পাঁচজনের মন রাখিব না পাঁচ কোটির মান রাখিব। এ প্রশ্নের উত্তরে সে নিজের জীবনটাকে অকাতরে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে।

কটক হইতে যখন সংবাদ আসিল তখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে অনেকটা নামিয়া আসিয়াছে। কটকে যাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পৌছাইবে তাহাদের কলিকাতার পথে আর যাইতে দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা হইতে তাহারা বাদ পড়িবে।

লাউড স্পিকার হাঁকিল "এইমাত্র তিন নম্বর প্লেন আসিয়া নামিল। সাত নম্বর ও তৎ পশ্চাতে দুই নম্বর নামিতে প্রস্তুত।" বাঙ্গালী মহলে একটা সমবেত হতাশার দীর্ঘশ্বাস গুমরাইয়া উঠিল। পাঞ্জাবী মহলে উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল। মারাঠী দর্শক অল্পই। তাহারা শান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত শেষ অবধি কি হয় দেখিবার জন্য বসিয়া রহিল।

কটক ছাড়িয়া এরোপ্লেনগুলি একে একে আকাশে উঠিল। তিন, সাত, দুই, ছয়, আট, এমনি করিয়া আটখানা বিমান কটক হইতে কলিকাতা যাত্রা করিল। বাকি যাহারা তাহারা আর আসিতে

পারিবে না। আসন্ন অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিপদে পড়াটা প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য নয়, তাই এই দাঁড়ি টানার ব্যবস্থা।

অতঃপর আর লাউড স্পিকারের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। হার জিতের সমস্যার সমাধান চর্ম্মচক্ষেই দেখা যাইবে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই; তাই সকলে প্রথমটা বেশ গল্প করিয়া কাটাইয়া দিল। ঘণ্টা পার হইয়া যাইবার পরেই সকলে ঘাড় উঁচাইয়া আকাশের দিকে দেখিতে আরম্ভ করিল। বহু লোকে বাইনকিউলার লাগাইয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষন করিতে লাগিল।

অমিয়া মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিমাকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লগিল। দূরের আকাশে পাখী অথবা মেঘের কোলের আলোছায়ার খেলা দেখিয়া কেহ কেহ উৎসাহে "ঐ যে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তেই সকলের হাস্যধ্বনিতে সাব্যস্ত হইতে লাগিল যে বিমান নয়, দৃষ্টি বিভ্রম। সূর্য্য প্রায় অস্তগামী। পশ্চিম আকাশে লালের আভা দেখা দিয়াছে, পাখীরা কলরব করিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় লাউড-স্পিকার বলিয়া উঠিল "কলিকাতা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে দুইটি এরোপ্লেন দেখা গিয়াছে। প্রায় সমান সমান আসিতেছে।" সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আকাশ দেখিতে লাগিল। কয়েক মিনিট কাটিতে না কাটিতে দূরে ক্ষুদ্র মসী বিন্দুর ন্যায় দুইটি গতিশীল চিত্র ফুটিয়া উঠিল। দমদমার মাঠ জল্পনায় গমগম করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন ধীরে, অতি ধীরে, সেই বিন্দু দুইটি অগ্রসর হইতেছে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সেগুলি বিমান বলিয়া পরিষ্কার দেখা গেল। দমদমার বিমান বন্দরের পতাকা শোভিত সৌধের উপর দিয়া প্রথম বিমানটি

সশব্দে চলিয়া গেল। তারপর ধীর গতিতে চক্কর দিয়া অবতরণ আরম্ভ করিল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাত নম্বর, সাত নম্বর!"

ধীর মন্থরগতিতে বিমানটি ময়দানে নামিয়া কিছু দূর দৌড়িয়া থামিয়া গেল। দ্বিতীয় বিমানখানা দেখা গেল দুই নম্বর। তিন নম্বরের তখনও কোন চিহ্ন নাই। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অঙ্গে অমর নামিয়া যেখানে সকলে বসিয়া সেই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখ তেল কালিতে ভরা। অনেকে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার করমর্দ্দন আরম্ভ করিল। সে ঈষৎ হাসিয়া সকলকে ধন্যবাদ জানাইতে লাগিল। অমিয়া তাহার পিতাকে বলিল, "চল, বাংলা দেশের জয় হ'ল, আর কি।"

* * * * * *

বিমান প্রতিযোগিতায় জিতিবার পরদিন অমর আসিয়াছিল। সে তাহার জয়ের ইতিবৃত্ত অমিয়া ও তাহার পিতাকে বিস্তারিত ভাবে শুনাইল।

অমিয়া বলিল, "আর ঐ সব হাঙ্গামায় যাবেন না।"

অমর বলিল, "কেন, দেখলেন ত বেশ জল জ্যান্ত ফিরে এলাম।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, বড়াই করার কিছু নেই। একবার কোন বিপদ হয়নি বলে বরাবরই কি ভয়ের কিছু থাকবে না?

"ভয় পেলে চলবে কি করে? বিমানের ব্যাপারে আমায় এখন ডাকলেই যেতে হবে। না গেলে নিজের আর দেশের ইজ্জত থাকবে না।"

কয়েক দিন পরে অমর আসিয়া বলিল, "জানেন. আমায় গভর্ণমেণ্ট

থেকে লিখেছে রয়াল এয়ার ফোর্সে কাজ দেবে যদি আমি শিক্ষার জন্যে বিলেত যেতে রাজী থাকি তুমি হলে।”

অমিয়া বলিল, “এটাতে যাওয়াও কি ইজ্জতের ব্যাপার?”

“না, তা নয়, তবে বর্ত্তমান যুগে বিমান দিয়েই জগতের সব পরাক্রমের বিচার হবে। তাতে আমাদের না গেলে চলবে কি করে। ইংরেজকে ভালবাসিনা কিন্তু তার প্রভুত্বকে ছাড়িয়ে ওঠবার ক্ষমতা নেই। এ অবস্থায় তাদের যে ক্ষমতা আর কৌশল তা আয়ত্ত না করতে পারলে, জাতের আত্মমর্য্যাদা চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যাবে। দর্শন, ন্যায় ও কাব্য অন্তরের সম্পদ হিসাবে বড় হতে পারে, কিন্তু বাহিরের প্রতিষ্ঠা যন্ত্রের উপরে। এই যন্ত্র যুগে তাই অনেককে মন্ত্রের সাধনকে যন্ত্রের সাধন বলে মেনে নিতে হবে।”

অমিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “কবে যাবেন?”

“গেলে শীঘ্রই যেতে হবে।”

“ফিরবেন কত দিন পরে?”

অমর বলিল, “দুই বৎসর বোধ হয়।”

আবার সেই দমদমার বিমান ময়দান। অমর বিমান চালাইয়া করাচি অবধি যাইবে। সেখান হইতে রয়াল ডাচ লাইনের বিমানে লণ্ডন যাত্রা করিবে এমস্টারডাম হইয়া। বহু বন্ধু বান্ধব তাহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন।

সে অমিয়াকে একদিকে দেখিয়া তাহার নিকট গিয়া বলিল, “আর কি এবার ত আমায় ভুলে যাবেন।”

অমর বলিল, "তাও কি সম্ভব? আমি সে রকম নেমকহারাম নই।"

অমিয়া বলিল, "ভুলে যাওয়া না যাওয়া মানুষের ইচ্ছার অধীন নয়। ভুলে যেতেই পারেন; নূতন জীবন, নূতন আবহাওয়া নূতন সঙ্গী সাথী।"

অমর উত্তর দিল, "সে সব কথার আমার কাছে কোন দাম নেই। যাদের আমি নিজের বলে মনে করি তারা আমার কাছে নিজেরই থাকবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য কিম্বা 'টেম্পারেচার' মনের মধ্যে ঢুকে কিছু বদলে দিতে পারে না। ও সব কথা ছেড়ে দিন। আমায় সবাই বলছে একটা 'ম্যাসকট' সঙ্গে নিতে। বিলিতি মতে অক্ষয় কবচ আর কি? আপনিই একটা কিছু দিন না আমায় নিয়ে যাবার জন্যে।"

অমিয়া অল্পক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আমার কাছে ত হীরে জহরৎ কিছু নেই; কি দেব যা আপনার মত লোকের উপযুক্ত 'ম্যাসকট' হতে পারে?"

"যা হয় দিন।"

অমিয়া হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে পাতলা কাগজে মোড়া একটা কি বাহির করিয়া অমরের হাতে দিয়া বলিল, "আপনি আমায় একটা পুরস্কার দিয়েছিলেন মনে পড়ে?"

"কি পুরস্কার? ও সেই পুঁথির মালাটা? ওটা আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন?"

"ফিরিয়ে দিচ্ছি না, আপনি এইটেকেই মাদুলি হিসেবে নিয়ে যান। বিলেত থেকে এসে আবার আমায় ফিরিয়ে দেবেন।"

অমর কি যেন বলিতে গেল; কিন্তু দুই একজন লোক আসিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় বলিতে পারিল না। অমিয়া একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

প্রভাতের সূর্য্য তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই। একটা আবছা ঝাপসা ভাব দূরের তাল গাছগুলির চারিদিকে জমা হইয়া রহিয়াছে। অমরের মেকানিক বলিল "Ready?" অমর বলিল, "হ্যাঁ, সব ঠিক।"

প্রবল গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপাইয়া বিমানের এঞ্জিন জাগিয়া উঠিল। একটা দমকা হাওয়া খড়কুটা উড়াইয়া দূর হইতে দূরে ছড়াইয়া দিল। অমরের আকাশযান চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে ছুটিয়া হঠাৎ হাওয়ায় ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘুরিয়া আরও উপরে চলিয়া গেল। বিমান বন্দরের চারিদিকে পাকদিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া বিমানের মুখ পশ্চিমে ঘুরিল। ঘোর গর্জ্জনে আকাশ কাঁপাইয়া পুর্ব্বাকাশ হইতে ডুব দিয়া বিমানখানা যেখানে সকলে দাঁড়াইয়া সেইদিকে তীব্র গতিতে নামিয়া আসিল ও এই অভিবাদন সমাপ্তে যখন জমি হইতে কয়েক শত ফুট মাত্র উপরে তখন ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পুনরায় উপরে ধাবিত হইল। তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া গেল।

সমাপ্ত